প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৫

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার টাইপসেটিং : পেজমেকার্স
২৩বি. রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রক স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূ চী প ত্র

অবতরণিকা

একালের শিক্ষিত জনমানসে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অপরিমেয় আকর্ষণ ও অদম্য কৌতূহল লক্ষ্য করা যায়। নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত আনন্দের এবং গৌরবের বিষয়। বস্তুতঃ আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বহুমুখী প্রবাহের একটি ধারা লোকসাহিত্য। অথচ এমন একটা সময় ছিল যখন ভদ্র তথা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের কাছে লোকসাহিত্য ছিল সম্পূর্ণ অপাংক্তেয়। রবীন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিক বাঙালীমানসকে বাংলা লোকসাহিত্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন; অর্থাৎ বাংলা লোকসাহিত্যের প্রথম মূল্য প্রমাতা তিনি এবং তাঁকে অনুসরণ করেই প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মনের আস্বাদন ও কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছে লোকসাহিত্য। তাঁর আগে কোন আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি এদিকে এমনভাবে পড়েনি বা কেউ এর সম্যক্ মূল্য তাঁর মত অনুভব করতে পারেননি।

সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে লোকসমাজ ও সংস্কৃতি চিরকালই সম্পন্ন জীবন ও মানসিকতার সীমান্তলগ্ন একটি দুর্বলতর সমান্তরাল প্রবাহ -- তথাকথিত অভিজাত সমাজের প্রত্যন্তবর্তী মনন-দুর্বল গ্রামীণ লোকসমাজের নৃত্যগীত, পার্বণোৎসব ও সহজ সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে তার ব্যাপক প্রসার। বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসে লোকসংস্কারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় সংস্কৃত ভাষার অভিজাত সাহিত্যকীর্তিব অন্তেবাসী প্রাকৃত অপভ্রংশাদি ভাষার ছড়া, গান, লোককথা ইত্যাদির মধ্যে। চৈতন্য প্রভাবিত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে লোকসংস্কারের পৃথক পরিচয় তেমন প্রখর নয়, সপ্তদশ শতক থেকে অভিজাত এবং লোকমানসিকতার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য পুনরায় পরিলক্ষিত হয়। তবে ঊনবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত অভিজাত ও লোকমানসিকতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের একটা ক্ষীণ সূত্রও অন্ততঃ বিদ্যমান ছিল,—মধ্যযুগীয় স্থিতিস্থাপকতা একবার নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে যার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ সেই মৌলিক সংযোগের পরিচয় আবার ব্যক্ত করলেন আশ্চর্য-সুন্দর উপমায় প্রচ্ছন্ন করে; —

"গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহাব অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে, তাহা বিশেষ রূপে সঙ্কীর্ণরূপে দেশীয় স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য; সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপর দাঁড়াইয়া অছে। এইরূপ নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চসাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুল-ফল ডাল-পালার সঙ্গে মাটির নিচেকার শিকড়গুলার তুলনা হয় না; তবু তত্ত্ববিদদের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।" (গ্রাম্য সাহিত্য, লোকসাহিত্য)

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যে, বৈষ্ণব কবিতায় অন্যান্য দেশের সাহিত্যের

বাঙালীর ইংরেজী-শিক্ষিত মানসে ভারতীয় ঐতিহ্য উদ্বোধনের প্রথম পুরোধা ছিলেন রামমোহন রায়। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল দেশের তরুণেরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, আর সেই শিক্ষালব্ধ মুক্ত মানসিকতা নিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের করবে পুনর্মূল্যায়ন, এবং পুনরুজ্জীবনও; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখেরাও এই আকাঙ্ক্ষাকেই বাস্তবক্ষেত্রে ব্যাপকতর মুক্তিদান করেছিলেন। আসলে এঁরা সকলেই চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় করতে। কিন্তু প্রাচ্য সংস্কৃতি বলতে তাঁরা বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত ও ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্য ভাবনার ধারক ও বাহক প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকেই বুঝিয়েছিলেন। এ ছাড়াও ভারত সংস্কৃতির আরও অনেক নিভৃত এবং সীমিত হলেও যে গভীর উপাদান রয়েছে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে সেদিকে একেবারেই দৃষ্টি পড়েনি নবযুগের এইসব পথিকৃৎদের। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, ভারত ঐতিহ্যের সামগ্রিক রূপের সন্ধান সজ্ঞানে তাঁরা কেউ করেননি। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এ কার্যে বৃত হন। বিশেষজ্ঞরাও অনেকেই এই অভিমত পোষণ করেছেন। (নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় ঐতিহ্য) তাঁদের বক্তব্য অনুসরণ করে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যক্তি যিনি আর্যপূর্ব অনার্য ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ, বৌদ্ধধর্ম, সংস্কৃত সাহিত্য ইত্যাদির এবং তাঁর সমসাময়িক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের সকল অর্থগর্ভ পর্বের এবং ভারত জীবনেরও সকল স্তরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ্রহণ করেছিলেন।

সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত প্রধান প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সীমান্ত পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে মধ্যযুগেও এক নবীন জীবন মূল্যবোধ গড়ে উঠেছিল যার সঙ্গে তথাকথিত নিম্নকোটির সাধারণ মানুষের আন্তরিক যোগও ছিল নিরন্তর। মধ্যযুগে নানক-কবীব থেকে শুরু করে একনাথ জ্ঞানেশ্বর পর্যন্ত এই যোগসূত্রটি অবিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলাদেশের মরমিয়া সাধক কবির দোহায়, আউল-বাউলের রচনায় প্রকাশিত জীবনাদর্শের মধ্যে সর্ব সম্প্রদায়, সব ধর্মমত, বিশ্বাস-আচার-ব্যবহারের মিলিত এক নবীন ফলশ্রুতি পরিলক্ষিত হয়; এর মধ্যে আর্যপূর্ব ও অনার্য কৌম ধর্ম, বহিরাগত নানা ধর্ম ও সংস্কার এবং বৈদিক ঔপনিষদিক হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান ইত্যাদি ধর্ম, ইসলামী সুফী ধর্ম, কৃষি নির্ভর গ্রামজীবনের লোকধর্ম সমস্তই প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান। আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই সব রচনার সঙ্গে আমাদের জীবনের আত্মিক যোগ অনুভব করেছিলেন এবং আবিষ্কার করেছিলেন উপনিষদের উদার মানবধর্মের সঙ্গে এই মধ্যযুগীয় সন্তদের মানব ও দেবতা প্রীতির একটা সুস্পষ্ট নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে।

রবীন্দ্রপূর্ব বাংলাসাহিত্যের দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পী মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার সুষ্ঠু সমন্বয়ের আগ্রহ ও প্রচেষ্টা অম্লান: এবং বলাই বাহুল্য ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধাবোধের পরিচয়ও সুস্পষ্ট। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, ভারত সংস্কৃতির এই লোকায়ত দিকটি তাঁদের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারেনি।

বস্তুতঃ বঙ্কিম তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে যে রোমান্সের অবতারণা করেছেন তার প্রেরণা রূপকথা বা লোকসাহিত্যের রোমান্সের জগৎ নয়; এজন্যে তিনি তাকিয়েছিলেন পশ্চিমের দিকে; তাঁর সাহিত্যেও স্থান পেয়েছে ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক জীবনের সমস্যা; সেখানে

গ্রামজীবন প্রায় অনুপস্থিত বললেই হয়।

ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রাম জীবনকে উপজীব্য করে উপন্যাস রচনা করেন। কিন্তু তাঁর উপন্যাস গুচ্ছেও গ্রামজীবনের পরিচয় সংগৃহীত হয়েছিল ইংরেজী-শিক্ষিত নাগরিক বাঙালীর দৃষ্টিকোণ থেকে; গ্রামবাংলার লোকমানস কিংবা লোকসমাজ সেখানে আত্যন্তিক প্রতিষ্ঠা লাভে বঞ্চিত হয়েছে। তাই গ্রাম জীবনের কল্পিত type-ই আছে তারকনাথের রচনাতে, সজীব গ্রামজীবন নেই।

আসলে তখনও পর্যন্ত সাহিত্যক্ষেত্রে গ্রাম তথা লোকজীবন উপেক্ষিত। এমনকি রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যজগতে অনুপ্রবেশ করলেন তখনও বাংলাসাহিত্যের এই অবস্থা; রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞের ভাষায় বলা যেতে পারে, "রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখন মধ্যযুগীয় বাংলার সমস্ত চিহ্ন প্রায় অবলুপ্ত, স্মৃতিও তাহার ম্লান।" (শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী)

এই প্রসঙ্গে নিছক তথ্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য, বঙ্কিমের আগে প্রাচীন বাংলার রূপকথার গল্প 'বিজয় বসন্ত' ও আরবী ফারসী সূত্র থেকে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আগত 'গোলেবকাওলি'র কাহিনী প্রকাশিত হয়। কিন্তু তা ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী মানসে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। কারণ এই নির্দোষ কাহিনী দুটি অবক্ষয়যুগের বাঙালীর রুচি বিপর্যয় ও বটতলার ছাপাখানার দৌলতে এক অসহনীয় আবিলতা সৃষ্টি করেছিল। এজন্য নবীন শিক্ষিত বাঙালীর লেখা কোন দুর্বলতম গ্রন্থও এ পথ ধরে অগ্রসর হয়নি। এমনকি লোকসাহিত্যকে যিনি নবমূল্যায়নের মাধ্যমে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন সেই রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমের রচনায় এই পথ অনুসৃত না হওয়ায় আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ লোকসাহিত্যের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর একটি পরিচ্ছন্ন পরিশীলিত মূল্যবোধও ছিল; এবং সেই মূল্যবোধ পরিস্রুত করে আধুনিক রুচির দরবারে প্রাকৃত-স্বভাব লোকসাহিত্যকে তিনি মহিমা ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি লোকসংস্কৃতির মধ্যে জীবনের সৌন্দর্য এবং আনন্দ-বেদনাঘন রসেরই অনুসন্ধান করেছিলেন। তার স্থূল, অসুন্দর, অবাস্তব দিকটিকে তাঁর রোমান্টিক কবিমন সযত্নে পরিহার করে গেছে।

একেবারে প্রথম জীবন থেকেই রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের মৌল মহিমা অনুভব করেছিলেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দে 'সঙ্গীত সংগ্রহ' নামে বাউল গানের একটি সংকলনের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি এর মধ্যে খাঁটি বাঙালিত্বের স্বরূপ আবিষ্কার করেন এবং সেই কারণেই লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

লোকসাহিত্যের গভীরে জাতীয় জীবন-স্বভাবের এই অনুসন্ধান রবীন্দ্র মননে এক ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছিল। এ পথে কবির প্রচেষ্টা ছিল বিভিন্নমুখী। লোকসাহিত্যের নানা উপাদান (ছড়া, গাথা, বাউল গান) তিনি সংগ্রহ করেছেন, তার মূল্য বিচার করেছেন সাহিত্য রসের মৌল ভিত্তি হিসেবে এবং সমাজ মানসের দর্পণ-রূপেও। এখানেই শেষ নয়, আন্তরিক মগ্নতার বশে নিজের মৌলিক সৃজন প্রবাহের গভীরেও লোকসাহিত্য-গুণকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলেছেন।

১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিমনের এই বিচিত্রমুখী সহজাত লোকসাহিত্যাগ্রহ উল্লেখ্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টার আকার ধারণ করে। তখন থেকেই দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য (গ্রাম্য সাহিত্য, ছড়া, ব্রতকথা ইত্যাদি) সংগ্রহের জন্য অপরিসীম চেষ্টা ও অদম্য উৎসাহ। আরও উল্লেখযোগ্য, তখন এবং পরবর্তীকালে তিনি নিজে তো লোকসাহিত্য সংগ্রহ করেছেনই, অন্যদেরও এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন।

তবে একথাও অনস্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথের আগেও লোকসাহিত্যের উপাদান যে একেবারে সংগৃহীত হয়নি তা নয়, তবে তার অধিকাংশই বিদেশীদের প্রচেষ্টায়। অবশ্য লোকসাহিত্যের সর্বাত্মক মহিমা কিংবা অন্তরঙ্গ রসমূল্য তাঁদের আকর্ষণ করতে পারেনি। নিজ নিজ সীমিত উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সিদ্ধির গণ্ডীরেই এই সব শ্রদ্ধেয় অনুসন্ধানীর সমস্ত প্রচেষ্টা আবদ্ধ থেকেছে।

নানাসূত্রে জানা যায়, রেভারেণ্ড উইলিয়াম মর্টন বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম উপাদান প্রবাদের প্রাচীনতম সংগ্রাহক। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রেভরেণ্ড জেমস লং প্রায় সাত হাজার প্রবাদ সংগ্রহ করেছিলেন (১৮৬৮-৭২ খৃষ্টাব্দ)। তবে তাঁদের এই প্রবাদ সংগ্রহের মূলে লোক-সাহিত্যের প্রতি তীব্র অনুরাগ বা কৌতূহলের প্রেরণা ছিল না। তাঁরা এদেশে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। অথচ ভাষা শিক্ষার কোন উপযোগী বাংলা ব্যাকরণ তাঁদের সামনে ছিল না। অগত্যা বাধ্য হয়ে তাঁরা নিজেরাই ব্যাকরণ প্রণয়ন করতে প্রয়াসী হন এবং সেই প্রয়োজনেই বাংলা প্রবাদ সংগ্রহে উদ্যোগী হন। এই প্রবাদ সংগ্রহ নিতান্তই তত্ত্বপ্রধান হওয়ায় এবং এতে রসের আকর্ষণ না থাকায় পরবর্তীকালে কারোরই এদিকে বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না।

এরপর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ গ্রীয়ারসন 'মানিক চন্দ্র রাজার গান' প্রকাশ করেন। এটিই বাংলা লোকসাহিত্যের প্রথম সংগৃহীত গীতিকা। তিনিও অবশ্যই প্রাদেশিক ভাষা সম্পর্কে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই এই সংগ্রহ কার্যে ব্যাপৃত হন এবং এই একই প্রয়োজনে আরও বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগীতিও কিছু কিছু সংগ্রহ করেন।

এতো গেল বিদেশী সংগ্রাহকদের কথা। রবীন্দ্র পূর্ব একজন বাঙালী লোকসাহিত্য সংগ্রাহক রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে। তিনি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে *The Folk tales of Bengal* নামে লোককথা সংগ্রহ করে ইংরেজী অনুবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করেন। স্বভাবতঃই তাঁর সংগ্রহ বিদেশে সমাদৃত হয়েছিল এবং এদেশেও শিক্ষিত সমাজের (যাঁদের অনুশীলনের ভাষা ইংরেজী) অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। (শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথের লোক সাহিত্য বিচার)

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, রবীন্দ্রপূর্ব এই পূর্বসূরীরা কেউই লোকসাহিত্যের যথার্থ মূল্য সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত করেননি। আসলে তাঁরা সকলেই ছিলেন লোকসাহিত্যের সংগ্রাহক মাত্র। তাই তাঁদের কারও কারও সংগ্রহ সেকালের জনমানসে কিছুটা কৌতূহলের সৃষ্টি করলেও এই বিষয়ে তাঁদের পথ অনুসরণের আগ্রহ বা উৎসাহ কোথাও দেখা গেল না।

এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াস এবং সিদ্ধি দুইই তুলনাহীন। কারণ তিনি শুধু সংগ্রহই করেননি, ভদ্রসমাজে অবজ্ঞাত এই লোকসাহিত্যের সাহিত্যিক রস বিচার করে সাহিত্য ভাণ্ডারে এর স্থান নির্দেশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ''দেশের মধ্যে আউল-বাউল কত সম্প্রদায় আছে, সেটা একেবারে অবজ্ঞার বিষয় নয়; ভদ্রসমাজের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মচেষ্টার চেয়ে তার মধ্যে অনেক বিষয়ে গভীরতা আছে; সে সব সম্প্রদায়ের যে সাহিত্য তাও শ্রদ্ধা করে রক্ষা করবার যোগ্য — কিন্তু 'ওরা ছোটোলোক'।'' (রবীন্দ্রনাথ, রাশিয়ার চিঠি)

বস্তুতঃ 'ছোটোলোক' বলেই এই সব দীনহীনের কথা বহুকাল ভারতের কোন বড় পণ্ডিতের লেখায় আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথই কিন্তু উচ্চকণ্ঠে ভারতের এবং ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিদ্বজ্জন সভাতেও এই লোকায়ত সাহিত্যের উপলব্ধি ও রসচৈতন্যের জয়গান করলেন।

এখানেও শেষ নয়, লোকসাহিত্যের আবিষ্কাব আলোচনা এবং শুধুমাত্র উজ্জীবনের ব্যক্তিগত প্রয়াসের মধ্যে বদ্ধ থেকে তিনি তৃপ্ত হতে পারেননি; দেশবাসীকে, দেশের ছাত্রসমাজকে এ কাজে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, তাঁর আগে লোকসাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ হয়ে থাকলেও তাব সর্বাত্মক ভাবমূল্যটি জাতির জীবনে তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লোকসাহিত্যের এই অন্তবঙ্গ আত্মিক যোগের একটি ঐতিহাসিক মূল্যও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁব নিজের কালের অভিজাততম পরিবারেব সন্তান। কবির জন্মের অব্যবহিত পরবর্তী কাল থেকে তাঁদের পরিবার বৃহত্তর বাংলার সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ঠাকুরবাড়ীর জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছিল অনেকটা বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যের দ্বীপের মধ্যে। কিন্তু লোকসঙ্গের এই অভাব পরিপূরিত হয়েছিল প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ তত্ত্বাদির অধ্যয়ন ও আলোচনায়। রবীন্দ্রনাথের এই উত্তরাধিকার পরিচয় স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়, — ''ঠাকুর পরিবারে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আধুনিক পৃথিবীর সমন্বয় ঘটেছিল। যৌবনারম্ভে মহর্ষি উপনিষদের পৃষ্ঠা কুড়িয়ে পান ও মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে তাঁকে Geologyর গ্রন্থ পড়তে দেখা গেছল। এই দুটি ঘটনা থেকে ঠাকুর পরিবারের আবহাওয়া অনুমান করা যায়। ধর্মে ও কর্মে, ত্যাগে ও ভোগে, কলায় ও বিদ্যায়, স্বাজাত্য ও বিশ্বমানবিকতায় ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল; স্কুল কলেজের অপেক্ষা রাখেনি। এই পরিবারের কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন তাঁর বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা।'' (জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল থেকেই তাঁদের পরিবারে সংস্কৃত-ইংরেজী-পারসিক (মহর্ষি নিজে পারসিক সাহিত্যের রসিক ছিলেন) ফরাসী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাচ্যপ্রতীচ্য ভাষা-সংস্কৃতির অনুশীলন চলেছিল নিবিড় ভাবে। বাংলার সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল আন্তরিক। ফলে জন্মসূত্রেই তিনি মধ্যযুগীয় কুসংস্কার-বর্জিত একটি মানস পরিমণ্ডলের অধিকারী হয়েছিলেন। উপনিষদ-কালিদাস-সেক্সপীয়ারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল বাল্যকালেই।

এই পরিমার্জিত রুচির দাক্ষিণ্যে নিছক লোককথাকেও তিনি নূতন ভাবমূল্যে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই ঠাকুরবাড়ীর ভৃত্য বা পরিচারকদের কাছ থেকে যখন লোকসাহিত্য বা সঙ্গীতের পরিচয় লাভ করেছেন তখন তার সঙ্গে একটি আত্মিক যোগ অনুভব করেছেন, কিন্তু লোকসংস্কৃতির মধ্যে যে গতানুগতিক আদিমতা, স্থূলতা কিংবা অসংযম আছে তাকে তিনি দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছিল তাঁর আশ্চর্য সমন্বয়ী প্রতিভার গুণে। পরিবারের ঐতিহ্যে ছিল একদিকে প্রাচীন ভারতীয় বেদ-উপনিষদের প্রতি গভীর অনুরাগ, আর একদিকে ছিল প্রতীচ্যের সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাংলা এবং বাঙালী-প্রীতি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কালোত্তীর্ণ প্রতিভার অধিকারী। তাঁর মধ্যে এই ত্রিধারাই উৎকর্ষের শেষ দিগন্ত স্পর্শ করেছিল। উপনিষদের আনন্দবাদ এবং জড়বাদী দর্শনের অভিব্যক্তিবাদের সমন্বয়ে তিনি এক অপরূপ প্রাণবাদী জীবন মূল্যবোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং তাঁর বাঙালীপ্রীতির গভীরতায় বাংলার উপেক্ষিত অশিক্ষিত গ্রামমানসের পরিমার্জনাহীন সাহিত্যকেও সেই প্রাণমহিমায় মণ্ডিত করে তুলেছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার সংস্কৃতি-মিশ্রণে গঠিত উন্নততর নাগরিক সভ্যতালোকিত রবীন্দ্র-মননের সান্নিধ্যে মধ্যযুগের বাংলার মৌলিক গ্রামীণ লোকায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পুনরুজ্জীবনের এই অমূল্য ইতিহাস পরিচয়ই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

মূল বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করার উদ্দেশ্যে বর্তমান গ্রন্থে আমাদের আলোচনাকে কয়েকটি পর্বে বিভাজন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে লোকসাহিত্যের সংজ্ঞার্থ পরিচয়, রূপ-প্রকরণ ও রবীন্দ্রভাবনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্রমনের গঠনে লোকসাহিত্যের সংস্কার ও প্রভাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার প্রয়াস করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি কিভাবে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের পরিচয় ও মূল্যানুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে রবীন্দ্ররচনায়—বিশেষতঃ কাব্য, নাটক ও কথাসাহিত্যে লোকসাহিত্য সংস্কারের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। পরিশিষ্ট অংশে রবীন্দ্র সংগৃহীত লোকসাহিত্যের নিদর্শন তুলে ধরে উপসংহার করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান গ্রন্থের অভীপ্সিত প্রধান তাৎপর্য রবীন্দ্রমানসিকতায় বাংলা লোকসাহিত্য সংস্কৃতির ভূমিকা।

প্রথম অধ্যায়

লোকসাহিত্যের সংজ্ঞার্থ পরিচয় : রূপ, প্রকরণ ও রবীন্দ্রভাবনা

রবীন্দ্রমনকে লোকসাহিত্য আকর্ষণ করেছিল লোকজীবনের প্রতি কবির আন্তরিক সহানুভূতির জন্যই। প্রকৃতপক্ষে লোকসাহিত্য লোকজীবনেরই ফসল। সমালোচকের ভাষায় বলা যেতে পারে — "It is essentially of the people, by the people and for the people." অর্থাৎ এটি একান্তভাবে লোকেরই সাহিত্য, লোকের দ্বারা তাদের জন্যই সৃষ্ট।

সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে 'লোক' শব্দটি কোন বিশেষ অর্থ পরিবাহী। উত্তর স্বরূপ বলা যেতে পারে আধুনিক কালে 'লোকসমাজ' তথা 'লোক' শব্দটি ইংরেজী 'Folk' শব্দেরই বাংলা প্রতিশব্দ রূপেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞেরা 'Folk' তথা 'লোকসমাজের' প্রসঙ্গে নানারকম অভিমত পোষণ করে থাকেন। যেমন—(১) সংঘবদ্ধ লোকগোষ্ঠী, আদিম উপজাতীয় লোকগোষ্ঠী, নিম্নশ্রেণীর প্রাকৃত জনগোষ্ঠী। (২) অভিজাত তথা সভ্যসমাজের প্রত্যন্তবর্তী অপেক্ষাকৃত নিম্নতর শিক্ষা, বুদ্ধি ও সংস্কৃতিজীবী মানুষ। (৩) এছাড়াও অনেক সময় 'Folk' শব্দের দ্বারা সুসভ্যদেশের নিরক্ষর সাধারণ লোককে বোঝান হয়ে থাকে। (Charles Winick, Dictionary of Anthropology, Aurelio M.Espinosa, standard Dictionary of Folk-lore Mythology and Legend; শ্রী বিনয় ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি)

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য লোকজীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রধানতঃ শেষোক্ত সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অন্তরঙ্গ আকর্ষণের ফলে। লোকসাধারণ বলতে তিনি নিজেও যে ভদ্রেতর নিরক্ষর কিংবা স্বল্পসাক্ষর প্রাকৃত জনসাধারণকেই বুঝেছেন, তাঁর 'লোকহিত' প্রবন্ধটি পাঠ করলে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশই থাকে না।

কিন্তু লোকসমাজের প্রতি আধুনিক মনের আকর্ষণ বৈজ্ঞানিক কারণে এবং সেজন্যই লোকসাহিত্যের মূল্যমান এবং পরিচয় নির্ধারণে বিজ্ঞানসম্মত বিচার ও সংজ্ঞার্থ নির্দেশের চেষ্টা হয়ে থাকে। রবীন্দ্র-ভাবনায় ও রবীন্দ্ররচনায় লোকসাহিত্যের স্থান ও প্রভাব নির্দেশ উপলক্ষ্যে এই অধুনাতন মূল্যমানও অবশ্য অনুসন্ধানযোগ্য।

লোকসমাজের অনুসন্ধান একালে মূলতঃ নৃতাত্ত্বিকেরাই করে থাকেন; সাহিত্য এবং রেখাঙ্কন-নির্বিশেষে লোকশিল্প সেই কৌতূহলী অনুসন্ধানেরই উপায় বা আশ্রয়।

আগে লোকসমাজ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মতামত উদ্ধার প্রসঙ্গে দেখা গেছে যে, অনেক সময়ই লোকসমাজ বলতে আদিম উপজাতীয় লোকগোষ্ঠীকে (a primitive kind of past tribal social organisation) বোঝান হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন, বিশেষজ্ঞরা সকলেই এ মতকে পুরোপুরি সমর্থন করেন না। তাঁরা

অনেকেই 'লোকসমাজ' এবং 'আদিম সমাজে'র মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুভব করে থাকেন। তাঁদের মতে লোকসমাজ একটি ক্রম উদ্ভবশীল জনগোষ্ঠী; অথচ আদিম সমাজ স্থবির, তার প্রগতি কালের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়নি। লোকসমাজ বাইরের সকল প্রকার সংস্কৃতি থেকে বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করে নিয়েও নিজের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে একদিকে লোকসমাজ যেমন বহু প্রাচীন আচার-আচরণ-বিশ্বাসকে রক্ষা করে চলে, তেমনি আবার অন্য দিকে সমসাময়িক অনেক কিছুকেই গ্রহণ করে। লোকসাহিত্যের মধ্যেও লোকসমাজের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি স্ফুটতর হয়ে থাকে। অথচ আদিম-সমাজ বাইরের সমস্ত কিছুকেই দূরে পরিহার করে কেবলমাত্র আপন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখতে চেষ্টা করে। অপর কোন সংস্কৃতি থেকে নতুন কিছু গ্রহণ করার আগ্রহ বা ক্ষমতা তার নেই। পণ্ডিতেরা অনেকেই এ বিষয়ে একমত। (শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য; Dr. Sukumar Sen, Folk-lore, Vol-1)

লোকসমাজ তথা লোকসাহিত্যের এই অবিরাম বিকাশ-মানতা তথা তার প্রবহমান সঞ্জীবনীশক্তিকে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন, এবং এই শক্তিতে মুগ্ধও হয়েছিলেন। বস্তুতঃ এ শক্তির উৎস অকৃত্রিম সহজ সংঘচেতনা। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, লোকসমাজে ব্যক্তি অনুপস্থিত কিংবা একান্তভাবেই সমাজের অঙ্গীভূত। তাই লোকসাহিত্যের মধ্যে চলমান সমাজের সরল সামগ্রিক লোকমনটিকে আমরা দেখতে পাই, সেজন্য নৃতাত্ত্বিকদের পক্ষেও লোকসাহিত্যের আকর্ষণ অদম্য।

অবশ্য লোকসাহিত্য নিঃসন্দেহে ব্যক্তিরই রচনা— যদিও ব্যক্তি সেখানে সমাজের মধ্যে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাই একে ব্যক্তির রচনা বলে কখনোই মনে হয় না, বরং তার বিপরীতটিই; অর্থাৎ লোকসাহিত্য সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি বলেই প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির সত্তা একান্তভাবে সমাজচেতনায় আচ্ছন্ন বলে লোক সাহিত্যের মূল রচয়িতা প্রায় সব সময়েই সকলের অগোচরে থেকে যায়। উচ্চতর সমাজ ও তাদের ব্যক্তি-মুখ্য সাহিত্যের সঙ্গে এই সাহিত্যের প্রধান পার্থক্য এইখানে। লোকসাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যটির জন্য ডঃ সুকুমার সেন একে 'অপৌরুষেয়' আখ্যা দিয়েছেন এবং অনেকেই এই অভিমত সমর্থন করেন। (শ্রী সুকুমার সেন, ছেলেভুলানো ছড়া, বিচিত্র সাহিত্য; শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড; শ্রী সুধীর কুমার করণ, সীমান্ত বাংলার লোকযান; Prof Keshavram Kashiram Ghastree, (Gujrat) Recorded folk-literature)

রবীন্দ্রনাথও লোকসাহিত্যের এই অপৌরুষেয়তায় বিশ্বাস করতেন বলেই মনে হয়। কারণ তিনি লোকসাহিত্যের অন্যতম উপকরণ ছড়ার কথা বলতে গিয়ে এই একই কথা বলেছেন, "এই সকল ছড়ার মধ্যে একটা চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই ......ইহারা মানব-মনে আপনি জন্মিয়াছে।" (ছেলেভুলানো ছড়া, লোকসাহিত্য) আসলে লোকসাহিত্য সহজ মানুষের সরল মনের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি। যে মানুষ,—যে মন লোকসমাজের অকৃত্রিম ফসল।

লোকসাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্যটির প্রতি প্রায় সকল বিশেষজ্ঞরাই সবিশেষ জোর দিয়েছেন সে হল তার স্মৃতিচারী মৌখিক প্রবহমানতা। লোকসমাজের মধ্যে লিপিজ্ঞান প্রাথমিক অবস্থায় থাকা সম্ভবই ছিল না; কিন্তু লিপিজ্ঞান থাক বা না থাক যুগ থেকে যুগান্তরে প্রজন্মের পর প্রজন্মের স্মৃতি আন্তরিকতা এবং আবৃত্তি বা বাচনের মধ্যে দিয়ে লোকসাহিত্যে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। ফলে তার মধ্যে বিবর্তনধর্মী নিত্য নতুন পরিণতির সম্ভাবনাও অশেষ। কালে কালে লোকসমাজের সংস্কার এবং সহ-জ বোধ যত বিবর্তিত হয়েছে, পুরা-প্রচলিত মৌখিক সাহিত্যেও আপনা থেকেই তার ছাপ পড়েছে। পরম্পরাবাহিত স্মৃতি সূত্রকে ছাপিয়ে এই পরিবর্তন লোকসাহিত্যের মধ্যে অনায়াসে স্থান করে নিয়েছে। এই অর্থেই লোকসাহিত্য কোনকালেই তার সজীব প্রাণধর্ম হারিয়ে 'classics'-এর মূর্তি ধারণ করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, ''ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল; ইহারা দেশকাল পাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে।'' (তদেব)

অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথ লোকসমাজ অর্থে সভ্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অনগ্রসর সমাজকেই বুঝেছেন, এক অর্থে রক্ষণশীলতাই যার ধর্ম। তাই ছড়া প্রভৃতি লোকসাহিত্যের কোন কোন অংশ এককালে শেষ পর্যন্ত উচ্চকোটির মহিলা সমাজে এসে সঞ্চিত হতে পেরেছিল বলে কবি উৎসাহিত বোধ করেছেন। অবশ্য তিনি এও অনুভব করেছিলেন যে, বর্তমানে ছাপাখানার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ছড়া-রূপকথা প্রভৃতি মহিলা সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন মুদ্রিত উচ্চতর সাহিত্যই সকলের উপভোগ্য হচ্ছে। (তদেব, রবীন্দ্রনাথ, দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকা)

রবীন্দ্রনাথকে লোকসাহিত্যের চলচ্চিত্র-ধর্মী প্রবহমান জীবন-পরিচয়ই আকৃষ্ট করেছিল সবচেয়ে বেশী। লোকসাহিত্য লোকজীবনের সঙ্গে এগিয়ে চলে, কিন্তু পুরাতনের মধ্যেই তার নব নবায়মানতার আবর্তন, আপাত নূতনের গহনেও পুরাতনের সংস্কার আত্মগোপন করে থাকে। রবীন্দ্রনাথ গতি এবং বিস্তারের উপাসক ছিলেন। অন্তহীন বিস্তারেরই আর এক নাম 'অসীম'। লোকসাহিত্যের মধ্যে প্রাণের 'অসীম' চলমানতাকে দেখেই তিনি শ্রদ্ধাবিষ্ট হয়েছিলেন। আরও উল্লেখযোগ্য, লোকসংস্কারকে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, 'সজীব প্রস্তরীভূত জীবাশ্ম মৃত্যুকে যা উপেক্ষা করে'। (Charles Francis Potter/SDFML) রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও সেই কথাই শুনি কবির ভাষায় এবং কবির অনুভূতিতে,— ''যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরে কর্দমতটের উপর বিলুপ্ত বংশ সেকালের পাখিদের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল— অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দম পদচিহ্নরেখা সমেত পাথর হইয়া গিয়াছে— সে চিহ্ন আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গিয়াছে—কেহ খোন্তা দিয়া খুদে নাই, কেহ বিশেষ যত্নে তুলিয়া রাখে নাই—তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেকদিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কতকালের এক টুকরা মানুষের মন কাল সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই বহুদূরবর্তী বর্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে; আমাদের মনের কাছে সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার সমস্ত বিস্মৃত বেদনা জীবনের উত্তাপে লালিত হইয়া আবার অশ্রুরসে

সজীব হইয়া উঠিয়াছে।" (ছেলেভুলানো ছড়া, লোকসাহিত্য)

লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত কালসমুদ্র বাহিত এই অসংখ্য বিচিত্র অপার রহস্যময়তার প্রতিই রবীন্দ্র-মনের গভীর অনুরাগ। তাঁর আলোচিত লোকসাহিত্যের প্রত্যেক স্তরেই এই আন্তর স্বভাব এবং বাহ্য রূপাঙ্গিক সম্পর্কে কবিমনের সচেতনতা অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হয়েছেই।

সেই সূত্রে রূপকথা, ব্রতকথা, ছড়া, পল্লীগায়কের কণ্ঠনিঃসৃত বিচিত্র সঙ্গীত ধারা, যাত্রা-পাঁচালী-কথকতা সমস্তকেই কবি তাঁর লোকসাহিত্য-চিন্তার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এখানেই রবীন্দ্রনাথের সহজ লোকসাহিত্য প্রীতি এবং কবিজনোচিত অনুরাগের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিচারের পার্থক্য ঘটে। বাংলা লোকসাহিত্য বিশেষজ্ঞ শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য রূপকথা, ব্রতকথা, ছড়াকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু বাউল-মুর্শীদী-মারিফতী প্রভৃতি পল্লীসঙ্গীতকে অধ্যাত্ম গীতির পরিচয়ভুক্ত করতে চেয়েছেন, লোকসাহিত্যের নয়।

কিন্তু এ বিষয়ে মতান্তর যে কিছু নেই তা নয়। রবীন্দ্রনাথের মতই কোন কোন আলোচক এ সব সঙ্গীতকে লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই সব সঙ্গীতের মধ্যে সূক্ষ্ম মননশীল (sophisticated) অধ্যাত্ম চিন্তার পরিচয় লক্ষ্য করেছেন। অন্যপক্ষে যাত্রা-পাঁচালি-কথকতা এমনকি কবি সঙ্গীতকেও তাদের পরিণামী নাগরিকতা (urbanity) ও মুন্সীয়ানার জন্যেই হয়তো লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেননি। তবে জারি গান, ভাটিয়ালী, কীর্তন, উমা-সঙ্গীত ইত্যাদিকে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই 'লোকসাহিত্যে'র পর্যায়ভুক্ত করেছেন। তাহলেও লোকসাহিত্য আলোচনার বর্তমান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রমন ও রবীন্দ্রসাহিত্যই আমাদের প্রধান অনুসন্ধানের বিষয়। সে কারণে বৈজ্ঞানিক শৈলীকে পূর্ণ স্বীকৃতি জানিয়েও এ বিষয়ে কবির প্রবণতার ধারাকেই অনুসরণ করব।

এই উপলক্ষ্যে প্রথমেই রবীন্দ্রভাবনাস্পর্শী বিভিন্ন লোকসাহিত্য কলার রূপ, ভাব ও উৎসগত রূপরেখাটিকে ধারানুক্রমে পরিস্ফুট করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

(১) **রূপকথা-উপকথা-ব্রতকথা**—এই ধারায় রূপকথাই হয়তো সুপ্রাচীন লোকসাহিত্যের উপাদান। রূপকথা আসলে লোকসমাজের উৎসজাত কথাসাহিত্য। আধুনিক বিচারে এদের নানা অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে;—রূপকথা-উপকথা-ব্রতকথা প্রভৃতি। লোক-মুখবাহিত বিভিন্ন দেশকালের অভ্যুদয়-চিহ্নিত এই সাহিত্যধারা একাধারে লোকসমাজের জীবন ও ইতিহাস এবং তাদের প্রাণসম্পদের রসপ্রবাহে সাহিত্য গুণান্বিত। এই সব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য তার বিশুদ্ধ মানবিক রসে। ধর্ম, সংস্কার আদিম কাল থেকেই লোকমানসের একটি অপরিহার্য উপাদান। রূপকথার মধ্যেই ধর্ম-কর্ম-বিমুক্ত মনভোলানো গল্প প্রথম প্রকাশ লাভ করেছে।

রূপকথার উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানারকম অনুমান ও অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রী সুকুমার সেন মনে করেন যে, ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে 'অপূর্বকথা' শব্দটি আধুনিক কালে 'রূপকথা'য় পরিণত হয়েছে। তিনি রূপান্তরটি দেখিয়েছেন এইভাবে—অপূর্ব কথা >অপুরুব কথা >অপরূপ কথা; অবশেষে প্রথমের

'অপ' অংশটি বিমুক্ত হয়ে 'রূপকথা'য় তার পরিণতি। 'উপকথা' শব্দটিরও আদি উৎস একই বলে তাঁর ধারণা। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, অঞ্চল বিশেষের কথ্য ভাষায় এবং শিশুর রসনায় আদি 'র' কারের প্রতি বিমুখতার ফলে এই পূর্বোক্ত ক্রমবিবর্তনজাত 'রূপকথা' শব্দটিই রূপান্তরিত হয়েছে 'উপকথায়'। আরও অনেকেই মনে করেন যে 'রূপকথা' ও 'উপকথা' ভাষাতাত্ত্বিক দিক দিয়ে একই শব্দের নামান্তর।

আবার শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রূপকথার মধ্যে রূপকের ছায়া শরীর অনুমান করেছেন।

রূপক থাক বা না থাক রূপকথার মধ্যে আদিম মানুষের জীবনদর্শনের আকাঙ্ক্ষাটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। বাস্তব জীবনে যা পাওয়া যায় তার চেয়ে যা পাওয়া গেল না, তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশী। এ বিষয়ে শিশু ও বয়স্ক মানুষের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সাহিত্য সেই অসাধ্য সাধন করে। অপ্রাপ্যকে মুঠো ভরে মনের কাছে এনে দেয়। রূপকথার গল্পে মানুষ আসলে সেই অসম্ভবের কল্পলোকে প্রবেশ করতে চেয়েছে। তাই রূপকথা কেবলমাত্র অপরিণত মানসের জন্যই রচিত হয়নি, শিশুবৃদ্ধ সকলের নিকটই তার আবেদন সমান। বিশেষ করে রূপকথা-শিল্প রবীন্দ্রনাথের কবিমনকে আকর্ষণ করেছিল, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে তার আবেদনগত এই 'অপূর্বতা'র জন্যই। এর মধ্যে আপন কল্পনাপ্রবণ পরিণত মানসের পূর্ণ অধিকার অনুভব করেছিলেন বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, ''মানুষ অনেক খানিকটা ছেলেমানুষ, তাকে রূপকথা দিয়ে ভোলাতে হয়।''

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য রূপকথার ওপর বয়স্ক মনের এই অধিকারকে স্বীকার তো করেছেনই, উপরন্তু এর ওপর আরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে শিশুরা এর থেকে কেবল আনন্দ উপভোগই করে থাকে, তারা এর কৌতূহলী শ্রোতা মাত্র। কিন্তু পরিণত মন একাধারে রূপকথার স্রষ্টা, পালয়িতা এবং শ্রোতা। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, পরিণত মনের সৃষ্টি বলেই রূপকথা তার সমস্ত অলীকতা এবং অবাস্তবতা সত্ত্বেও চিরন্তন জীবন রসে এমন পরিপূর্ণ হতে পেরেছে; এবং যার ফলে তার আবেদন সর্বজনীন ও সর্বকালীন।

রূপকথার আঙ্গিক ও সৌন্দর্য প্রসঙ্গে এই ইঙ্গিতই হয়তো বর্তমান প্রসঙ্গে পর্যাপ্ত। তার উদ্ভব সম্পর্কে বিদগ্ধ-মহলে বিচিত্র মতামত প্রচলিত। কেউ মনে করেন বাংলাদেশে রূপকথার উদ্ভব হিন্দু বৌদ্ধ যুগে। আবার অনেকের ধারণা কথাধর্মী আদিম গল্পের জন্ম ভারতবর্ষ ও মিশরের লোক-সমাজে। আবার বেদ উপনিষদের খণ্ড-কথা জাতকের গল্প, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশের গল্পসমূহের বিবর্তনের মধ্যে কথাসাহিত্যের বিকাশের ইতিহাস কল্পনা করা হয়ে থাকে। এসব সত্ত্বেও অস্বীকার করার উপায় নেই, বাংলাদেশের রূপকথা আসলে লোকমানস থেকেই জন্মলাভ করেছে এবং সকল দেশেই তা লোকজীবনসম্ভব সাহিত্য।

তবে সমস্ত লোককথাকেই রূপকথা নামে চিহ্নিত করলে বৈজ্ঞানিক বিচারে অস্বচ্ছতা দূর হয় না। তাই রূপকথার পাশে আর একটি ভাগ রয়েছে উপকথা। অনেকের অভিমত উপকথা শব্দটি নিকৃষ্ট একশ্রেণীর লোককথার দ্যোতক। আসলে কথাসাহিত্যের রস জীবনরস। মানুষ সম্ভব-অসম্ভব নির্বিশেষে তার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই গল্পের দর্পণে

প্রতিফলিত করে দেখতে চেয়েছে। রূপকথার প্রাচীন জন্মকাল তথা লোকসমাজের 'বুদ্ধি বিনষ্টিহীন' (unsophisticated) সরল কল্পনার সামনে সেই অধরার আকাঙ্ক্ষা সম্ভব অসম্ভবের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই রূপকথার রাজপুত্র ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর সঙ্গে কথা বলে, কাঠের পক্ষীরাজে উড়ে চলে। মানবজগত, জীবজগত, জড়জগত রূপকথার গল্পলোকে যেন কেবল মানুষের কথা বলতেই বসেছে। কিন্তু 'উপকথা' প্রধানতঃ সেই নিভৃত মানবজীবন রসের কথা নয়। প্রধানতঃ পশুপাখীর জগতের প্রতি মানুষের যে কৌতূহল কিংবা রোমাঞ্চকর উৎকণ্ঠা রয়েছে তাকে ভিত্তি করেই উপকথার জন্ম। উপকথা আসলে পশুপক্ষীর জগত কিংবা চোরডাকাত প্রভৃতির অভিযানের কাহিনীর কৌতূহল এবং কৌতুক দিয়ে গড়া। এই প্রসঙ্গে মনে হয়, যাঁরা উপকথা অর্থে নিকৃষ্ট এক শ্রেণীর লোককথার অস্তিত্ব অনুমান করেছেন, তাঁরা হয়তো রূপকথার তুলনায় এই শ্রেণীর রচনায় মানবরসগত আবেদনের তারতম্যের ইঙ্গিতই করতে চেয়েছেন।

বেদ-উপনিষদ, জাতক, বিশেষ করে হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রে যে গল্প পাই তা মূলতঃ নীতিকথা—ইংরাজীতে যাকে বলে Fable. বাংলা সাহিত্যে নীতিকথা লোককথার অপরিহার্য অঙ্গ নয়।

অন্যপক্ষে 'ব্রতকথা' লোককথার পর্যায়ভুক্ত। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলা হয় ব্রত। এই কথাকেই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন, "ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, কোন ধর্ম বিশেষের কিংবা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এটাও বেশ বলা যায় যে, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা বিপর্যয় ঘটত সেইগুলিকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষ বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে এই হল ব্রত, পুরাণের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরোনো, বেদের সমসাময়িক কিম্বা তারও পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।"

বাংলাদেশের ব্রতকথাগুলো প্রাক্ পৌরাণিক যুগের সহজ ফসল। হয়তো বা প্রাক্ বৈদিক লোক সমাজেরও সৃষ্টি। দেবতা এখানে উপলক্ষ্য মাত্র; জীবনকে নিয়ে মানুষের বিশেষ করে নারীমনের স্বপ্ন কল্পনায় ভরা কামনায় গড়া এই সাহিত্য আধ্যাত্মিকতার দাবী করতে পারে না। তা একান্তভাবে লোককথারই অন্তর্ভুক্ত।

আর এই নিভৃত নিবিড় 'কামনা' বা জীবনবাসনার অপরূপ রসমূল্যের কারণেই 'রূপকথা-উপকথা-ব্রতকথা' নির্বিশেষে লোককথা-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছিল গভীরভাবে। পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে।

(২) ছড়া — রূপকথা প্রভৃতির মতই ছড়ারও সামগ্রিক সৌন্দর্যে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় আকর্ষণ লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশে ছড়া বহুল-প্রচলিত ও জনপ্রিয়। মূলতঃ অন্তঃপুরকে আশ্রয় করেই তার বিকাশ ও পরিণতি। অবশ্য অন্তঃপুরের বাইরে যে ছড়ার প্রচলন একেবারে নেই তা নয়। ডাক ও খনার বচন, নৈসর্গিক ও ঐন্দ্রজালিক ছড়াগুলো তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখা ভাল, অন্তঃপুরচারী মেয়েলী ছড়াগুলোর কথা ছেড়ে দিলে ডাক ও খনার বচন জাতীয় ছড়াগুলোর প্রতি রবীন্দ্র কবিমনের আন্তরিকতার সাক্ষ্য বড়

একটা পাওয়া যায় না। সম্ভবত: তার কারণ, এই সব রচনায় কাব্য সৌন্দর্য ও সাহিত্যিক মূল্যের অভাব। লোকসাহিত্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অবশ্য এদের গুরুত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কারণ এরা লোকজীবন সম্ভব লৌকিক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক লোকমননের ফসল। কিন্তু রবীন্দ্র প্রসঙ্গে লোকসাহিত্যের রস উপাদানই তাঁর কবিচিত্তের প্রায় একমাত্র আগ্রহের বিষয়।

এই বিশেষ প্রসঙ্গ সূত্রেই প্রথম 'ছড়া' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং তার রূপাঙ্গিক ও বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে 'ছড়া' বলতে আমরা এক শ্রেণীর কবিতাকেই বুঝি, যদিও তা কোন পূর্ণাবয়ব সুপরিণত কবিতা নয়। এ বিষয়ে কোন কোন বিদগ্ধ পণ্ডিতের ধারণা, 'ছড়া' শব্দটি বহু প্রাচীন, তবে সে'তার প্রচলিত অর্থে নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত কবিতা, কবিতা-ছত্র বা কবিতা-ছত্রাংশ অর্থে শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না। তবে অস্বীকার করবার উপায় নেই, লোক-ব্যবহারে শব্দটির এ অর্থই প্রচলিত ছিল। যাত্রা-পাঁচালি-কথকতা-মঙ্গল গান প্রভৃতির মধ্যে মধ্যে প্রকীর্ণ বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছড়ানো এবং পর পর গ্রথিত কবিতাংশই ছড়া নামে অভিহিত হত, এবং এই ছিল তখন তার বিশেষত্ব। পরে অবশ্য ধারাবাহিকতাহীন অসংলগ্ন 'ছুটকো ছন্দময় রচনা' অর্থে ছড়া শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। হিন্দী 'ফুটকল' কবিতা এবং সংস্কৃত চাণক্য শ্লোক এরই সমজাতীয়।

কোন একটি ছত্র বা ছত্রাংশের মধ্যে যেমন একটি সম্পূর্ণভাবের অংশমাত্র অভিব্যক্ত হয়ে থাকে, প্রচলিত ছড়ার মধ্যেও তাই হয়ে থাকে। এর মধ্যে সুসংবদ্ধ, সুসংলগ্ন কোন সামগ্রিক ভাবের ও রূপের পূর্ণ প্রকাশ বা পরিণতি দেখা যায় না। যখন তা পাঁচালি-কথকতা বা গল্প বলার মধ্যে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে কবিতাছত্র বা ছত্রাংশ বলে মনে করতে কোন দ্বিধা বা সংশয় উপস্থিত হয় না। অন্যপক্ষে ঘুমপাড়ানি গান বা ছেলেভুলানো ছড়া যা স্বতন্ত্র 'ছুট্‌কো-ছন্দময় রচনা' বলে পরিগণিত, তাদের মধ্যেও ভাবের অসংলগ্নতা, অসংবদ্ধতা এবং পরিণতির অভাবই এক সাধারণ লক্ষণ। বস্তুতঃ পূর্ণরূপ করিতায় কবির কল্পনা বিচরণ করে ভাব থেকে রূপে, রূপ থেকে ভাষায়, কিন্তু ছড়ায় কল্পনা যায় রূপ থেকে ভাবে, ভাষা থেকে রসে এবং তাতেও রূপ ও ভাবের মধ্যে কোন যোগাযোগ বা সঙ্গতি একান্তভাবে আবশ্যক হয় না। রবীন্দ্রনাথও একথাই ব্যক্ত করেছেন তাঁর আশ্চর্য সুন্দর ভাষায়,—"ইহার মধ্যে ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ নাই সে কথা নিতান্তই পক্ষপাতী সমালোচককেও স্বীকার করিতে হইবে। কতকগুলি অসংলগ্ন ছবি নিতান্ত সামান্য প্রসঙ্গসূত্র অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। একটা এই দেখা যাইতেছে কোন প্রকার বাছ-বিচার নাই, যেন কবিত্বের সিংহদ্বারে নিস্তব্ধ শারদ মধ্যাহ্নের মধুর উত্তাপে দ্বারবান বেটা দিব্য পা ছড়াইয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কথাগুলো ভাবগুলো কোনো প্রকার পরিচয় প্রদানের অপেক্ষা না রাখিয়া, কোনরূপ উপলক্ষ অনুসরণ না করিয়া, অনায়াসে তাহার পা ডিঙাইয়া, এমনকি মাঝে মাঝে লঘু করস্পর্শে তাহার কান মলিয়া দিয়া, কল্পনার অভ্রভেদী মায়াপ্রাসাদে ইচ্ছাসুখে আনাগোনা করিতেছে; দ্বারবানটা যদি ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ একবার চমক খাইয়া জাগিয়া উঠিত তবে সেই মুহূর্তেই তাহারা কে কোথায় দৌড় দিত তাহার আর ঠিকানা

পাওযা যাইত না।" (ছেলে ভুলানো ছড়া, লোকসাহিত্য)

আসল ছড়া চিত্রধর্মী, চিত্র সৃষ্টি হওয়াটাই তার মূল কথা। ছড়ায় একের পর এক ছবি আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে, কিন্তু সে সব ছবির মধ্যে কোন পারস্পরিক যোগ বা বাস্তব-অবাস্তবের সম্ভব-অসম্ভবের ভেদ থাকে না। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, এই ছড়াগুলো যাদের জন্য রচিত তারা এর থেকে আনন্দ পায়-নির্বিশেষ আনন্দ, প্রত্যক্ষ বাস্তবতাব আনন্দ। অবশ্যই এ বাস্তবতা রবীন্দ্র-প্রযুক্ত অর্থে বাস্তবতা। তাঁর ভাষাতেই বলা যায়, "এই বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদা সর্বদা হয়ে থাকে, যুক্তিসঙ্গত। যে কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব। ছন্দে ভাষায় ভঙ্গিতে যখন সেই বাস্তবতা জাগিয়ে তোলে সে তখন ভাষায় রচিত একটি শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে। তাব কোনো ব্যবহারিক অর্থ না থাকতে পারে, তাতে এমন একটা কিছু প্রকাশ পায় যা tease us out of thought as doth eternity." (সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের পথে)

ছড়ার এই বাহ্য পারিপাট্যের অভাব এবং ভাবের অসংলগ্নতা থেকে অনুমিত হয় যে এগুলো মূলতঃ প্রাচীন লোক সমাজেরই সৃষ্টি। জন্মসূত্রে কোন পরিশীলিত উন্নত মনেব রচনা নয। অবশ্য এবা যে কত পুরনো তা অনুমান করা খুবই কঠিন। তবে বাংলা ছড়ার অন্তর্গত ডাক ও খনার বচনের ভাষা দেখে অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে এগুলো ৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছে। আবাব অনেকে সাহিত্যক্ষেত্রে এদের প্রাচীনত্বকে সর্বাংশে মেনে নিলেও রচনাবলীর কোন সময় নির্দেশ করেননি। কারণ লোকমুখ বাহিত এইসব ছড়ার মধ্যে কিছু কিছু প্রাচীন শব্দ ও ভাষার ব্যবহার থাকলেও দেশকালোপযোগী নানা পরিবর্তনেব জন্য তার একেবারে সৃষ্টিকালীন রূপটির পবিচয় পাওয়া সম্ভবপর নয়। বাংলা ছড়ার বাকী অংশ অর্থাৎ অন্তঃপুরচারী মেয়েলি ছড়াসমূহেরও রচনাকাল আমাদের কাছে অজানা থেকে যায় ঐ একই কারণে। তবে এ ব্যাপারে পণ্ডিতেবা প্রায় সবাই একমত যে ছড়াই হল মানুষের আদিম কবিতা; এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এ ছড়া মূলতঃ শিশু বিষয়ক। রবীন্দ্রনাথ এই সব ছড়াকে বেদের সমসাময়িক বলে মনে করেছেন।

বস্তুতঃ সুদূর অতীতে মানুয যখন তার মনের বিচিত্র ও সহ-জ উপলব্ধিকে সুর ও ছন্দের বন্ধনে রূপ দিয়েছে তখনই সৃষ্টি হয়েছে ছড়ার; আর রবীন্দ্রনাথ মানুষের এই সহ-জ উপলব্ধির প্রকাশকেই উৎকৃষ্ট সাহিত্য বলে মনে করেন। সুতরাং এদিক দিয়ে ছড়ার সাহিত্যিক মূল্যকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না এবং কবি স্বয়ং ছড়ার এই স্বাভাবিক কাব্যরসের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

অন্যপক্ষে এই সব আদিম কবিতা বা ছড়ার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী কালের অনেক সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এ জন্যে কোন কোন সমালোচকের মতে ছড়া হল সাহিত্যের বীজ, বাণীর প্রথম অঙ্কুর। (শ্রী সুকুমাব সেন, শিশুবেদ)

এবার ছড়ার ভাষা ও ছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা সমীচীন মনে করি। ছড়ার ছন্দ একেবারে প্রাকৃত বা বাংলার দেশজ ছন্দ, ভাষা সহজ সরল প্রাকৃত বাংলা। উচ্চস্তর তথা classic ছন্দের সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্যই অনুভব করা যায় না।

বাংলা উচ্চারণ রীতি ও ঝোঁকের ওপর নির্ভর করেই এই ছন্দ বিকশিত। বাংলা উচ্চারণ রীতি পর্ব, শব্দ কিংবা বাক্যের আদিতে সহজ ঝোঁক প্রবণতা যুক্ত এবং বহুলাংশে হলন্ত ধ্বনিপ্রধান। ছড়ার ছন্দের তান স্পন্দন তথা মাত্রা-ঝঙ্কার এই ঝোঁক প্রবণতার হলন্ত উচ্চারণ পদ্ধতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই জন্যই সংস্কৃত ছন্দকে খাঁটি চলিত বাংলায় রূপ দিতে গেলে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়। অথচ ছড়ার ছন্দের বেলায় দেখি চলিত বাংলার কাঠামোটিই তার স্বাভাবিক আধার। ফলে ছড়ার মধ্যে একটা নির্ভেজাল বাঙালীমনের অনায়াস মাধুর্য ও সহজ সরল ভঙ্গী প্রকাশ পায়। এখানেই এর বিশেষত্ব, এবং রবীন্দ্রনাথকে ছড়ার এই অনায়াস মাধুর্যই মুগ্ধ করেছিল অনেকটা পরিমাণে।

এ পর্যন্ত ছড়ার ব্যুৎপত্তি ও রূপাঙ্গিক সম্পর্কে আলোচনা কবা হল। এবার রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ও আলোচিত ছড়াগুচ্ছের প্রসঙ্গে আসা যাক। বাংলায় যে ছড়া সমূহ একান্তভাবেই মেয়েলি ও অন্তঃপুরচারী—কবি প্রধানতঃ সেগুলোকেই সংগ্রহ করেছেন এবং সামগ্রিকভাবে তাদের ছেলেভুলানো ছড়া নামে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, বৈজ্ঞানিক বিচারে রবীন্দ্র-নির্দেশিত সমস্ত ছেলেভুলানো ছড়াকে ঠিক একই শ্রেণীভুক্ত কবা যায় না, যদিও এদের অধিকাংশই শিশু বিষয়ক। এর অন্তর্গত ঘুমপাড়ানি ছড়া এবং শিশু মনোরঞ্জনের জন্য বচিত ছড়াগুলোকেই কেবল 'ছেলেভুলানো ছড়া'র পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। পণ্ডিত সুকুমার সেন এদের 'শিশুবেদ' আখ্যা দিয়েছেন এবং স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ 'নববেদ' নামে অভিহিত কবেছেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, এই 'শিশুবেদ' বা 'নববেদেব' আবৃত্তিকারিণী সাধাবণতঃ শিশুব জননী। এছাড়া কবিব সংগ্রহে আরও কিছু ছড়া আছে যাব আবৃত্তিকারক শিশু নিজে। এদেব বৈজ্ঞানিব দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে 'ছেলেখেলার ছড়া'। ববীন্দ্র সংগৃহীত অবশিষ্ট ছড়া সমূহ একান্তভাবেই মেয়েলি ছড়া; এব জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। ছেলেভুলানো ছড়াব যে রস তা এর মধ্যে নেই। বিশেষজ্ঞের মতে ছেলেভুলানো ছড়াকে যদি লোকসাহিত্যেব রোমান্স বলা যায়, তবে মেয়েলি ছড়াকে বলতে হয় লোক সাহিত্যের উপন্যাস। অর্থাৎ একথা স্পষ্ট যে 'ছেলেভুলানো' তথা 'মেয়েলি' ছড়ার কোনোটিরই সাহিত্যিক রসমূল্যকে অস্বীকার করা যায না; এবং রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এ কথা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করে তাকে আধুনিক সভ্য সমাজের আলোকলোকে আহ্বান কবে এনেছিলেন।

(৩) **কীর্তন**—লোককথা ও ছড়া ব্যতীত আব যে সমস্ত বিষয় ববীন্দ্রনাথের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, সে সবই প্রায় প্রকৃত পক্ষে সঙ্গীত। যেমন কীর্তন, বাউল, সাবি-জারি-ভাটিয়ালী প্রভৃতি। তা ছাড়া যাত্রা, পাঁচালী এবং কথকতাও আসলে গীতরস প্রধান। 'কবিগান'ও কবিওয়ালাদের তৈরী গান।

কিন্তু যেহেতু সাহিত্যই আমাদের আলোচনার বিষয় সেই হেতু এর মধ্যে সঙ্গীতের স্থান প্রসঙ্গাতিরিক্ত বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এসব সঙ্গীতের একদিকে যেমন রয়েছে সুরের আবেদন, অপরদিকে তেমনি ভাবের ও বসের। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা যেতে পারে এরা সঙ্গীত ও কাব্যের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। সুতরাং সাহিত্য ক্ষেত্রেও এদের মূল্য অপরিসীম। বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এসব গানের সুর যেমন রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ

করেছিল, তেমনি করেছিল বাণীও, তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্য-সাধনার মধ্যে তার পরিচয় নিহিত।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই এসে পড়ে কীর্তনের কথা; কবি যার সম্বন্ধে বলেছেন, "বাণীর প্রতি বাঙালির অন্তরের টান; এই জন্যই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে তো মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না—এই জন্যে বাংলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।

এর প্রমাণ দেখো আমাদের কীর্তনে। এই কীর্তনের সংগীত অপরূপ কিন্তু যুগলভাবে গড়া—পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবেই এর সার্থকতা। পদাবলীর সঙ্গেই যেন তার রাসলীলা; স্বাতন্ত্র্য সে সইতেই পারবে না।" (আমাদের সংগীত, সংগীত চিন্তা)

প্রথমেই এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, বর্তমান আলোচনায় বিদগ্ধ-বৈষ্ণব কবিসমাজ রচিত উচ্চতর ভাবসম্পন্ন 'পদাবলী কীর্তন' কে গ্রহণ করা হয়নি, তারও চেয়ে গভীরতর মৌলিক অর্থেই আমরা 'কীর্তন' শব্দটি ব্যবহার করেছি। যদিও 'পদাবলী-কীর্তনের' ওপর রবীন্দ্রনাথের সুগভীর আকর্ষণ ও কবি-মনের ওপর তার প্রভাব সর্বজনজ্ঞাত অনস্বীকার্য ঘটনা তবুও কীর্তনের লোকায়ত রূপটিই বর্তমান উপলক্ষে আমাদের একমাত্র গ্রহণীয়। কারণ লোকসাহিত্যই তো আমাদের আলোচনার মূল উপজীব্য বিষয়।

এই সূত্রে দেখি, কীর্তন শব্দটির অর্থ ও ব্যুৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানারকম অভিমত প্রকাশিত হয়েছে।

লোকসাহিত্য বিশেষজ্ঞ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, বাংলাদেশের প্রত্যন্তবর্তী ছোট নাগপুরের অধিবাসী 'ওরাওঁ'দের সমাজ থেকেই 'কীর্তন' শব্দটির বাংলা সাহিত্যে অনুপ্রবেশ। কারণ তাদের মধ্যে প্রচলিত নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট অংশের নাম কীর্তন; এবং এ সঙ্গীত মূলতঃ প্রেমসঙ্গীত। তিনি আরও বলেছেন যে, এরা দ্রাবিড়ভাষী; প্রাচীনকাল থেকে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়দের মধ্যে 'কীর্তন' শব্দটি সঙ্গীত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, অথচ উত্তর ভারতের আর্যভাষী কোন অঞ্চলে এই অর্থে শব্দটির প্রচলন পুরাকালে দেখা যায় না। বাংলাদেশে ইদানীন্তন কালে 'কীর্তন' বলতে প্রধানতঃ রাধা-কৃষ্ণলীলা বিষয়ক এক জাতীয় প্রেমসঙ্গীতকেই বোঝান হয়ে থাকে।

অপর বিশেষজ্ঞ বিমান বিহারী মজুমদারের আলোচনায় দেখি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের দ্রাবিড়ভাষী দাক্ষিণাত্যের 'শিলাপ্পাদিকারম' বা 'নূপুরের কাব্যে'র মধ্যে আছে কীর্তনের পূর্বাভাস। এর ভাবকাহিনী ও রসের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রচলিত রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় কাহিনীর ভাব ও রসের অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

লক্ষ্যণীয় বিষয়, বাংলাদেশে দশম শতাব্দীর আগে কীর্তনের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, অথচ দ্রাবিড় বা ওরাওঁদের মধ্যে বহু পূর্ব থেকেই এ জাতীয় সঙ্গীতের এবং সঙ্গীতার্থে কীর্তন শব্দের প্রচলন দেখা যায়। অতএব ওদের থেকে বাংলায় কীর্তন ঐতিহ্যের প্রবেশ লাভ কিছু অসম্ভব নয়। তবে বাংলা কীর্তনের সুর মূলতঃ যেখান থেকেই আসুক, এর মধ্যে এখন আর তার প্রাচীন রূপটি খুঁজে বার করা সহজ নয়। আজ তা একান্তভাবেই বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে এবং এর মধ্যেই একদিন সমগ্র বাঙালী জাতি,

আপন আবেগ প্রকাশের পথ পেয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য বৈষ্ণব প্রভাব বশতঃ এর মধ্যে অনেক উচ্চতর ভাব ও সূক্ষ্ম কল্পনা আরোপ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে উচ্চাঙ্গ তাল-মান-রাগ-রাগিণীও। তাই এখন আর একে লোকায়ত বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আসলে কীর্তনের লোকায়ত চারিত্রগুণেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন; তাঁর মতে, "কীর্তন জিনিষটা আমাদের বাংলাদেশের একেবারে নিজস্ব অমূল্য সম্পদ। এর মধ্যে ধার-করা কোথাও কিছু নেই। সবটাই তার সম্পূর্ণ নিজের সৃষ্টি। সুরধারা, ভাবধারা, তালের ধারা, গাইবার প্রণালী, পদ্ধতি, ভঙ্গী, সব নতুন, তার গঠনও নতুন।" (সাহানা দেবী রচিত 'কবির সংস্পর্শে' প্রবন্ধে উদ্ধৃত) বস্তুতঃ অধুনাতন আভিজাত্য আরোপণেব পরেও অধুনাতন কীর্তনের মধ্যেও প্রেম বিষয়ের প্রাধান্য, গানের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত নৃত্য, এবং উৎস-স্থিত প্রত্যন্তবর্তী লোকসমাজের সুর সংযোজনার ক্ষীণ আভাস থেকে তার প্রথম উদ্ভব মুহূর্তের লৌকিক রূপ খানিকটা অনুভব কবা যায়। প্রসঙ্গসূত্রে উল্লেখযোগ্য, উচ্চতর সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্রে সমবেত নৃত্য লুপ্ত হলেও বৈষ্ণব 'কীর্তনীয়াকুল' গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করেন এবং এটি মূলতঃ লোকসমাজগত বৈশিষ্ট্য।

বাংলা সাহিত্যে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কীর্তনের প্রথম যে পরিচয় পাই তার মধ্যে কিন্তু বর্তমানকালের বৈষ্ণব ভাবের উপস্থিতি নেই, আছে বৌদ্ধ ধর্ম ভাবনার প্রাধান্য। ঐ সময়কার ইতিহাসে দেখি, বৌদ্ধ মহাযানী সম্প্রদায় 'মহীপালের গীত' কীর্তন করত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এই মহীপালের গীতের প্রসঙ্গ বিস্তারিত করে বলেছেন,— "The songs of Mahipal have already been spoken of Buddhist songs in Bengal become the fashion of the day. This was, I believe, the beginning of the Kirtana songs." (Mahamahopadhyaya Hara Prasad Sastri (Ed) Rama Charitam of Sandhyakar Nandy, –Introduction.)

আর এইসব গান বিশেষভাবে গীত হত গ্রাম্য কৃষকাদি লোক সমাজের মধ্যে। এদিক দিয়েও কীর্তনের লোকসম্ভবতা এবং লোকপ্রিয়তার পরিচয় প্রমাণিত হয়।

অবশ্য কীর্তনের এই রূপটি বহুদিন পর্যন্ত প্রাধান্য পায়নি। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবনে এই গীতি ধারার ব্যাপক প্রসার দেখে তাকে অধুনা বৈষ্ণব সমাজ থেকে উদ্ভূত বলেই মনে করা হয়ে থাকে। তবে এর ব্যাপক প্রচলন ও উন্নতি যে বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাবেই হয়েছে এ কথা অনস্বীকার্য। আজ আমাদের দেশে খেতুরীর মহোৎসব থেকে কীর্তনের পরিচয় সন্ধান অভ্যস্ত পন্থা হয়ে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন আমাদের দেশে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসৃতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। সুতরাং বৌদ্ধ লোকসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত সঙ্গীতের ভাব ও সুর ক্রমপরিবর্তিত হয়ে বৈষ্ণব সমাজে স্থান লাভ করে তাদেরই একান্ত নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে।

অনেকেই মনে করে থাকেন যে, চৈতন্যদেবই কীর্তনগানের প্রবর্তক। কিন্তু পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুমানের প্রামাণ্য শিথিল হয়ে পড়ে।

অন্যপক্ষে প্রচলিত বৈষ্ণব সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে কীর্তন বলতে বিশেষার্থে সুর-তাল

সহযোগে ভগবানের নাম কীর্তনকেই বোঝায়। আর ভগবান এখানে বিষ্ণু-কৃষ্ণ। আসলে বিষ্ণুর কাহিনী সবই পুরাণের অন্তর্ভুক্ত যার বীজাকার পূর্বভাগ বৈদিক সাহিত্যে কিছু কিছু দেখা যায়। আর কৃষ্ণলীলা বিশেষতঃ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীতগুচ্ছ লোকসংস্কারে পূর্বাবধি প্রচলিত ছিল এবং পরে সেগুলো বৈষ্ণব সঙ্গীতের মত উচ্চতর সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে।

বস্তুতঃ নামকীর্তনের প্রাথমিক বৈষ্ণব প্রবণতার সঙ্গে লোকসংস্কারাগত কাহিনী ও সুরধারার মিলনের পরিণামেই বর্তমান কালের পদাবলী বা পালা কীর্তনের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। অতএব দেখা যায়, আদিম লোকগোষ্ঠীর সূত্রে প্রাপ্ত কীর্তনের ঐতিহ্য বৌদ্ধধর্ম বা সমাজের মাধ্যমে পরবর্তী বৈষ্ণব পালাকীর্তনের পরিণতি লাভ করেছে। আর এই পরিণাম লাভ একদিনের কথা নয়, নবম বা দশম থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে তাব ক্রমবিকাশ ঘটেছে।

তারপব চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই নামকীর্তন ও লীলাকীর্তনের সম্মিলিত রূপ পালা-কীর্তন সাবা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর মধ্যে বৈষ্ণব সমাজ অনেক সুউচ্চ ভাব ও গঠন শৈলীর ব্যবহার করেন, যা অভিজাত বিদগ্ধ সমাজের রসগ্রহণেব উপযুক্ত হয়ে ওঠে। তখনই কীর্তনের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের পবিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

কিন্তু এই উচ্চতর ভাবরূপ গ্রহণ করার ক্ষমতা দেশেব বৃহত্তব নিরক্ষর লোকসমাজের পক্ষে সহজগম্য হবাব কথা নয। অথচ বৈষ্ণব ধর্মেব প্লাবনের ঢেউ তাদের মধ্যেও লেগেছিল। ফলে তখনই প্রয়োজন হয়েছিল কীর্তনের এমন একটি সরলীকৃত রূপের যা সকলেবই অনুভব গ্রাহ্য ও একান্তভাবেই লোকসমাজেব ঐতিহ্যে অধিবাসিত। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কীর্তনের আরও একটি বিশিষ্টতা আছে। সেটাও ঐতিহাসিক কারণেই। বাংলায় একদিন বৈষ্ণব ভাবের প্রাবল্যে ধর্মসাধনায বা ধর্ম রসভোগে একটা ডিমোক্র্যাসিব যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তেব আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভাব আসরে নয, রাস্তায ঘাটে। বাংলাব কীর্তনে সেই জনসাধাবণেব ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা প্রশস্ত জাযগা হল।" (আলাপ আলোচনা, সংগীত-চিন্তা)

কিন্তু কিভাবে এই ডিমোক্রাসির বিস্তার কীর্তনের জগতে রূপ পেল, সে সম্পর্কে কৌতূহল দেখা দিতেই পারে। তার উত্তরে বিশেষজ্ঞেব অভিমত, গায়েনরাই অনেকটা পবিমাণে এ কাজ সংঘটনের কারণ ও সহায়ক। প্রায় নিরক্ষব স্বল্পশিক্ষিত গ্রাম্য গায়েনগণ যখন গ্রাম্য জনসাধারণের কাছে পদাবলী গান করতেন তখন তাকে অনেকটা সরলীকৃত করে নিতেন। শুধু তাই নয়, অনেক সময়ই নিজেদের মনেব মত কবে আখর সংযোজনা করতেন এবং কৌতূহলী শ্রোতারা তার থেকে রস আস্বাদন করতে পারত। এইভাবে গায়েনদের দ্বারা পরিবর্তিত হতে হতে অনেক ক্ষেত্রেই কীর্তন এক সম্পূর্ণ নতুন রূপ লাভ করেছে; তখন সে আর কেবল উচ্চতর সমাজের ধন হয়ে থাকেনি—এটি সামগ্রিক জনসমাজের ফসলে পরিণত হয়েছে, লোকপ্রিয়তাই ছিল যার প্রধান সম্পদ। অবশ্য এখানে লোকসমাজ অর্থে বুঝব সেই সমাজ রবীন্দ্র-প্রযুক্ত অর্থে আগেই যার সংজ্ঞার্থ নির্দেশিত হয়েছে;—ভদ্র অভিজাত সমাজের অন্তেবাসী সে এক শিক্ষাদীন জন-সমাজ যারা উচ্চতর সমাজের পরিত্যক্ত চিন্তাধারাকে গ্রহণ করে সম্পূর্ণ নিজের মত করে

আপন করে নেয়। এদিক দিয়ে এ জাতীয় কীর্তন যে একেবারে লোকাযত সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

লোকসমাজের আত্মীকৃত আভিজাত্যপূর্ণ বৈষ্ণব কীর্তনের এমনি এক সার্থক লোকায়ত রূপকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায় অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে। কীর্তনের আসর ভক্ত বিদগ্ধ বৈষ্ণব-সমাবেশের বাইরেও প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কীর্তনের মধ্যে দিয়ে গৌরাঙ্গ লীলার ও কৃষ্ণলীলার রস নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে কীর্তনের আশ্রয় (অর্থাৎ পদাবলী) এক ঢং (অর্থাৎ সুর) লোক-সাধারণের পরিচিত রূপ ও রঙ দেবার চেষ্টা করেছে। এ জাতীয় কীর্তনকে বলা হয ঢপ-কীর্তন। এরও জনপ্রিয়তা তখন কম ছিল না।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ঢপকীর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিশেষ পবিলক্ষিত না হলেও বিষয় ও সুববৈশিষ্ট্যে কীর্তনের এই লোকায়ত সহজ মাধুর্যই কবিমনকে আকর্ষণ করেছিল। আর ঐ লোকচারিত্র্য যুক্ত কীর্তনকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ ও আন্তরিকতার সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাঁবই রচনায়।

(৪) **বাউল** — কীর্তনের মত বাউলও মূলতঃ সঙ্গীত। এবং কেবলমাত্র সুর নয, বাণীর মাধুর্য ও ভাবের ঐশ্বর্যই রবীন্দ্রনাথেব বাউল গানের প্রতি সুগভীব আকর্যণের প্রধান কারণ। শুধু তাই নয়, লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয়েব চেয়ে বাউলেব প্রতি কবিব অনুবাগ এবং কবি-মনের ওপর বাউলের প্রভাব সর্বাধিক। এব ভাবধাবা তাঁব মনের গভীরে মিশে গেছে সহজেই। তাঁর সমগ্র জীবনেব কাব্যে-সাহিত্যে এবং বিশেষতঃ সঙ্গীতে তাব প্রমাণ মেলে। অবশ্য সঙ্গীতের আলোচনা আমাদের প্রসঙ্গ বহির্ভূত / বাউলেব প্রতি তাঁব নিজেব এই অনুরক্তি সম্পর্কে তাঁর নিজের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয;- "আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল-পদাবলীর প্রতি আমার অনুবাগ আমি অনেক লেখায প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ কবেছি। এবং অনেক গানে অন্য বাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমাব জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গিয়েছে।" (আশীর্বাদ, হারামণি, প্রথম খণ্ড, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত)

কিন্তু আলোচনার শুরুতেই বলে রাখা ভাল, বিশেষজ্ঞদের অনেকেই বাউলগানকে লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চান না। তাঁদের মতে বাউল গান 'আধ্যাত্মিক দর্শন' মাত্র; এর মধ্যে কবিমনের সহজ উপলব্ধির প্রকাশ দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, একান্তভাবে সাধকের 'সূক্ষ্ম ব্যক্তিসাধন জাত আধ্যাত্মিক অনুভূতি'ই অভিব্যক্তি লাভ করেছে এ সব গানে। পারিপার্শ্বিক সমাজ বা লোকসমাজের সামগ্রিক চৈতন্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার; সুতরাং একে লোকজীবনসম্ভব কাব্য বলা সঙ্গত নয়। অন্যপক্ষে বাউল গানে এমন অনেক গূঢ়ার্থ প্রকাশ পায় যা একমাত্র সাধক ছাড়া অন্য কারও অনুভবগম্য নয়। এবং এই সর্বজনগ্রাহ্য আবেদনহীনতাই তার সাহিত্য তথা লোকসাহিত্য হয়ে ওঠার একটি প্রধান

অন্তরায়।

বিশেষজ্ঞ মহলের এই মতামতকে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এর মধ্যে অনেক আধ্যাত্মিক গূঢ়ার্থ ও দার্শনিক তত্ত্ব অভিব্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বাউলের অনেক গানের মধ্যেই উচ্চ শ্রেণীর কাব্যসৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন এবং তিনি সে সমস্ত গানকে লোকসঙ্গীত তথা লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। যেহেতু রবীন্দ্রমননে ও সৃষ্টিতে লোকসাহিত্যের স্থান মূল্যায়নই আমাদের লক্ষ্য, সে কারণে আমরা রবীন্দ্র দৃষ্টির আলোকেই বাউল গানকে বর্তমান আলোচনার অঙ্গীভূত করা সমীচীন বলে মনে করেছি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর *Creative Unity* গ্রন্থে 'বাউল প্রসঙ্গের' আলোচনা করেছেন 'An Indian folk-religion' শিরোনামে। এর থেকে স্পষ্টই অনুমিত হয়, বাউলদের ধর্মকে তিনি 'লোকধর্ম' বলেই মনে করতেন।

আর এক দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বাউল সমাজকে 'লোক' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করার ঘটনাটি যুক্তিগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। আগেই বলেছি, এক বিশেষ সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী ভদ্র সমাজের প্রত্যন্তবর্তী নিরক্ষর গ্রাম্য সমাজই লোকসমাজ বলে স্বীকৃত। বাউল সমাজও তাই; এবং ভদ্রসমাজ থেকে দূরাবস্থানই তাঁদের নিজস্ব প্রেমের সাধনার পথে, আত্মোপলব্ধির পথে সহায়তা করেছে। তাঁদের এই নিভৃত সাধনাজাত উপলব্ধির প্রকাশ দেখা যায় তাঁদের গানে। সুতরাং এদিক দিয়ে বাউল গান লোকমানসেরই ফসল।

তবে এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যে সমস্ত গানের মধ্যে কেবলমাত্র সাধনার গূঢ় তত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে সে জাতীয় গানের প্রতি এবং বাউল সাধনার নিগূঢ় রহস্যময় দিকটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হননি কখনও; হয়তো এদিকটা বহুলাংশে তাঁর অজ্ঞাতও ছিল। বর্তমান আলোচনা সূত্রে আমরাও স্বাভাবিক কারণেই এ-প্রসঙ্গ পরিহার কবব।

অবশ্য এমন অনেক বাউল গানের সন্ধান পাওয়া যায়, যা গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কাব্য-সৌন্দর্যে অনবদ্য। এর মধ্যে সাধকের উপলব্ধির আনন্দময় প্রকাশ ঘটেছে এবং মনে হয় তা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হবার যোগ্য। এই জাতীয় বাউল গানের রসেই রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছেন এবং একে লোকসাহিত্যের বিষয় মনে করেই তিনি বলেছেন, "ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেচে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।" (তদেব)

অতএব, এই রবীন্দ্র-প্রত্যয়কে স্বীকার করে এবারে যথারীতি 'বাউল' শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস এবং তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। এ বিষয়েও পণ্ডিত মহলে নানারকম অভিমত প্রচলিত।

কোন কোন সমালোচকের মতানুসারে 'বাউল' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে 'বায়ু' এই শব্দের সঙ্গে 'আছে' এই অর্থে 'ল' প্রত্যয়ের সংযোগে। যোগ-শাস্ত্রে এই 'বায়ু' শব্দ স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে সাধক সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার

ও প্রসারের সাধনা করেন তাঁরাই 'বাউল'। আবার অনেকে বলেন, বায়ু মানে শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থাৎ জীবন ধারণ; এবং যাঁরা তা সংরোধ করে দীর্ঘ জীবনলাভের সাধনা করেন তাঁরা 'বাউল'।

আবার অন্য মতে, সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দটির অপভ্রংশ এই 'বাউল' শব্দটি। অর্থাৎ অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে 'বাউল' এর অর্থ পাগল। অবশ্য বায়ুগ্রস্ত কথাটিও পাগল অর্থেই সাধারণ্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ 'বায়ুর' সঙ্গে 'ল' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন শব্দটিও এদিক দিয়ে একই অর্থদ্যোতক। এবং উল্লেখযোগ্য বাউলরা নিজেদের পাগল বলেই মনে করেন এবং সেইভাবে আত্মপ্রচারও করে থাকেন। তাঁরা শাস্ত্র মানেন না, লোকাচার মানেন না, সাধারণের জীবনধারার সঙ্গে তাঁদের জীবনধারার কোন মিল নেই।

অন্যপক্ষে 'ব্যাকুল' শব্দটি থেকেও এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ সম্ভবপর। দেবতা বা মনের মানুষের জন্য যার মন ব্যাকুল হয়েছে, সে বাউল নামেই অভিহিত হতে পারে। বাউল সম্প্রদায়ের মানুষরা দেবতাকে স্বতন্ত্র করে চেনেন না, তাঁকে 'মনের মানুষ' বলেই মনে করে তারই সন্ধানে ব্যাকুল হন। এই অর্থে তাই তাঁরা বাউল।

এছাড়া আরবী ৱলী বা ওয়ালী শব্দটি থেকে বাউল শব্দটি বাংলায় প্রচলিত হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। মহা বাউল বা শ্রেষ্ঠ বাউল বলতে বুঝি আউব্‌ল ৱলী (আউল ওয়ালী) বা উয়ালীয়ে আউল। এই আউল-ওয়ালীই বোধ হয় আউল বাউল রূপে বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আবার 'ৱলী'র বহুবচন আউলিয়া। 'ৱলী' বলতে বোঝায় বন্ধু, সেবক, সাধক।

বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, আলোচ্য যে কোন শব্দ থেকেই 'বাউল' শব্দটি উদ্ভূত হোক না কেন, অর্থ ও ভাবগত দিক দিয়ে এদের মধ্যে একটি পারস্পরিক সংযোগ অনুভব করা যায়। এক দিকে তারা যেমন নিজেদের পাগল মনে করেন, অপরদিকে তেমনি তাঁরা ঈশ্বরের অন্বেষণে ব্যাকুল হয়েও ফেরেন। সেজন্যে 'বায়ুগ্রস্ত', 'বাতুল', বা 'ব্যাকুল' যে কোন পূর্বসূত্র থেকেই 'বাউল' শব্দটির উৎপত্তি কল্পনা করা অসঙ্গত বলে মনে হয় না, তাঁরা ঈশ্বরকে 'বন্ধু', 'মনের মানুষ' বলেই মনে করেন। সেই 'মনের মানুষে'র সন্ধানই তাঁদের সাধনার মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং আরবী ৱলী বা ওয়লী শব্দটিকেও এর উৎস মনে করা একেবারে অসঙ্গত নয়।

এই 'শাস্ত্রভার মুক্ত' বাউল মতের উদ্ভব এই বাংলাদেশেই। কিন্তু কবে এই মত এখানে প্রসার লাভ করেছিল জানা যায় না। এজন্য অনুমানের ওপরই নির্ভর করতে হয়। আদি-মধ্যযুগের কাব্য মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে' 'বাউল' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ দেখা যায়। অতঃপর চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতিতে 'বাউল' ও 'মহাবাউল' শব্দটির ব্যবহার অনেকবারই হয়েছে। তবে অধুনা 'বাউল' শব্দের দ্বারা যে বিশেষ সম্প্রদায়ের মত, পথ ও সাহিত্য চিহ্নিত হয়ে থাকে এসব ক্ষেত্রে তা হয়নি। বিশেষজ্ঞরা প্রায় সকলেই একমত যে বর্তমান অর্থে প্রচলিত 'বাউল গান' ও 'বাউল মত'-এর সৃষ্টি ও ব্যাপ্তি ষোড়শ শতকের শেষ কিংবা সপ্তদশ শতক থেকে আরম্ভ হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও এর ধারা কিছুটা চলেছে।

বাউল সঙ্গীত বলতে আমরা একশ্রেণীর মরমী সঙ্গীতকেই বুঝি, যার মধ্যে আছে প্রাচীনতম কাল থেকে প্রচলিত অনভিজাত ধর্মসংস্কৃতি, মতবাদ ও ভাবধারার বিমিশ্র উপাদান। পণ্ডিতেরা মনে করেন বেদের কোন কোন অংশের মরমীয়া সুর, উপনিষদের পরমাত্মার অন্বেষণ, জৈন, বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব সহজিয়াদের সহজ সাধনা, নাথ যোগীদের শূন্যবাদ, কবীর, দাদূ প্রমুখ সন্তদের শাস্ত্রাচার মুক্ত মতবাদ এবং বিশেষ ভাবে মুসলমান সূফী সাধকদের প্রেম সাধনার একীভূত রূপের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় বাউলের গানে।

মনে রাখা প্রয়োজন, এইসব বিভিন্ন ভাবধারার মিলন এদেশে একদিনে হয়নি বা কোন সচেতন প্রয়াসের ফলেও নয়। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পর্যায়ের অভিজ্ঞতালব্ধ 'উপলব্ধি' ভদ্রেতর এক বিশেষ সম্প্রদায়ের চেতনায় ধীরে ধীরে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তারই পরিচয় পাওয়া যায় তাদের সৃষ্টিতে। আর রবীন্দ্রনাথের কৌতূহলী দৃষ্টি এই লৌকিক রসসৌন্দর্যের প্রতি কেমন করে আকৃষ্ট হয়েছিল পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে সে কথা আলোচিত হবে।

(৫) **যাত্রা-পাঁচালি-কথকতা**—যাত্রা-পাঁচালি-কথকতা গীতিরস প্রধান হলেও কীর্তন বা বাউলের মত মূলতঃ সঙ্গীত নয়। যাত্রা তো দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে প্রচলিত অভিনয় সাহিত্য, পাঁচালি গেয় আখ্যায়িকা কাব্য, কথকতা 'কথা'রই একটি স্বতন্ত্র ধাবা যা কথকঠাকুর কর্তৃক সাধারণের নিকট পরিবেশিত হয়ে থাকে; অবশ্য এদের মধ্যে সঙ্গীতের অনায়াস প্রবেশাধিকার থাকায় এরা আবার 'যাত্রাগান' 'পাঁচালিগান' ইত্যাদি অভিধায়ও অভিহিত হয়ে থাকে। এদের এই গীতিময়তায় মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "বিদেশী অলংকার শাস্ত্র পড়বাব বহু পূর্ব থেকে আমাদের নাট্য ; যাকে আমরা যাত্রা বলি, সে তো গানেব সুরেই ঢালা। সে যেন বাংলাদেশের ভূসংস্থানের মতো; সেখানে স্থলের মধ্যে জলের অধিকারই যেন বেশি। কথকতা, যেটা অলঙ্কাব শাস্ত্রমতে ন্যারেটিভ শ্রেণীভুক্ত, তার কাঠামো গদ্যের হলেও স্ত্রী-স্বাধীনতা যুগের মেয়েদের মতোই গীতিকথা তার মধ্যে অনায়াসেই অসংকোচে প্রবেশ করত। মনে তো পড়ে—একদিন তাতে মুগ্ধ হয়েছিলুম। সাহিত্য রচনার প্রচলিত পাশ্চাত্য বিধির কথা স্মরণ করে উদ্বেল আনন্দকে লজ্জিত হয়ে সংযত করিনি তো।" (শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান, সংগীতচিন্তা)

এছাড়া তিনি কখনও কখনও এদের লোকসঙ্গীত বলেও উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যদিও যাত্রা-পাঁচালি-কথকতাকে লোকসংগীত তথা লোকসাহিত্য বলে পরিগণিত করেছেন, তা সত্ত্বেও এই সব সাহিত্য মূলতঃ পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে রচিত হওয়ায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এদের লোকসাহিত্যভুক্তি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়। তবে কোনও কোনও আধুনিক সমালোচক 'পাঁচালি'কে লোকসাহিত্য বলে স্বীকৃতি না দিলেও 'পাঁচালি' নামটিকে লোকসংস্কৃতির অন্তরঙ্গ মনে করে লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একেও আলোচনায় স্থান দিয়েছেন। শুধু তাই নয় অনেকেই আবার যাত্রাকে লোকনাট্য বলেও অভিহিত করেছেন।

অবশ্য একথাও ঠিক আমাদের পূর্বনির্দেশিত রবীন্দ্র-প্রযুক্ত অর্থে লোকসমাজ বলে যাবে বুঝি সেই 'গ্রাম্য' সমাজের সঙ্গে যাত্রা-পাঁচালি কথকতার সুদৃঢ় সংযোগ বিদ্যমান; এবং

রবীন্দ্রনাথও এ সত্য গভীরভাবে অনুভব করেই এদের লোকসঙ্গীত তথা লোকসাহিত্য বলে অভিহিত করতে দ্বিধা করেননি। প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক বিষয়বস্তু উপজীব্য হলেও যাত্রার অভিনয় কালে এবং পাঁচালি ও কথকতা যথাক্রমে মূল গায়েন ও কথকঠাকুরের দ্বারা পরিবেশিত হওয়ার সময়ে লোকরুচি অনুযায়ী অনেকটা পরিমাণ পরিবর্তিত হয়ে লোকায়ত রূপ লাভ করে থাকে। ফলে তা মূলতঃ উচ্চতর সমাজমানসের ফসল হলেও রসাবেদনে সে লোকমানসকেও পরিতৃপ্ত করে অনায়াসে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবে দেখা যাত্রা 'নল দময়ন্তীর পালা' সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার মধ্যে সামগ্রিক ভাবে এই লোকায়ত বৈশিষ্ট্যটি স্ফুটতর হয়েছে,—

"এই যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটয় ঘেঁষাঘেঁষি। তাদের বেশির ভাগ মানুষই, ভদ্দরলোকেরা যাদের বলে বাজে লোক। তেমনি আবার পালাগানটা লেখানো হয়েছে এমন সব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া কলমে, যারা ইংরেজি কপিবুকের মকশো করেনি। এর সুর, এর নাচ, এর গল্প বাংলাদেশের হাট মাঠের পয়দা-করা; এর ভাষা পণ্ডিতমশায় দেননি পালিশ করে।" (ছেলেবেলা)

একথা শুধু যাত্রা সম্পর্কে নয়, কথকতা পাঁচালি সম্পর্কেও প্রযোজ্য; এবং এদের এই লোকায়ত রূপটিই আমাদের আলোচনার বিষয়।

যাত্রা, পাঁচালি ও কথকতা এই তিনটি কথাই স্বতন্ত্র ও বিশেষ অর্থে বাংলা দেশে প্রচলিত, এবং বর্তমানে এদের রূপাঙ্গিকও স্বতন্ত্র। এদের উৎপত্তির ইতিহাস ও স্বরূপ সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে নানরকম মতবাদ প্রচলিত থাকলেও একটি বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত যে, অতীতে এরা পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এমনকি অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে কৃষ্ণ যাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রা প্রভৃতি বিশিষ্টতা অর্জন করলেও তাদের সঙ্গে কবি-পাঁচালি-কথকতার সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। কারও কারও মতে পাঁচালি থেকেই যাত্রার উদ্ভব, কারও মতে কথকতা থেকে।

তবে এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এদের প্রত্যেকটি শাখার যে কোন একটির জনপ্রিয় কথা, ঢং ও উপকরণ অন্যান্য শাখায় অনেক সময়ই গৃহীত হত অনায়াসেই; সুতরাং কোন্ শাখা থেকে কোন্‌টি উদ্ভূত তা সঠিক করে বলা দুঃসাধ্য।

একথা স্মরণে রেখেই এসব রচনার সংজ্ঞার্থে এবং উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ ভাবে পৃথক পৃথক আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমে যাত্রার প্রসঙ্গেই আসা যাক।

'যাত্রা' বলতে আমরা বর্তমানে বিশেষ একশ্রেণীর অভিনেয় সাহিত্যকেই বুঝি। প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অভিনয় প্রসঙ্গেই 'যাত্রা' শব্দটির প্রচলন ছিল বলেই মনে হয়। বিশ্বকোষে এর সংজ্ঞার্থ নিরূপিত হয়েছে এইভাবে;—

"অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের সকল স্থানেই প্রকাশ্য রঙ্গভূমে বেশভূষায় ভূষিত ও নানা সাজে সুসজ্জিত নরনারী লইয়া গীত-বাদ্যাদি সহকারে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ অভিনয় করার রীতি প্রচলিত। পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থে বর্ণিত ভগবদবতারের লীলা ও চরিত্র ব্যাখ্যান করা এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ সেই দেব-চরিত্রের অলৌকিক ঘটনা পরম্পরা স্মরণ রাখিবার জন্য এক উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। গীত-বাদ্যাদি যোগে ঐ সকল

লীলোৎসব প্রসঙ্গে যে অভিনয়ক্রম প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহাই প্রকৃত যাত্রা বলিয়া অভিহিত।"

কিন্তু লক্ষ্যণীয়, এর মধ্যে যাত্রার প্রাচীনত্বের উল্লেখ থাকলেও এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কোন বক্তব্য প্রকাশিত হয়নি। পণ্ডিতদের অনুমান ঋগ্বেদের সূক্ত এবং কথোপকথনের মধ্যে নাটকের সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল। যাত্রাও যেহেতু নাটক তথা অভিনয় কলারই একটি জনপ্রিয় প্রচলিত রূপ, সুতরাং, তার পূর্বাভাসও এখানেই রয়েছে বলা যেতে পারে। রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যে নাটকের উল্লেখ না থাকলেও নট ও নর্তকের কথা আছে। এ সম্পর্কে অনেকের অনুমান এই নট ও নর্তকগণ মূকাভিনয় করতেন। পরবর্তীকালে অবশ্য 'হরিবংশে' এঁদের অভিনয়ের কথা আছে। 'হরিবংশ' খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের আগে রচিত নয়; এবং এই সময় থেকেই নাটকের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। আর এই ধরনের নাটকই হয়তো যাত্রার পূর্বাভাস।

অন্যপক্ষে 'যাত্রা' শব্দটিরও উল্লেখ পাওয়া যায় 'ঋগ্বেদে'। তখন তার অর্থ ছিল পিছন পিছন যাওয়া, দল বেঁধে শোভাযাত্রা করে যাওয়া। এই দল বেঁধে যাওয়া, আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হলে তাকে 'বিহারযাত্রা' এবং ধর্মকর্মের জন্য হলে 'ধর্ম্মযাত্রা' বলা হত। আর এই যাত্রায় ছিল নাচগান প্রভৃতিরই প্রাধান্য। 'হরিবংশের' বর্ণনা থেকে জানা যায়, 'যাত্রা' উপলক্ষে মেয়েরা সাজসজ্জা করে দেশী ভাষায় গান গাইত এবং সে গানের বিষয় ছিল 'কৃষ্ণলীলা'। মনে হয় উপরোক্ত যাত্রা অনুষ্ঠান এবং দেবতার নাট মণ্ডপে কোন এক সময়ে পূর্বোল্লিখিত নট এবং নর্তকগণের অভিনয়ের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল, তার ফলে বর্তমানে প্রচলিত 'যাত্রা' শিল্পের মধ্যে গান এবং অভিনয়ের অঙ্কুরাভাস নিহিত রয়ে গেছে।

অতঃপর ভরতের নাট্য শাস্ত্রে (খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতক) ও ভবভূতির মালতীমাধবে 'যাত্রা' কথাটির ব্যবহার পাওয়া যায়। এই 'যাত্রা' শব্দ এবং উৎসব অর্থ ছাড়া এর সঙ্গে বাংলাদেশে প্রচলিত যাত্রার অন্য কোন সাদৃশ্য আছে কিনা, সে সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ আছে।

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে আবার বঙ্গদেশে প্রচলিত 'ওড্রমাগধী' রীতিতে অভিনয়ের কথা বলেছেন। অবশ্য এ রীতি কেমন ছিল সে সম্পর্কে ভরত নীরব। অনেকে মনে করেন যে তাঁর এই নীরবতা থেকেই প্রমাণিত হয়, বাংলাদেশে অভিনয় কলার স্বতন্ত্র রীতি তো ছিলই, এমনকি তা আর্যসংস্কৃতির অনুকৃতিমাত্র ছিল না, বরং তা ছিল বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অভিমণ্ডিত। তবে বাংলাদেশে সেকালে প্রচলিত এই অভিনয় রীতির সঙ্গে বর্তমানের 'যাত্রা'র সাদৃশ্য কতখানি তা অনুমান করা সহজসাধ্য নয়। এ সম্পর্কে নানরকম বিতর্কিত মত থাকাটাই স্বাভাবিক।

অন্যপক্ষে 'যাত্রা' কে পুরোপুরি আর্যসংস্কৃতি মূলক শিল্প বলে মনে করাও ঠিক হবে না। যাত্রার ওপরে মৌলিক দ্রাবিড় প্রভাবকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। দ্রাবিড়দের দেবতা নটনাথ রূপে আখ্যাত শিবের নিকট থেকেই আর্য-দেবতা ব্রহ্মা নাট্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ভরতমুনিকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেন। শুধু তাই নয়, ভরত ব্রহ্মার আদেশে প্রথম যে অভিনয় কলার আয়োজন করেন, তাতে দ্রাবিড় প্রভাবান্বিত 'ইন্দ্রধ্বজ' ব্যবহৃত হয়েছিল।

এছাড়া 'যাত্রা' শব্দটিও দ্রাবিড় শব্দ বলে অনেকের ধারণা; দাক্ষিণাত্যে উৎসব অর্থে

'যাত্রা' শব্দের ব্যবহার, বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী দ্রাবিড়ভাষী ওরাঁওদের একটি কাষ্ঠখণ্ডকে ঘিরে নৃত্যগীতানুষ্ঠানের 'যাত্রা' নাম এবং দাক্ষিণাত্যের মারীযাত্রা', 'যাত্রে' প্রভৃতির উৎসব সমূহ এ অনুমানের অনেকটা পোষকতা করে।

প্রচিন যাত্রায় মানুষের সুখ-দুঃখময় জীবনের পরিবর্তে দেবতার অলৌকিক মহিমা কীর্তিত হত এবং সংলাপের পরিবর্তে সঙ্গীতই প্রাধান্য পেত। তদুপরি এর মধ্যে কোন 'অঙ্ক' বিভাগ থাকত না। তা ছিল অনেকটা 'নাট পালার'ই অনুরূপ, যে নাট-পালা থেকে পাঁচালি ও যাত্রা দুইই রূপ লাভ করেছে। পাত্রপাত্রীরা এখানে মুখোশ পরে অভিনয় করত।

অবশ্য জয়দেবের নাট্য গীতি গীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং মধ্যযুগীয় সূর্যমঙ্গল, শিবায়ন, গোপীচন্দ্রের গান ইত্যাদির মধ্যে সঙ্গীতের সংলাপধর্মী প্রয়োগ কলা দেবতার অলৌকিক মহিমার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক জীবনবোধ সমন্বিত নাটকীয় রসের সৃষ্টি করেছে।

অতঃপর চৈতন্যদেব কৃত অভিনয় মাধ্যমে যাত্রা নূতন পরিণতি লাভ করে বলে মনে হয়। আরো পরবর্তীকালে অঙ্ক বিভাগ সৃষ্টি হল, মুখোশের পরিবর্তে চরিত্রানুযায়ী সাজসজ্জা সহকারে যাত্রাভিনয়ের প্রচলন হল এবং তখন থেকেই বাংলা যাত্রার নবযুগের সৃষ্টি বলা যেতে পারে। এই সময় এবং পরে কৃষ্ণযাত্রা ব্যাপক পরিণতি লাভ করে। অবশ্য অনেকের ধারণা তার আগে শক্তি যাত্রা প্রচলিত ছিল। তবে তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

বাঙ্গালীর ইউরোপীয় সংসর্গের পরে ইউরোপীয় নাট্যকলার প্রভাবে যাত্রার অনেক রূপান্তর ঘটে। শখের দল গড়ে ওঠে, এবং এর মধ্যে মানুষের সুখ-দুঃখ, হাস্য-কৌতুক, সংলাপ স্থান পায়। অনেকক্ষেত্রে অবশ্য পবিত্র যাত্রা কাহিনীর মধ্যে জনসাধারণের রুচি অনুযায়ী রংতামাসা, ভাঁড়ের নাচ সন্নিবেশিত করে এর মধ্যে জনপ্রিয়তা ও বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালে যাত্রার এই রূপটির অর্থাৎ শখের যাত্রার সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলেন।

পাঁচালির প্রচলিত রূপটির সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয় তখনই। বস্তুতঃ পাঁচালির প্রতি সে সময়ে তাঁর অনুরাগ ও আকর্ষণ এত প্রবল হয়েছিল যে মাঝে মাঝেই তাঁর শিশুমন চঞ্চল হয়ে উঠত পাঁচালির দলে যোগ দেবার জন্যে। একথা তিনি নিজেই বলেছেন নানা জায়গায়।

যাত্রার মতই পাঁচালিরও উৎপত্তির ইতিহাস ও তাৎপর্য নিয়ে নানারকম অনুমান ও সিদ্ধান্ত প্রচলিত। আগেই বলেছি যে অনেকে আবার যাত্রার উৎসমূলেও পাঁচালির অস্তিত্ব কামনা করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। বিষয়টি নিয়ে বিতর্কও আছে।

প্রচলিত অর্থে পাঁচালি শব্দটি দ্বারা বিশেষ একশ্রেণীর বাংলা কাব্যধারাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। দেবমাহাত্ম্যমূলক পৌরাণিক আখ্যান বস্তু এর মূল উপজীব্য এবং এর মধ্যে সুরেরই প্রাধান্য। প্রকৃতপক্ষে পাঁচালি গেয় আখ্যায়িকা কাব্য।

এ ধরনের কাব্যের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন, কিন্তু কত প্রাচীন তা বলা যায় না। কারও কারও মতে, সুদূর অতীতে পুতুলনাচ অর্থে ব্যবহৃত 'পঞ্চালিকা' বা 'পাঞ্চলিকা' শব্দটিরই ক্রমবিবর্তিত রূপ বর্তমানের 'পাঁচালি' শব্দটি। তখনকার দিনে পাঞ্চাল দেশে তৈরী এক

ধরনের পুতুল ব্যবহৃত হত পুতুলনাচের জন্য, তাই এর নাম পাঞ্চালিকা। আবার এই নাচের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত কাহিনী-কাব্যগুলি গান বা আবৃত্তি করা হত তারাও ঐ নামেই অভিহিত হত। পরবর্তীকালে পুতুলনাচ আপনার পথে অগ্রসর হল এবং পাঁচালি কাহিনী ও গানের জোরে স্বতন্ত্র রূপ লাভ করল; কেবল তার 'পঞ্চালিকা' > 'পাঁচালি' নামটি থেকে গেল পুরাতন ঐতিহ্যের বাহক হয়ে। অন্যদিকে পুতুলনাচের সঙ্গে যুক্ত হল মুখোশ পরা নাচ ও অভিনয়, যাত্রাতে যার পরিণতি লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমানে পাঁচালি গানের সময়ে ঘটে পুত্তলিকা অঙ্কনের যে রীতি প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যেও পাঁচালির এই পূর্ব ঐতিহ্য অর্থাৎ পুতুলনাচের ইঙ্গিতটি নিহিত বলে অনেকের অনুমান।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্যযোগ্য, অবহট্‌ঠে 'পঞ্চালিকা' শব্দটির পরিচয় পাওয়া যায়; এবং প্রাচীন গুজরাটিতেও এ শব্দটি আখ্যায়িকা কাব্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সে কাব্য দেব-মাহাত্ম্যমূলক নয়। অবশ্য বাংলাতেও যে দেব-মাহাত্ম্যহীন পাঁচালি কাব্য একেবারে রচিত হয়নি তা নয়। আলাওলের পদ্মাবতীর পাঁচালিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অন্য মতানুসারে 'পাচালি' শব্দটি এসেছে 'পা-চালি' বা পদচালনা থেকে। মূল গায়েন পদচালনা করতে করতে এই গান করতেন বলে এর এই নাম। অবশ্য পাঁচালির চন্দ্রবিন্দু আগমের কোন ব্যাখ্যা এর মধ্যে নেই।

অপরপক্ষে পাঁচটি অঙ্গবিশিষ্ট বলেও এই বিশেষ ধরনের কাব্যের নাম পাঁচালি হওয়া সম্ভব। এই পাঁচটি অঙ্গ হল গান, সাজ-বাজানো, ছড়া-কাটানো, গানের লড়াই ও নাচ। আবার এই অঙ্গ পঞ্চক সম্পর্কে ভিন্ন মতও প্রচলিত। যেমন—পাচালি, ভাবকালি, নাচাড়ি, বৈঠকী এবং দাঁড়া-কবি।

আবার পাঞ্চালী ছন্দ বা পাঞ্চালী রীতি থেকেও 'পাঁচালি' শব্দটির উৎপত্তি একেবারে অসম্ভব নয়। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে পাঞ্চালী রীতির এবং প্রাকৃতে পাঞ্চালী ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাঁচালি-প্রবন্ধ, 'পাঁচালির ছন্দ', 'পাঁচালির গাঁথা' প্রভৃতি কথার ব্যবহারও একটি বিশেষ ধরন বা ছাঁদেরই ইঙ্গিতবহ বলে মনে হয়। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, এই পাঞ্চালী রীতির বা ছন্দের ব্যবহারের জন্যই হয়তো বিশেষ একধরনের কাব্যের নাম হয়েছে পাচালি কাব্য। তাছাড়াও সংস্কৃতে অনেক সময়ই 'পাঞ্চালী' অর্থে 'a system of singing' বোঝানো হয়ে থাকে, এবং বাংলা পাঁচালিও একটি নিজস্ব বিশেষ সুরে গীত হয়ে অনেকটা পরিমাণে ঐ অর্থদ্যোতক সূত্রটিরই পোষকতা করে।

পাঁচালির সঙ্গীতরীতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে;— "পাঁচালির যে গান তার কাছে শুনতুম তার রাগিণী ছিল সনাতন হিন্দুস্থানী, কিন্তু তার সুর বাংলা কাব্যের সঙ্গে মৈত্রী করতে গিয়ে পশ্চিমী ঘাঘরার ঘূর্ণাবর্তকে বাঙালী শাড়ির বাহুল্যবিহীন সহজ বেষ্টনে পরিণত করেছে।" (শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান, সংগীত চিন্তা)

আরও উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত ছাড়াও এর মধ্যে ছড়া সংলাপ ইত্যাদির স্থানও উপেক্ষণীয় নয়। তাই একে কাব্যপ্রধান সঙ্গীতও বলা যেতে পারে। এছাড়া বহুকাল থেকেই পাঁচালির আসরে একজন মাত্র গায়ক বিভিন্ন ভূমিকায় গীতাভিনয় করে থাকেন। যার জন্য অনেকেই এর মধ্যে যাত্রার নাট্য সম্ভাবনার বীজ নিহিত রয়েছে বলে মনে করেন। তাঁদের মতে পাঁচালিরই একটি শাখা একাধিক গায়কের দ্বারা পরিবেশিত হয়ে ক্রমে ক্রমে যাত্রার রূপ ধারণ করেছে।

পাঁচালি থেকে যাত্রার উৎপত্তি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য না হলেও যাত্রার ওপর পাঁচালির প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

পাঁচালির সম্পর্কে সবশেষে বলা যেতে পারে, এ পর্যন্ত আলোচিত যে কোন সূত্র থেকেই পাঁচালির উদ্ভব সম্ভব, কিংবা বর্তমান পাঁচালি ঐ সব রূপ-রস-লক্ষণের যৌথ রূপ। বর্তমানে পাঁচালির যে রূপ ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আমরা পাই তার মধ্যে এদের প্রত্যেকটির আভাস কিছু না কিছু পাওয়া যায়।

যাত্রা-পাঁচালির মতই কথকতার মধ্যেও সঙ্গীতের গুরুত্বপূর্ণ স্থানের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্যও বিশেষভাবে স্মরণীয়;—

''আজও দেখতে পাই বাংলা সাহিত্যে গান যখন তখন যেখানে সেখানে অনাহূত অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এতে অন্যদেশীয় অলঙ্কার শাস্ত্র সম্মত রীতি ভঙ্গ হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের রীতি আমাদেরই স্বভাব-সঙ্গত।'' (তদেব)

আর এ জন্যই যাত্রা-পাঁচালি-কথকতা বাঙালীর এত প্রিয়।

বস্তুতঃ কথকতা কথাসাহিত্যেরই একটি রূপ। কিন্তু রূপকথা-উপকথা-ব্রতকথা যেমন প্রধানত নারী সমাজেরই সম্পত্তি, কথকতা তা নয়। পুরুষ কথকই ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি থেকে কাহিনী অবলম্বন করে আবৃত্তি বা গানের মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করে দেশের সাধারণের মনোরঞ্জন করে থাকেন।

সুদূর অতীত কাল থেকেই কথকতা আমাদের দেশে প্রচলিত; জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে একথা প্রমাণিত করেছেন। তাঁর মতে রামায়ণেই এর সূচনা দেখা গিয়েছিল। স্বয়ং বাল্মীকি কুশ ও লবকে যে রামায়ণ আবৃত্তি শিক্ষা দিয়েছিলেন তা একান্ত ভাবেই কথকতার পূর্বাভাস। এছাড়া পরবর্তীকালে রচিত বাণভট্টের কাদম্বরীতে মহাকালের মন্দিরে মহিষীর কথকতা শুনতে যাওয়ার বর্ণনা আছে। আরও উল্লেখযোগ্য, সপ্তম শতকে সুদূর কম্বোডিয়ায় সোমশর্ম্মর্ণ নামে এক ব্রাহ্মণ মহাভারত আবৃত্তি করতেন বলে শোনা যায়; এবং তা যে ভারতীয় কথকতারই ঐতিহ্য-বাহী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এতদ্ব্যতীত অন্য সূত্র থেকে আরও জানতে পারি, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে গ্রন্থিক নামে অভিহিত কথকের সন্ধান পাওয়া যায়। আরও কয়েক শতাব্দী পরে পাল বংশের শেষ রাজা মদন পাল দেবের পট্ট মহাদেবী চিত্র-মতিকা কথকতা শুনতেন বলে জানা যায়। এছাড়া মৈথিল কবি-পণ্ডিত জ্যোতিশূরও রাজসভায় কথকের উল্লেখ করেছেন, তবে চৈতন্যদেবের সময় থেকে বাংলাদেশে ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ অর্থাৎ কথকতা বৈষ্ণব সামাজিকতার একটি বিশেষ অঙ্গে পরিণত হয়।

বর্তমান কথকতার যে রূপটির সঙ্গে আমরা পরিচিত, তা সাধারণতঃ গ্রামে গ্রামেই প্রচলিত। যাত্রা-পাঁচালির মতই আসরে শ্রোতা পরিবেষ্টিত হয়ে কথকঠাকুর বিভিন্ন বিষয় পাঠ করে থাকেন; এবং এই পাঠ একদিনে শেষ হয় না, দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবতের মধ্যে যে গ্রন্থটির কাহিনী নিয়ে পাঠ আরম্ভ হয় প্রতিদিন তারই এক একটি বিষয়ের কথা চলতে থাকে। এই এক একটি বিষয় পালা নামে অভিহিত। তবে আমাদের দেশে কথকতায় ভাগবতেরই প্রাধান্য।

সংস্কৃত ভাগবত-পুরাণোক্ত বিষয় অবলম্বনে হলেও কথকতা দেশীয় ভাষাতেই কথিত হয়ে থাকে; যার জন্য উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকলের নিকটই এর রসাবেদন রয়েছে। অবশ্য কথকের সুন্দর বাচনভঙ্গী, সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিতা প্রভৃতির ওপরও এর জনপ্রিয়তা অনেকটা পরিমাণে নির্ভর করে। আধুনিক কালে কথকগণ শ্রোতাদের মনস্তুষ্টির জন্য ভাগবতাদির কাহিনী অবলম্বনে মনোরম গল্প রচনা করে তার মধ্যে অনেকসময়ই অন্য কবির গান সংযোজন করে গেয়ে থাকেন। বলাই বাহুল্য জনগণের রুচি অনুযায়ীই তা করেন। এছাড়াও নিরক্ষর গ্রাম্য সাধারণ মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখেই কথকগণ অনেক ক্ষেত্রেই পৌরাণিক শাস্ত্রোক্ত বিষয়কে লৌকিক রূপ দান করেন অতি সহজেই; এবং মনে হয় এই বৃহত্তম লোকসমাজের বোধগম্য বলেই রবীন্দ্রনাথ একে লোকসাহিত্যের অন্যতম উপাদান রূপে গ্রহণ করতে পেরেছেন।

(৬) **কবি সঙ্গীত**— রবীন্দ্রনাথ কবিসঙ্গীতকে লোকসাহিত্যের অঙ্গ বলে মনে করেছেন বলেই তাঁর লোকসাহিত্য গ্রন্থে 'কবিসঙ্গীত' প্রবন্ধটিকে স্থান দিয়েছেন; অন্যত্রও তিনি একে লোকসঙ্গীত নামে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে কবিগানকে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত করা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ, প্রথমতঃ কবিসঙ্গীত লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপকরণের মত লোকসমাজ তথা লোকমানসের ফসল নয়। প্রচলিত বিভিন্ন সংজ্ঞানুসারে যে সমাজ লোকসমাজ বলে পরিগণিত হয়ে থাকে, কবিগানের রচয়িতারা ঠিক সেরকম কোন সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত নন। তাঁরা সুপরিশীলিত-সুশিক্ষিত মননের অধিকারী না হলেও নাগরিক সমাজের সঙ্গেই সুনিবিড় যোগসূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, কবিগান তার বিকশিত নগর জীবনভূমিরই ফসল। দ্বিতীয়তঃ, লোকসাহিত্যের মধ্যে তার রচয়িতার স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না; সমগ্র লোকসমাজের পশ্চাতে রচয়িতা আত্মগোপন করে থাকেন। এর মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের কোন কথা থাকে না। সমগ্র সমাজের প্রাণের কথা, অন্তরতম আশা-আকাঙ্ক্ষা এতে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। এ সাহিত্য যেন সমগ্র সমাজেরই নিজস্ব সম্পত্তি; ব্যক্তিবিশেষের নয়। কিন্তু কবিসংগীতের বিভিন্ন রচয়িতার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং গতানুগতিক বিষয় ও ভঙ্গী অবলম্বনে লিখিত হলেও প্রত্যেক কবির স্বকীয়তার ছাপ তাঁদের নিজ নিজ গানের মধ্যে সুস্পষ্ট। তবে একটি দিক দিয়ে লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এর ক্ষীণ সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। তা হল, মৌখিক ধারাকে অনুসরণ করেই জন-সমাজে কবিসঙ্গীতের বিকাশ ও ব্যাপক প্রচার।

অন্যপক্ষে কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে, কবিগানের মধ্যে লোকসাহিত্যের

সাধারণ লক্ষণগুলো না থাকলেও এবং সেই কারণে এদের লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না করা গেলেও এদের সৃষ্টি যে এক ধরনের লৌকিক চেতনা থেকে সেকথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথও কবিসঙ্গীতের নগরমুখিতা ও সমষ্টিবোধের ঐতিহ্য বিযুক্ত ব্যক্তিসাপেক্ষতাকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এদের লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন হয়তো এদের মধ্যে এই লৌকিক চেতনার স্পর্শ অনুভব করেই।

বস্তুতঃ উচ্চতর শিষ্ট সাহিত্যের চিরাগত ঐতিহ্যও কবিগানের নেই। কারণ কবিওয়ালাদের শিক্ষা, রুচি ও কৃষ্টির শালীনতা ছিল না। তাই তাঁরা উচ্চতর সাহিত্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তার ভাবের গভীরতাকে আয়ত্ত করতে পারেননি। ফলে, এই সমস্ত উচ্চতর ভাবকে নিজেদের ও শ্রোতাদের রুচি অনুযায়ী পরিবেশন করেছেন। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই এদের মধ্যে শালীনতার অভাব, স্থূলতা ও অসংযম প্রকট হয়ে উঠেছে, যা ভদ্র সাহিত্যের ঐতিহ্যের পরিপন্থী।

কিন্তু একথাও স্মরণীয়, লোকসাহিত্যের মধ্যে রুচির স্থূলতা, সুকর্ষিত মননের অভাব থাকলেও কবি মনের যে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও সহজ অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়, তা কবিগানের মধ্যে নেই। এবং অনেক ক্ষেত্রেই রুচির বিকৃতি ও গ্রাম্যতার জন্য তার মধ্যে সাহিত্যরসের ও কাব্যসৌন্দর্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ কবিগানের অসংযত আবেগ, স্থূলতা, গভীরতার অভাব সব কিছুই লক্ষ্য করেছিলেন; সেকথা তিনি তাঁর কবিসঙ্গীত প্রবন্ধে বলেছেনও। তা সত্ত্বেও সাহিত্যক্ষেত্রে এই সব রচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন হয়তো এদের সাধারণের মানস সম্পত্তি মনে করেই। তিনি বলেছেন, "ধর্মভাবের উদ্দীপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, কেবল সাধারণের অবসর রঞ্জনের জন্য গান রচনা বাংলায় কবিওয়ালারাই প্রথম প্রবর্তন করেন। এখনো সাহিত্যের উপর সেই সাধারণেরই আধিপত্য, কিন্তু ইতিমধ্যে সাধারণের প্রকৃতির পরিবর্তন হইয়াছে। ....

কিন্তু সাধারণের যতই রুচির উৎকর্ষ ও শিক্ষার বিস্তার হউক না কেন তাহাদের আনন্দ বিধানের জন্য স্থায়ী সাহিত্য এবং আবশ্যক সাধন ও অবসররঞ্জনের জন্য ক্ষণিক সাহিত্যের প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে। ....

এই নষ্ট পরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ—এবং ইংরাজ রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজন সভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই পথপ্রদর্শক।" (কবিসংগীত/লোকসাহিত্য)

রবীন্দ্রনাথ এখানে 'সাধারণ' বলতে হয়তো ভদ্র-ভদ্রেতর উভয় সমাজকেই বুঝিয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চতর বিভিন্ন সাহিত্যের রস ভদ্রেতর নিরক্ষর সমাজের (রবীন্দ্র প্রযুক্ত অর্থে লোকসমাজের) বোধগম্য ছিল না। কিন্তু কবিগান এমনই একটি সাহিত্য, যা ভদ্র-ভদ্রেতর নির্বিশেষে সকলেরই আস্বাদনের বিষয় হয়ে উঠেছিল। সেই সূত্রেই লোকসমাজেরও মনোরঞ্জক হতে পেরেছিল বলেই সম্ভবতঃ তিনি একে লোকসাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন;

অবশ্য অস্বীকার করবার উপায় নেই, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এরা শিষ্ট সাহিত্যেরও মর্যাদা পাবার উপযুক্ত নয়।

তবে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার্থানুসারে কবি সঙ্গীতের লোকসাহিত্য হয়ে ওঠার বিভিন্ন অন্তরায়ের কথা স্মরণে রেখেও নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে এর উৎসমূলে লোকসাহিত্যের কোন কোন বিষয়ের ছায়াপাত পরিলক্ষিত হয়। যেমন কৃষ্ণ-ধামালি, ঝুমুর, মালসী গান প্রভৃতি। তাই বলে এ প্রসঙ্গে একথাও জোর করে বলা চলে না যে, ঐ সব নৃত্যগীতমূলক শিল্প-রূপের মধ্যেই কবিগানের বীজ নিহিত ছিল। এছাড়াও বিদগ্ধ সমাজের অনেকের অনুমান, যাত্রা থেকেই কবিগানের উদ্ভব। আবার কারও ধারণা, পাঁচালী ও পালাগান থেকেই তা সম্ভূত।

কবিগানের উৎস সম্পর্কে আলোচিত বিভিন্ন মতবাদকে স্বীকার করে নিয়েও বলা যেতে পারে যে তাতে উল্লিখিত বিষয় সমূহের যে কোন একটির প্রভাব আত্যন্তিক হয়ে নেই; এদের প্রত্যেকটির কিছু না কিছু উপাদানের প্রভাব কবিগানের ওপর পড়েছে; এবং সেই সংমিশ্রণের ফল-পরিণামই কবিসঙ্গীত।

এবার কবিগানের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস ও কালক্রম প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে,— বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের এক চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে যখন মঙ্গল কাব্যধারা ও বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর পূর্বাপর বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গেছে তখনই কবিগানের উদ্ভব। এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে সপ্তদশ শতকের শেষে কিংবা অষ্টাদশ শতকের প্রথমে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কবিগান প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকেই কবিগান চরমোৎকর্ষ লাভ করে। তারপর নাগরিক রসিক-সাধারণের রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়।

এ সমস্ত কবিগান রচয়িতাদের কবি বলা যায় না। তাঁরা কবিয়াল < কবিপাল বা কবিওয়ালা বলেই পরিচিত। তদুপরি এই কবিরা ছিলেন অশিক্ষিত পটু। গুরু-পরম্পরানুসারে কবিগানের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম শিল্পী গুঁজলা গুঁই নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।

কবিগানের অভিব্যক্তির পরিচয়ের সূত্রেই একে বিশেষভাবে দাঁড়া কবিগান বলেও একদা অভিহিত করা হয়েছিল। দাঁড়া কথাটার অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানারকম অভিমত প্রচলিত আছে। অনেকে আসরে দাঁড়িয়ে গান গাওয়া অর্থে এই শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন। আবার অন্যমতে যে কবিগানে ধরাবাঁধা পালা বা গান ছিল তাকেই দাঁড়া কবি বলা হত। আর যেখানে পালা বা গান উপস্থিত মত রচনা করা হত তা সাধারণ কবি বা কবিগান বলে পরিচিত ছিল।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে এ সমস্ত মতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বলা যায়, আসরে দাঁড়িয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর দান করাই ছিল কবিগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রথম দিকে দুই প্রতিপক্ষ উত্তর-প্রত্যুত্তর পূর্বাবধি প্রস্তুত করে আসরে আসতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আসরে দাঁড়িয়েই উত্তর প্রত্যুত্তর রচিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লোকসাহিত্য গ্রন্থে কবিগানের এই বিশেষত্বটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

তবে এ কথাও ঠিক, আমাদের দেশে প্রতিযোগিতামূলক সাহিত্য এই প্রথম নয়। বিভিন্ন

সূত্রে জানা যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস ও দণ্ডীর এবং কালিদাস ও রাক্ষস কবির মধ্যে, বাংলা সাহিত্যে রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইএর মধ্যে অনেকটা বিতর্কমূলক কবিতার লড়াই হয়েছিল—অবশ্য আসরে দাঁড়িয়ে নয়। তাছাড়া এখনও শিবের গাজন বা ধর্মঠাকুরের পূজার সময় গ্রামদেশে এ ধরনের উত্তর-প্রত্যুত্তর মূলক ছড়া কাটা হয়।

কবিগানের আঙ্গিক বিশ্লেষণ করলে এর আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন সখীসংবাদ, বিরহ, মালসী, খেউড়, আখড়াই প্রভৃতি বিচিত্র প্রসঙ্গ নিয়েই কবিগান রচিত হত। সখী সংবাদ ও বিরহ বিষয়ক কবিগানের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু রুচির অপকর্ষে এবং সংখ্যার আধিক্যে খেউড় একটি স্বয়ং-স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। কিন্তু সে প্রসঙ্গ বর্তমান আলোচনায় অবান্তর বোধে পরিহার করা গেল। কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য তথা বৃহত্তর সাধারণ সমাজজীবনের ক্রান্তিকালীন সাহিত্য-বাসনার স্বাক্ষর রূপে কবিসঙ্গীত সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছেন তার প্রেক্ষিতেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা মাত্র করা গেল।

(৭) সারি-জারি-ভাটিয়ালি — পূর্বোক্ত একই দৃষ্টিকোণ থেকে সারি-জারি-ভাটিয়ালি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক উল্লেখমাত্র করা যেতে পারে। রবীন্দ্রমানসিকতার নিকটেও এই বিশুদ্ধ লোকসঙ্গীতাবলী পরিচিত হয়েছিল; তাঁর রচনায় অবশ্য এ বিষয়ের প্রতি অবধান স্বল্পই লক্ষিত হয়ে থাকে।

কবিগানের লোকসাহিত্যগুণ যেমন সামান্যই তেমনি সারি-জারি-ভাটিয়ালি আবার একান্তভাবেই লোকসাহিত্যেরই গুণ বিশিষ্ট। ফলে এদের প্রসার এবং জনপ্রিয়তা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল, অধিকাংশ লোকসাহিত্যের মত এই সব রচনাও আসলে গান। লোকসাহিত্য বিশেষজ্ঞ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে সারি গান কর্ম সঙ্গীত এবং জারিগান 'নৃত্য সম্বলিত-বীর রসাত্মক গীতি'। প্রধানতঃ ময়মনসিংহ জেলার লোকসাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়েই তিনি এইসব গানের কথা স্মরণ করেছেন। তবে এ কথাও ঠিক যে সারিগান পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

জারিগান ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রধানতঃ মুসলমান সমাজে প্রচলিত। কারবালা যুদ্ধের বৃত্তান্ত একালে এর প্রধান উপজীব্য। পুরুষেরা পায়ে নূপুর বেঁধে বৃত্তাকারে নৃত্য করে জারিগান গেয়ে থাকেন। বিশেষজ্ঞের অভিমত, মুসলমান সমাজে এর প্রচলন থাকলেও তা কেবলমাত্র ঐ সমাজের একক সম্পদ নয়। নূপুর পায়ে নাচ দেখেই বোঝা যায় এতে আসলে মেয়েদের একটি মৌলিক ভূমিকা ছিল। আদিবাসী সমাজেই নাচগানের আসরে মেয়েদের ভূমিকা প্রধান হয়ে থাকে। তাছাড়া আসাম থেকে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত আদিবাসী সমাজে অনুরূপ নৃত্যকলা আজও এক সাধারণ লক্ষণ। মুসলমান সমাজে নারীর প্রকাশ্য ভূমিকা লুপ্ত হয়ে যাবার ফলেই পূর্ববঙ্গের জারি গানে পুরুষেরা নাচের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। অনেকেরই অনুমান, হয়তো আদিবাসী কোন উপজাতীয় সমাজের বীররসাত্মক গাথাই প্রথমে এই শ্রেণীর গানের উপজীব্য ছিল আজও যেমন আছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের আবর, মিশ্‌মী ও নাগা জাতির মধ্যে। পূর্ববঙ্গে এই গান মুসলমান সমাজে জনপ্রিয়তা লাভের ফলে কারবালা যুদ্ধের বিষয়ই আজ তার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে।

জারি গানের উৎস এবং কাল সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে মনে হয়, অতি

প্রাচীন কালের ভারতবর্ষের লোকসমাজে এই ধরনের নৃত্য গীতি কলার জন্ম ঘটেছিল। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের অঞ্চল বিশেষে তা জারি গানের বিশেষ আকার ধারণ করেছে।

সারিগান নৌকা-বাইচের গান — বিশেষজ্ঞের মতে কোন 'সমুদ্রচারী জাতির সাংস্কৃতিক দান'। এতে নাচ নেই, কণ্ঠ সঙ্গীতই একমাত্র উপজীব্য। স্রোতের জলে ছিপ ভাসিয়ে বৈঠা বাওয়ার তালে তালে এই সমবেত গানের স্রোত প্রবাহিত হয়। এদিক থেকে সারিগান সমবেত কর্ম সঙ্গীত (Work-song); মেয়েদের কোন ভূমিকা এতে নেই, থাকার কথাও নয়।

সারিগান পূর্ববঙ্গের নদীনালাবাহিত অঞ্চলেই সুপ্রচলিত এবং জনপ্রিয়। অনেক স্থানে বর্ষার নদীতে ছিপ নিয়ে প্রবল বাইচ প্রতিযোগিতা হয়। তারই উত্তেজনা এবং দ্রুত গতির পরিপূরকতা করে এই সারি গান। সর্বত্রই সারি গানের সুর লোক সঙ্গীতেরই সুর এবং কর্মসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যে অনেক সময় নৌকা বাওয়ার ক্ষেত্র ছেড়ে দিয়েও ঘরের ছাদ পেটানোর সময়েও এই গানের ব্যবহার হয়ে থাকে। কথার লৌকিক আন্তরিকতা এবং সুরের দ্রুত তাল সারিগানকে সর্বত্রই জনপ্রিয় করেছে।

'ভাটিয়ালি' কোনো সাহিত্য বা সঙ্গীত নয়, আসলে এটি একটি সুরের নাম। জারি এবং সারি যেমন সমবেত সঙ্গীত, ভাটিয়ালি তেমন একক গান। জারি-সারি গানের সুরে বীররসের জোর আছে, সমবেত কণ্ঠের কাঁপন আছে, বিষয়বস্তুতেও সামগ্রিক মনের প্রতিফলন আছে। কিন্তু ভাটিয়ালি গায়কের একলা মনের গান। অন্তরের নিভৃত বেদনাকে সে উদাস সুরের মধ্যে ঢেলে দেয়। আসলে এই গান মাঝি-মাল্লা, চাষী-রাখাল-মহিষালের গান। পূর্ববঙ্গের বিরাট নদনদী এবং 'হাওর' প্রান্তরের উদার বিস্তার গ্রামীণ মানুষের মনে যে ঢেউ ভাঙা করুণ উদাস ভাবের সৃষ্টি করে তা'ই সুরে রূপ পেয়েছে ভাটিয়ালি গানে।

ভাটিয়ালি একলা মনের একক গান, তাই নাচ কিংবা বাজনা-বাদ্যের কোন ভূমিকা তাতে নেই। অন্যপক্ষে আধুনিক কীর্তন ও বাংলা টপ্পার সঙ্গে ভাটিয়ালির এক আশ্চর্য ঐক্য আছে। এই ভাটিয়ালি সুরের উৎস পূর্ববঙ্গে বলেই অনেকে মনে করেন। এ গানের প্রাচীনতার পরিমাণ এখনো নির্ণীত হয়নি। চর্যাপদে 'বঙ্গাল' রাগের উল্লেখ আছে এবং এটি পূর্ববঙ্গেরই প্রচলিত রাগ বলে অনুমিত। ভাটিয়ালি সুরের নির্দেশ যে প্রাচীনতম বাংলা গ্রন্থে পাওয়া যায় সেটি হল বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। অসম্ভব নয়, এই বঙ্গাল রাগেরই কোন এক বিশেষ পরিণতি হয়তো ভাটিয়ালি সুরের আকার ধরেছিল। আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'বঙ্গাল' রাগের উল্লেখও আছে। বিশেষজ্ঞের অভিমত, প্রাচীন পূর্ববঙ্গের মাঝিমাল্লারা সেকালে বাংলা দেশের সকল অঞ্চলে নৌকা নিয়ে ঘুরে ফিরত। তাদেরই সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের লোকসাধারণের কাছেও ভাটিয়ালির মত বঙ্গাল রাগ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সম্ভবতঃ তারই ফলে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই সব রাগ-সুরের উল্লেখ ঘটেছে। চর্যাপদের পুঁথির লিপিকাল যদি দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকও হয়, তবু বঙ্গাল রাগের পদগুলো আরও আগে রচিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকালও মোটামুটি চতুর্দশ শতকের নিকটবর্তী সময়ে হওয়া অসম্ভব নয়। তার আগে থেকেই পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি গান সমগ্র বাংলা দেশে জনপ্রিয়

হয়ে উঠেছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ এই ভাটিয়ালি গানের সুরের আকর্ষণে বিশেষভাবে ধরা পড়েছিলেন। তাঁর বাউল অঙ্গের অনেক গানই আসলে ভাটিয়ালি সুরের রচনা। অনেকে মনে করেন যে বাউল গানের নিজস্ব কোন সুর নেই। পূর্ববঙ্গের বাউলদের অনেক গানই ভাটিয়ালির সুরে ঢালা। পশ্চিমবঙ্গের বাউল গীতি কীর্তনাঙ্গ সুরের ওপর প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের বাউল পর্যায়ের অনেক গানই আসলে ভাটিয়ালি সুরের ওপর বসানো। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' কিংবা 'গ্রামছাড়া এই রাঙামাটির পথ' ইত্যাদি বিখ্যাত গানগুলিও ভাটিয়ালি সুরের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে নির্দেশ করেছেন লোকসাহিত্যজ্ঞ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

রবীন্দ্র সঙ্গীতে লোকগীতির ঐতিহ্য স্বতন্ত্র অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে। আমরা তাঁর গদ্য-পদ্য সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সারি-জারি ভাটিয়ালির ভূমিকাটুকুই আলোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথের মনে লোকসাহিত্যের যে আবেদন ছিল তা হল শিল্পীর ব্যক্তিচেতনায় শিল্পসৌন্দর্যের আবেদন। Folk-Lore বা লোকযানের অনুসন্ধান একালে নৃতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানের এক প্রধান উপাদান হয়ে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পার্থক্য রয়েছে। আমরা এখানে নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নয়, বিশেষভাবে রবীন্দ্র চেতনার আলোকে লোকসাহিত্য ধারার পরিচয়টি রূপরেখার আকারে উপস্থিত করে মূল বিষয়ের পরিচায়নে প্রবৃত্ত হব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র-মনের গঠনে লোকসাহিত্যের সংস্কার ও প্রভাব

আগেই বলেছি যে লোকসাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল গভীর ও অকৃত্রিম অনুরাগ; তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই ভদ্রেতর সাহিত্যের সঙ্গে ভদ্র তথা শিক্ষিত সমাজের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ও এর প্রতি সকলকে কৌতূহলী করে তুলেছেন। কিন্তু এ কথা তো স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর মানসগঠনের প্রধান সময় বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে এমন এক উচ্চতর রুচিসম্পন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যেখানে লোকসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না। সেজন্যে আপাতদৃষ্টিতে লোকসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও অন্তরঙ্গতাকে অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। অথচ তাঁর জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, ছিন্নপত্রাবলী বা অন্যান্য আরও আলোচনা থেকে জানতে পারা যায় যে শৈশবেই তিনি লোকসাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেছেন এবং তাঁর মনের গঠনে এর সংস্কার ও প্রভাব সুপরিস্ফুট ছিল। বস্তুতঃ সমাজের সর্বোচ্চ-কোটিতে অবস্থান করেও সম্পূর্ণ বিরপীত ধর্মী অপর কোটির সাহিত্যরস তিনি আস্বাদন করেছেন ও তার দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছেন। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভবপর হয়েছে বর্তমান অধ্যায়ে সেটিই আমাদের আলোচনার বিষয়। আর এ প্রসঙ্গে তাঁর পারিবারিক পটভূমির পরিচয়ও একটু দেওয়া প্রয়োজন।

যে পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন সে পরিবার ছিল শিক্ষা-দীক্ষায়, সুমার্জিত রুচিবোধে, সংস্কৃতির উৎকর্ষে ও আভিজাত্যে সেকালে সকলের অগ্রণী। তার ওপরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটি নবযুগের উজ্জীবন ঘটেছিল তাঁদের এই ঠাকুরবাড়ীকে কেন্দ্র করেই। একদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও ভাবধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং অন্যদিকে উপনিষদের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সুগভীর আত্মিক যোগ স্থাপনের ফলেই তা সম্ভবপর হয়েছিল।

অন্যপক্ষে মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের ফলে এ পরিবার সমকালীন সমাজ জীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং সেই সঙ্গে এখান থেকে লোপ পেয়েছিল হিন্দু-সমাজে প্রচলিত নানা মধ্যযুগীয় সংস্কার, প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি। ফলে সমাজ থেকে দূরে তাঁদের মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল, যা ছিল সকলের থেকে পৃথক; বলাই বাহুল্য, তা ছিল সুসংস্কৃত ও সুপরিমার্জিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ সম্পর্কে বলেছেন,—
"যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত।....আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচাব অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।

আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ী,.....পূর্বযুগের নানা পালাপার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজে সজ্জায় তার মধ্যে দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি।.....

নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক, মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো।" (অবতরণিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ ম খণ্ড)

এইরকম পরিশীলিত স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত নাগরিক পরিবেশের সঙ্গে ভদ্রসমাজের প্রত্যন্তবর্তী গ্রাম্য লোকসমাজের কোনরকম যোগসূত্র না থাকাই স্বাভাবিক। আর লোকসাহিত্য তো লোকসমাজেরই ফসল। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই এর সম্পর্কেও ঐ একই কথা মনে হবে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, লোকজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও তাঁদের ঐ পারিবারিক আবেষ্টনীতেই লোকসাহিত্যের কোনও কোনও বিষয় প্রবেশাধিকার পেয়েছে কোন না কোন ভাবে—মূলতঃ দাস দাসী ও কর্মচারীদের মাধ্যমে এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিশুরা তার থেকেই সাহিত্য রসোপভোগ করেছেন অনায়াসে।

তাঁদের এই বৃহৎ পরিবারে শিশুদের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত ছিল দাসদাসীদের ওপরে। সে কারণে বালক রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে ভৃত্যদেঁর হেফাজতে; আর তখনই তাদের মুখে কখনও শুনেছেন রূপকথার গল্প, ছড়া আবার কখনও গুণগুণ করে গাওয়া মধুকানের গান বা এ জাতীয় আরও অনেক লোকসঙ্গীত।

আবার তাঁর পিতার অনুচরদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাত্রা-পাঁচালি কীর্তনের অনুরাগী। তাঁরাও সময়ে অসময়ে এসব গান শুনিয়ে তাঁর এবং পরিবারের অন্যান্য শিশুদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন। এ কথা তিনি নিজেই বলেছেন বাল্য-স্মৃতি রোমন্থন কবতে গিয়ে।

অবশ্য সে সময় এই সব ভৃত্য ও কর্মচারী ব্যতীত আরও অন্য কারও নিকট থেকে লোকসাহিত্যের সন্ধান একেবারে পাননি তা নয়। রূপকথা ও মেয়েলি ছড়া লোকসাহিত্যের এই দুটি বিষয় প্রধানতঃ মেয়েদের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে একালে এসে পৌছেছে; একথা আগে অনেকবারই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যখন শৈশবকাল তখনও তাঁদেব নাগরিক সংস্কৃতির এ ধারাটি একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি বর্তমানের মত। তাই মাতামহী বা পিতামহী স্থানীয়দের মুখ থেকেও রূপকথা শুনবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল।

এছাড়া তাঁর অগ্রজদের কোনও কোনও সাহিত্যানুরাগী বন্ধুর নিকট থেকে দেশীয় সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে লোকসাহিত্যেরও সঙ্কেত সন্ধান পেয়েছেন।

এই ভাবেই তাঁদের পরিবারের উন্নত-সংস্কৃতি-সম্পন্ন আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও তাঁর মানসিকতার প্রাথমিক বিকাশ পর্যায়ে লোকসাহিত্যের অনুপ্রবেশ সহজ হয়েছে এবং তখন থেকেই তার প্রতি তাঁর আকর্ষণও হয়েছে গভীর। তাই দেখি, পরবর্তী জীবনে যখন জমিদারী পরিদর্শনে প্রথম গিয়েছেন, তখন লোক জীবন ও সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষভাবে জানার জন্য আগ্রহী হয়েছেন এবং বাউল-ফকির-মাঝি-মাল্লা যার কাছ থেকে পেরেছেন গান শুনেছেন নানা ধরনের। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, যেখান থেকে যা পেয়েছেন ইচ্ছেমত কুড়িয়ে বাড়িয়ে ঝুলি ভর্তি করেছেন তাই দিয়েই।

তাঁর মনের গঠনে লোকসাহিত্যের সংস্কার ও প্রভাব সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তাঁর প্রথম সাহিত্যোপলব্ধি ঘটেছে লোকসাহিত্যের সহায়তায়। ছড়ার ছন্দের অপূর্ব ধ্বনি ঝঙ্কার, রূপকথার গল্পের অনেক সম্ভব-অসম্ভব ঘটনা তাঁর মত কল্পনাপ্রিয় শিশুর মনকে নিয়ে গেছে সুদূর রহস্যলোকে এবং পরবর্তীকালে তাঁর কবিচেতনায় যে সুদূরের প্রতি আকর্ষণ, অসীমের জন্য ব্যাকুলতা ও রোমাণ্টিক অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায় তারই

সূচনা করেছে।

কবিতার মোহময় স্পর্শ তিনি প্রথম অনুভব করেছেন শিক্ষারম্ভে যখন পড়েছেন 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। এ যেন তাঁর জীবনে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। সামান্য এই কথা ক'টি তাঁর মনে এমন এক আবেগের সঞ্চার করল যে, মনে হল এটাই তাঁর জীবনে আদি কবির প্রথম কবিতা। ছন্দের মধ্যে মিলের মাধুর্যও সেই প্রথম উপলব্ধি করলেন। কবিতার অর্থ ও ভাবের ব্যঞ্জনার চেয়ে ছন্দের ঝঙ্কারই শিশুমনকে আকৃষ্ট করে বেশী, রবীন্দ্রনাথকেও করেছিল। তাই সেদিন সারাদিন তাঁর মনের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'।

জীবনস্মৃতিতে তিনি এই কথাই বলেছেন, ''কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'। তখন 'কর-খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবে মাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'। আমার জীবনে এইটেই আদি কবি'র প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—আবার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো ভাষার ঝঙ্কারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কাজের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।''

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই আদিকবির প্রথম কবিতা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন ছড়া বা কবিতার অংশ বিশেষ নয়। আসলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত বর্ণপরিচয় হাতে করেই বঙ্গসরস্বতীর মন্দিরে কবিশিশু প্রথম হাতেখড়ি নিয়েছিলেন; 'কর', 'খল' প্রভৃতি বানানের স্মৃতিসূত্রে একথা প্রতিপন্ন হয়। 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র সুরঝঙ্কারও ঐ সূত্রেই কবিমনকে হয়তো আবিষ্কার করেছিল—তাঁর উক্তিতেই এ কথার আভাস পাওয়া যায়।

কিন্তু উৎস যাই হোক, কবি শিশুর চেতনায় এই বাক্য দুটি এক অখণ্ড কবিতা রূপেই প্রতিভাত হয়েছিল এবং তিনি নিজেই তা উল্লেখ করেছেন জীবনস্মৃতিতে। একথা ঠিক, অনেকেই তো এই কথাটি পড়েছিলেন, কিন্তু কারও মনেই তো তা এমন অপরূপ সাড়া জাগাতে পারেনি; এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। তাই চিরকালই তাঁর অন্তরের কবিসত্তাটি ছন্দ ও সুরের অনুসন্ধানী; কোথাও কোন সুরের ঝঙ্কার, ধ্বনির মিল তাঁর অনুভূতিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। আর ঐ বিচ্ছিন্ন বাক্য দুটির মধ্যেও তিনি অনুভব করেছিলেন এক ছন্দময়তা, সুরের অনুরণন; সেই থেকেই ছড়ার আকারে এটি তাঁর মানসপটে অঙ্কিত হয়ে গেছে। সে জন্যে তাঁর অবচেতনায় ছড়ার অনুপ্রবেশ ও তার প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে এর কথা বাদ দেওয়া যায় না কোনমতে।

এইভাবেই ছড়ার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আনন্দ শৈশবে কবির কাব্যরসচেতনাকে আরও গভীর করে তুলেছে; আর সেই অল্প বয়স থেকেই অনেক ছড়ার সঙ্গে নানা সূত্রে তাঁর ধীরে ধীরে পরিচয় হয়েছে, তারা সবাই বিচিত্র ভাব ও রসের আবেদন সৃষ্টি করেছে তাঁর বিকাশমান মনে, কাব্যের অসীম রহস্যময় সৌন্দর্যলোকের চাবি দিয়েছে খুলে।

শিশুকালে যে ছড়াটি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল সবচেয়ে বেশী সেটি হল 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান'। বহু প্রচলিত এই ছড়াটি বাংলা দেশের সমস্ত শিশু চিত্তকে পুলকিত

করেছে চিরদিন, বালক রবীন্দ্রনাথকেও করেছিল। এটি ছিল তাঁর কাছে বাল্যকালে মোহমন্ত্রের মত, এবং সে মোহ তিনি বিস্মৃত হননি। শৈশবের সাহিত্য রস সম্ভোগের কথা বলতে গিয়েও তিনি এই ছড়াটির কথা বলেছেন বারবার।

কিন্তু কোথা থেকে কিভাবে এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় সে কথা বলেননি কোথাও, কেবল একটি মাত্র কবিতায় তার সামান্য আভাস পাওয়া যায়।—

"মনে পড়ে ঘরটি আলো
মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে
গুরু গুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে
ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের পরে' দৌরাত্মি সে
না যায় লেখা জোখা।
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে
করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে
সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে
শুনেছিলেম গান—
'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান।"

(বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, শিশু)

হয়তো এর থেকে মনে হয় কোন এক বর্ষণ মুখরিত রাতে হয়তো শিশু রবীন্দ্রনাথ এই ছড়াটি শুনেছিলেন তাঁর মায়ের মুখ থেকে। আর তা একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে, কারণ তাঁদের পরিবারে মেয়েদের মুখে রূপকথা ও ছড়া বলার প্রচলন ছিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বর্ষার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল অন্তরের যোগ, এই বিশেষ ঋতুটির প্রতি তাঁর আকর্ষণও ছিল প্রবল। তাই বোধ হয় এই সামান্য ছড়াটি অসামান্য রসের আবেদন নিয়ে এসেছিল তাঁর চেতনায়। যখন শুনলেন,—

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান,
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান,
এক কন্যে রেগে মেগে বাপের বাড়ী যান।"

— তখনি বর্ষার সমস্ত রূপ ও সৌন্দর্য এক মোহময় মূর্তি ধরে দেখা দিল বালকের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে। মনে হল জগতের সমস্ত কাব্য সৌন্দর্যের নির্যাস দিয়ে গড়া এই ছত্র চারটি — এ যেন শৈশবের মেঘদূত। অবশ্য কালিদাসের মেঘদূতের সঙ্গে তখনও

তাঁর পরিচয় হয়নি। কিন্তু পরে পরিণত বয়সে মেঘদূতের অপূর্ব কাব্য সুষমা, ভাবের গাম্ভীর্য, রসের আবেদন তাঁর মনে যে বিচিত্র মধুর অনুভূতি সঞ্চারিত করেছিল, ঠিক সেই অনুভূতিরই স্পর্শ উপলব্ধি করেছিলেন শৈশবে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত এই ছড়াটি শুনে। এ ধারণার সাক্ষ্য রূপে তাঁরই একটি উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়।—

"তখন এই চারটি ছত্র আমার বাল্যকালের মেঘদূতের মত ছিল। আমার মানসপটে একটি ঘন মেঘান্ধকার বাদলার দিন এবং উত্তাল তরঙ্গিত নদী মূর্তিমান হইয়া দেখা দিত। তাহার পর দেখিতে পাইতাম সেই নদীর প্রান্তে বালুর চরে গুটি দুয়েক পানসি নৌকা বাঁধা আছে এবং শিবু ঠাকুরের নববিবাহিত বধূগণ চড়ায় নামিয়া রাঁধাবাড়া করিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি, শিবু ঠাকুরের জীবনটিকে বড় সুখের জীবন মনে করিয়া চিত্ত কিছু ব্যাকুল হইত।" (ছেলেভুলানো ছড়া, লোকসাহিত্য)

এই সব দেখেশুনে বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে, রবীন্দ্রচেতনায় যে সৌন্দর্যবোধ, রসানুভূতি ও কল্পনাপ্রিয়তা স্বাভাবিক ভাবেই ছিল, তাঁর সমগ্র সাহিত্যে যার অজস্র সহস্রবিধ প্রকাশ,—তারই অভিব্যক্তি পথে কিছুটা সহায়তা করেছিল এই ছড়াটি অন্যান্য আরও অনেক কিছুর মত।

খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্যের কাছ থেকে শোনা আর একটি ছড়াও তাঁর শিশুচিত্তে আনন্দেব শিহরণ জাগিয়ে তুলত। ছড়াটি তাঁরই মনোরঞ্জনের জন্য রচিত এবং তার প্রধান নায়কও ছিলেন তিনি। নায়িকা ছিল বহুমূল্য অলঙ্কার পবিহিতা এক ভুবনমোহিনী বধূ যার রূপ গুণের তুলনা হয় না। বিষয়বস্তুটি চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই, এমনকি তেমন বয়সে সকলকেই তা ব্যাকুল করে তুলতে পাবে। কিন্তু সেদিন রবীন্দ্রনাথের মনে যে মধুর ভাব জেগে উঠেছিল তার কারণ ছিল সেই সুমিষ্ট ছড়ার দ্রুত উচ্চারিত শব্দচ্ছটা ও ছন্দের দোলা। জীবনস্মৃতিতে তিনি বলেছেন,—

"সেই কৈলাস মুখুজ্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত। আপাদমস্তক তাহার যে অলঙ্কারের তালিকা পাওয়া গিযাছিল এবং মিলনোৎসবের যে অভূতপূর্ব সমারোহের বর্ণনা শুনা যাইত, তাহাতে অনেক প্রবীণ বয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত — কিন্তু বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানাবর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য মুখচ্ছবি দেখিতে পাইত, তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা।"

আসলে ছড়ার গঠনে ভাব ও অর্থের চেয়ে ছন্দেরই প্রাধান্য, এবং শিশুমনের এক স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে ধ্বনির ঝঙ্কারের প্রতি। তাই ছড়ার ছন্দের দ্রুত তালে তালে যখন অনেক অসংলগ্ন ভাব ও অসম্ভব ঘটনা এসে উপস্থিত হয়, তখন শিশু কোন প্রশ্ন করে না, অবিশ্বাসও করে না, সন্দেহও করে না, কেবল মনশ্চক্ষে স্বপ্নবৎ ছবি দেখে যায়।

রবীন্দ্রনাথকেও কৈলাস মুখুজ্যের বলা ছড়াটির ছন্দময়তাই মুগ্ধ করেছিল। আর বিষয়বস্তুটি যে অপরূপ মাধুর্য মণ্ডিত হয়ে তাঁর মানসপটে জেগে উঠেছিল এবং তাঁর কল্পনা যে সত্য-অসত্যের সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা ছাড়িয়ে 'চোখে দেখা' জগৎ থেকে বহু দূরে, যুক্তিতর্কের অতীত এক রহস্যলোকে যাত্রা করেছিল তার মূলেও ছিল এই দ্রুতলয়ে উচ্চারিত ছন্দের দোলা। একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না যে ধ্বনির ঝঙ্কার ও মিলের এই মাধুর্য না থাকলে এমনটি সম্ভব হত না।

শেষ জীবনে লেখা একটি কবিতার মধ্যে শৈশবে শোনা অনুরূপ ভাববিশিষ্ট একটি ছড়ার কথা তিনি স্মরণ করেছেন এইভাবে—

ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত প'ড়ে
ভাবখানা মনে আছে— "বউ আসে চতুর্দোলা চ'ড়ে
আম কাঁঠালের ছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণ চক্রপায়ে।"
বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনী গানে
ছন্দের লাগল দোল আধোজাগা কল্পনার শিহর দোলায়।
আঁধার-আলোর দ্বন্দ্বে যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,
সত্য-অসত্যের মাঝে লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।
ছড়া বাঁধা চতুর্দোলা চলেছিল যে গলি বাহিয়া
গভীর নাড়ীর পথে অদৃশ্য রেখায় এঁকে বেঁকে।
তারি প্রান্ত থেকে
অশ্রুত সানাই বাজে অনিশ্চিত প্রত্যাশার সুরে
দুর্গম চিন্তার দূরে দূরে।
সেদিন সে কল্পলোকে বেহারাগুলোর পদক্ষেপে
বক্ষ উঠেছিল কেঁপে কেঁপে,
পলে পলে ছন্দে ছন্দে আসে তারা আসে না তবুও
পথ শেষ হবে না কভুও।

(বধূ, আকাশ প্রদীপ)

এখানে 'কৈলাস মুখুজ্যের' স্থলে ঠাকুরমা ছড়াটি বলার ভূমিকা নিয়েছেন। শুধু এইটুকু ছাড়া জীবনস্মৃতিতে বর্ণিত ছড়ার সঙ্গে এই ছড়া-প্রসঙ্গটির আর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এমন অবস্থায় কবি দু জায়গাতেই একই ছড়ার কথা স্মরণ করেছেন অথবা স্বতন্ত্র দুটির সে সম্পর্ক সংশয় দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু 'বধূ' কবিতায় প্রথম ছত্রের কোন এক পাঠের পাণ্ডুলিপিতে 'ঠাকুরমা' স্থলে 'মুখুজ্যে' পাওয়া যায়। এর থেকে মনে হয় তিনি হয়তো একই ছড়ার কথা বলতে চেয়েছেন।

অন্যপক্ষে এই 'ঠাকুরমা' কে ছিলেন তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কারণ তিনি এই

কবিতাটি ছাড়া অতীত স্মৃতি চারণের সময় আর কোথাও 'ঠাকুরমা'র উল্লেখ করেননি। অথচ অনেক জায়গাতেই তিনি তাঁর এক 'দিদিমা' অর্থাৎ মায়ের এক 'কাকিমা'র কথা বলেছেন, যিনি মাঝে মাঝে তাঁদের গল্প বলে শোনাতেন। হয়তো এই 'দিদিমাই' এখানে 'ঠাকুরমা' অভিধায় দেখা দিয়েছেন।

দিদিমার কাছ থেকে গল্প শোনা এবং মুখুজ্যের কাছ থেকে ছড়া শোনা এই উভয় ঘটনাই কবির মনে রেখাপাত করেছিল সন্দেহ নেই। সেসব স্মৃতিও তিনি বিস্মৃত হননি কোন দিন। তাই অনুমান করা যেতে পারে যে, শেষ জীবনে বাল্যস্মৃতি অবলম্বনে কবিতা রচনা করতে গিয়ে কোন কারণে হয়তো এই দুটি ঘটনা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে; এবং তারই প্রকাশ 'ঠাকুরমা' দ্রুততালে ছড়া যেত প'ড়ে।

এ ছাড়া আরও যে সব ছড়ার সংস্পর্শে তিনি এসেছেন শৈশবেই তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য, সহজ সরল ভাব প্রকাশের ক্ষমতা, সাবলীল ছন্দ মহিমা তাঁকে মুগ্ধ করেছে, লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর মনের আকর্ষণকে বাড়িয়ে দিয়েছে, এমনকি ছড়ার অনুকরণে কাব্য রচনায়ও প্রেরণা দিয়েছে। কবির স্মৃতি কথা সূত্রে এ বিষয়ের উল্লেখ না থাকলেও ছড়ার মূল্যায়ন ও তৎসম্পর্কিত আলোচনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সব প্রসঙ্গ পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনার অবকাশ আছে।

তবে একথা এখানেই স্মরণ করা যেতে পারে যে কবির শৈশব মানসিকতার সংগঠনে ছড়ার এই পূর্বসংস্কার হয়তো বহুদিন পরে জমিদারী পরিদর্শন কালে তাঁকে এক নগণ্য প্রজা লালা পাগলার মুখে নানারকম ছড়া কাটা শুনতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ঐ সময়ে লোকটি কবির কাছে প্রায়ই আসত, তাঁকে নানারকম ছড়া শুনিয়ে যেত আর পাগলামি করত। তিনি তার সঙ্গে খুব গল্প করতেন, তার সেই ছড়াকাটা এবং পাগলামি উপভোগ করতেন।

অবশ্য এই সব ছড়া শোনার অভিজ্ঞতা কবির সৃজনশীল মনে গভীর কোন প্রভাব বিস্তার করেছিল কিনা সে সম্পর্কে প্রমাণ-পরিচয় দুর্লভ। তবে সাধারণভাবে ছড়ার তানসৌন্দর্য তাঁর মনকে এবং সৃষ্টিকে যে উদ্দীপিত করেছিল সে বিষয়ের অনুসন্ধান ফল পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

ছড়ার মতই রূপকথার সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটেছিল শৈশবেই ; তাঁর মানসিকতার বিকাশ ও পরিণতিতে এর অপরিসীম প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এমনকি নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, যদি তিনি কোনদিন রূপকথার সংস্পর্শে না আসতেন তবে তাঁর মনের গঠনই হত বহুলাংশে অন্যরকম। আর তার ফলে কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ কোন পরিবেশে তাঁর মনে এমন অনেক বিচিত্র যে সব ভাবের উদয় হয়েছে, বিচিত্র উপলব্ধি জেগে উঠেছে, তা ঠিক তেমনভাবে নিশ্চয়ই হতে পারত না। বিশেষভাবে শিশুকাল থেকেই কবির অন্তরের অন্তস্থলে প্রবাহিত ছিল যে রোমাণ্টিক অনুভূতি, যে সৌন্দর্যবোধ ও রহস্যময় অসীম রূপলোকের প্রতি আকর্ষণ—রূপকথার সহায়তায় তাঁর চেতনায় তা এক স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ও পরিণতি পেয়েছে।

ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে নদীতীরের এক দৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন, "হয়তো সম্মুখের দৃশ্যটা খুব একটা চমৎকার কিছু নয়—একটা হলদে রকমের তৃণতরুশূন্য

বালির চর ধূ ধূ করছে, তারই গায়ে একটা জনশূন্য নৌকো বাঁধা রয়েছে এবং আকাশের ছায়ায় ফিকে নীলবর্ণ নদী বয়ে চলে যাচ্ছে— দেখে মনের ভিতরে কী রকম করে বলতে পারিনে—বোধ হয় সেই ছেলেবেলায় যখন আরব্য-উপন্যাস পড়তুম, সিন্ধবাদ নানা নূতন দেশে বাণিজ্য করতে বাহির হত, ভৃত্যশাসিত আমি তোষাখানার মধ্যে রুদ্ধ হয়ে বসে বসে দুপুরবেলায় সিন্ধবাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম, তখন যে আকাঙ্ক্ষাটা মনের মধ্যে জন্মেছিল সেটা যেন এখনো বেঁচে আছে— এই বালিচরে নৌকো বাঁধা দেখলে সেই যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় যদি আরব্য উপন্যাস রবিনসনক্রুসো না পড়তুম, রূপকথা না শুনতুম, তাহলে নিশ্চয় বলতে পারি ঐ নদীতীর এবং মাঠের প্রান্তের দূর দৃশ্য দেখে ঠিক এমনভাব মনে উদয় হত না — সমস্ত পৃথিবীর চেহারা আমার পক্ষে আর-এক রকম হয়ে যেত।" (ছিন্নপত্রাবলী) স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে রূপকথা শিশুকাল থেকে কবিকে মুগ্ধ করেছে এবং তার বিচিত্রভাব ও অনুভূতি তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

বালক রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাবেলাটা ছিল রূপকথার রসে নিবিড়। শঙ্করী কিংবা প্যারী কিংবা তিনকড়ি দাসী এসে শিয়রের কাছে বসে প্রতি সন্ধ্যায় গল্প বলে যেত। একে তো তাঁর শিশুমনে তখনও ছিল না সত্য-অসত্যের সংশয়, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব; তার ওপরে ক্ষীণ প্রদীপালোকে এই সব কাহিনীর সম্ভব-অসম্ভব ঘটনা তাঁর মনের ওপরে রহস্যের মায়াজাল ছড়িয়ে দিত, তাঁর কল্পনাকে নিয়ে যেত অনির্দেশ্য রূপলোকে যেখানে রাজপুত্র চলেছে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে। পরবর্তীকালে যে রোমাণ্টিক কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই, তার ভিত্তিভূমি অনেকটা পরিমাণে সুদৃঢ় করেছে শৈশবের রোমান্স—রূপকথাবলী।

এইসব রূপকথার কাহিনীর অনেক ঘটনা, অনেক বর্ণনা, অনেক ভাব সে সময় তাঁকে কখনও বেদনার্ত করে তুলত, কখনও আনন্দে অধীর, কখনও বা তাঁর হৃদয়কে ভয়ে বিস্ময়ে আশঙ্কায় ভাবিয়ে তুলত, আবার কোনও সময় করত চঞ্চল। তখনকার এই সব আবেগ অনুভূতি তাঁর স্মৃতিপটে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, বহুদিন পরেও তাঁর সৃজনধারায় কোথাও না কোথাও তার অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। কবির কথায় এ বিষয়ের স্বীকৃতিও ছড়িয়ে আছে বহু; তার থেকে একটি নির্বাচিত অংশ তুলে ধরছি — "কোনকালে ছেলেবেলায় তিনকড়ি দাসীর কাছে রাত্রে মশারির মধ্যে শুয়ে রূপকথার প্রসঙ্গে একটা বর্ণনা শুনেছিলেম, 'তেপান্তর মাঠ — জোচ্ছনায় ফুল ফুটে রয়েছে'—যখনি জ্যোৎস্নারাত্রে চরে বেড়াই তিনকড়ি দাসীর এই কথাটি মনে পড়ে। ছেলেবেলায় সেই রাত্রে তিনকড়ির এই একটি কথায় আমার মনটা ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছিল — প্রকাণ্ড মাঠ ধূ ধূ করছে, তারই মধ্যে ধবধবে জ্যোৎস্না হয়েছে, আর রাজপুত্র অনির্দেশ্য কারণে ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণে বেরিয়েছে — শুনে মনটা এমনি উতলা হয়েছিল! তা ছাড়া, রাজপুত্রের ভাগ্যে প্রায়ই পরমাসুন্দরী রাজকন্যা জুটত কিনা, সেটাতে মনটা আরও ক্ষুব্ধ হত। মনের ভিতরে কেমন একটা দুরাশা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, বড়ো হলে এই ধরনের একটা কোনো অদ্ভুত ঘটনা আমার দ্বারাও সম্ভব এবং নানা বিঘ্নবিপদের পারে কোনো এক জায়গায় কোনো একটি পরমাসুন্দরীও নিতান্ত দুর্লভ না হতে পারে। জ্যোৎস্নারাত্রে চরে বেড়াতে বেড়াতে ছেলেবেলাকার সেই মশারির ভিতরকার পুলকিত হৃদয়ের মোহ জেগে ওঠে; চারিদিকের

সমস্তই এমন অবাস্তব দেখতে হয় যে যা-কিছু অসম্ভব সেগুলোই আকার ধারণ করে ওঠে, নিজের কল্পনার মরীচিকার মধ্যে নিজে মুগ্ধভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াই—তার আর কোথাও সীমা নেই, বাধা নেই।" (ছিন্নপত্রাবলী)

একে তো রোমাণ্টিক মানসে জ্যোৎস্নার অমোঘ প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না কোন মতে, তার ওপরে রূপকথার 'এই ফুল ফোটানো জ্যোৎস্না' তাঁর শিশু মনে রূপকথার রহস্যময় যে স্নিগ্ধ শান্ত জগৎ গড়ে তুলত, পরে পরিণত মনেও তা ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে আর এক রোমান্সের রহস্য নিয়ে উপনীত হয়েছে। ছিন্নপত্রাবলীর বিভিন্ন পত্রেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উপরোক্ত ছিন্নপত্রের চিঠিটিতে কবি বলেছেন যে ছেলেবেলায় তিনকড়ি দাসীর মুখে শুনেছেন— 'জোচ্ছনায় ফুল ফুটে রয়েছে'। আবার 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে বলেছেন যে, "পিয়ারী কিম্বা শঙ্করী গল্প শোনাচ্ছে, কানে আসছে—'জোচ্ছনায় যেন ফুল ফুটেছে'—" সুতরাং কার মুখ থেকে তিনি এই বর্ণনা শুনেছেন সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়।

তবে একটু লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে উক্ত চিঠিটি 'ছেলেবেলা' গ্রন্থ রচনার অনেক আগেই লিখিত, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, আর 'ছেলেবেলা' কবির শেষ বয়সের রচনা—১৯৪০ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং প্রথমটিতে স্মৃতির স্পষ্টতা থাকাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এই অনুমানের স্বপক্ষে আরো কিছুটা সহায়তা করে 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে এ সম্পর্কে কবির উক্তির অনির্দিষ্টতা— 'পিয়ারী কিংবা শঙ্করী গল্প শোনাচ্ছে', বিশেষভাবে কে শোনাচ্ছে তা কবির মনে পড়েনি।

আবার শৈশবে কবি তাঁর এক দিদিমার কাছেও রূপকথার গল্প শুনতেন বলে জানা যায়। আগে বলেছি, ইনি হলেন তাঁর মায়ের এক কাকিমা। কোন কোন বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায় মাস্টারের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় মায়ের ঘরে এসে উপস্থিত হতেন শিশু কবি এবং সে আশা পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে দিদিমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন গল্প বলার জন্যে। অবশেষে দিদিমা অসমাপ্ত তাস খেলা ফেলে রেখে বলতে শুরু করতেন,—'এক যে ছিল রাজা'। আর অসীম কৌতূহল নিয়ে পুলকিত চিত্তে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন শিশু রবীন্দ্রনাথ।

এছাড়া নিজে পড়েও যে তিনি রূপকথার মাধুর্য আস্বাদন করেননি তা নয়। আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, মৎস্যনারীর উপাখ্যান, রবিনসন ক্রুশো এ সমস্ত তিনি নিজেই পড়েছেন শৈশবে। আর তার ফলস্বরূপ তাঁর মনের মধ্যে এইসব কাহিনীর মায়াময় সৌন্দর্য এক হয়ে মিশে গেছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের তীব্র মধুর সৌন্দর্যের সঙ্গে—যা চিরদিন তাঁকে উদাস আকুল করে তুলেছে, তাঁর মনকে দিয়েছে ভুলিয়ে।

রবীন্দ্রমন এমনিতেই স্বাভাবিক ভাবে সুদূরের অভিসারী। জগতের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে অসীমের প্রতি তিনি কৌতূহলী হয়েছেন বারেবারে। জীবনে যত কিছু জানা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশী যা অজানা থেকে যায় সেই অসীম রহস্যলোক তাঁকে বার বার আকর্ষণ করেছে। রূপকথার জগৎ এই অজানা রহস্যময় সৌন্দর্যলোকের জগৎ। তাই তা সহজেই

রবীন্দ্রমনকে মুগ্ধ করেছে এবং তাঁর এই অজানার প্রতি অসীমের প্রতি কৌতূহলকে তীব্র করে তুলেছে। বস্তুতঃ এই রূপকথা জনিত সংস্কারের বশেই বালক রবীন্দ্রনাথ ভাবতেন যে অনেক বাঁশ যদি ঠুকে ঠুকে পোঁতা যায়, তাহলে পৃথিবীর গভীরতম তলার রহস্য জানা যাবে। তাই মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে কাঠের থাম লাগাবার জন্য যখন মাটি কাটা হত, তখন তিনি গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে সেই দিকেই তাকিয়ে থাকতেন। কিন্তু কোনবারই এমন কিছু ঘটেনি যাতে রাজপুত্র বা পাত্রের পুত্রের পাতালপুর যাত্রা সফল হতে পারে। তবুও প্রত্যেক বারই মনে হত একটা রহস্য সিন্দুকের দ্বার যেন খোলা হচ্ছে। আরও মনে হত যেন আরেকটু খুঁড়লেই হয়, কিন্তু বছরের পর বছর চলে গেল, সেই আরেকটু কোনবারেই খোঁড়া হল না।

সে সময় আরেকটি জিনিস তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত সে হল রাজবাড়ীর রহস্য। রূপকথার সঙ্গে রাজবাড়ীব একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাই স্বাভাবিক কারণেই গল্প শুনতে শুনতে তাঁর শিশুমন ব্যাকুল হয়ে উঠত এই রাজবাড়ী আবিষ্কারের আগ্রহে। তাঁর সমবয়স্কা এক বাল্যসঙ্গিনী এর রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে তুলতেন রাজবাড়ীতে তাঁর গোপন অভিসারের কথা বলে। এই বাল্যসঙ্গিনী হলেন তাঁর ভাগিনেয়ী ইরু বা ইরাবতী, সৌদামিনী দেবীর কন্যা।

ইরাবতী প্রায় প্রতিদিনই এসে রবীন্দ্রনাথের মত কল্পনা-প্রিয় বালককে শোনাতেন তাঁর রাজবাড়ী গমনের কথা এবং সেখানে দেখা আরও অনেক আশ্চর্য রকমের ঘটনা। কিন্তু কিছুতেই বলেননি কোথায় সেই রাজার বাড়ী বা কিভাবে সেখানে যাওয়া যায়। এমনকি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবেও রাজী হননি কোনদিন। কেবল এইটুকু মাত্র আভাস দিয়েছেন যে তাঁদের বাড়ীতেই সে রাজারবাড়ী, এবং সে এক আশ্চর্য জায়গা, সেখানকার খেলাও যেমন অদ্ভুত, খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ। বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বাড়ীর প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়িয়েছেন সেই আশ্চর্য অদেখা রাজবাড়ীকে, আর ব্যর্থ হয়েছেন বারেবারেই। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের কথা,—"রাজা যে কে সে-কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নাই, রাজত্ব যে কোথার তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে— কেবল এইটুকু মাত্র পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের বাড়ীতেই সেই রাজার বাড়ী।" (জীবনস্মৃতি)

অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, এই রাজবাড়ী চিরকাল অজানা থেকে গেছে বলেই তা এমন মায়াময় রহস্যপুরী হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর কল্পনায়; এবং তাঁর অধরার প্রতি আকর্ষণকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে যা রূপ পেয়েছে তাঁর কাব্যে কবিতায়।

এমনি করে দেখি রূপকথার রহস্য রবীন্দ্রনাথের মনের পরিণতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছিল। তাঁর অবচেতনার মধ্যে ছড়িয়ে ছিল রূপকথার মায়ালোক। তাই বড় হয়েও যখনই সুন্দরকে দেখেছেন তখনই বিস্মিত হয়েছেন, মনের গহনে রূপকথার চাবি গিয়েছে খুলে। কাব্যে কবিতায় রূপকথার রস অজস্র ধারায় ঝরে পড়েছে। সে কথা পরের পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে নিছক ব্যক্তিমনের অনুভবের তলদেশ হতে এই রূপকথার জগতের

আকস্মিক উন্মোচনের সাক্ষ্যরূপে ছিন্নপত্রের একটি চিঠির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন অনুভব করছি। — "ক্রমে যখন অন্ধকারে সমস্ত অস্পষ্ট হয়ে এল, কেবল জলের রেখা এবং তটের রেখায় একটা প্রভেদ দেখা যাচ্ছিল, এবং গাছপালা কুটির সমস্ত একাকার হয়ে একটা ঝাপসা জগৎ চোখের সামনে পড়েছিল তখন ঠিক মনে হচ্ছিল এ-সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার জগৎ — যখন এই বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পূর্ণ গঠিত হয়ে ওঠেনি, অল্পদিন হল সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতিবিস্ময়পূর্ণ ছম্‌ছম্‌ নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন— যখন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে মায়াপুরে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, যখন রাজপুত্র এবং পাত্তরের পুত্র তেপান্তরের মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে— এ যেন তখনকার সেই অতি সুদূরবর্তী অর্ধ-অচেতনায় মোহাচ্ছন্ন মায়ামিশ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি নদীতীর — এবং মনে করা যেতেও পারে আমি সেই রাজপুত্র একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি — এই ছোটো নদীটি সেই তেরো নদীর মধ্যে একটা নদী, এখনো সাত সমুদ্র বাকি আছে — এখনো অনেক দূর, অনেক ঘটনা, অনেক অন্বেষণ বাকি — এখনো কত অজ্ঞাত নদীতীরে কত অপরিচিত সমুদ্র সীমায় কত ক্ষীণ চন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি অপেক্ষা করে আছে — তারপরে হয়তো অনেক ভ্রমণ, অনেক রোদন, অনেক বেদনের পর হঠাৎ একদিন আমার কথাটি ফুরোলো, নটে শাকটি মুড়োলো — হঠাৎ মনে হবে এতক্ষণ একটা গল্প চলছিল, সেই রূপকথার সুখদুঃখ নিয়ে কখনো হাসছিলুম কখনো কাঁদছিলুম, এখন গল্প ফুরিয়েছে, এমন অনেক রাত্রি, এখন ছোটো ছেলের ঘুমোবার সময়।"

পরিণত বয়সে রূপকথার রসনিমগ্নতার প্রকাশ রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বে বারে বারে ঘটেছে। আসলে তিনি অন্তহীন বিশ্বরহস্যের সম্মুখে জনজীবনের কৌতূহল ও মগ্নতা নিয়ে চিরকাল যেন দাঁড়িয়েছিলেন। অতলস্পর্শ রহস্যের সৌন্দর্য যখনই তাঁর কবিমনকে অভিভূত করেছে, তখনই রূপকথার জগতে জেনে না জেনে চলেছে তাঁর মানসাভিসার; এবং তাতে দেশবিদেশের কোন বাঁধন ছিল না।

রূপকথারই অপর একটি শাখা উপকথা। এই শ্রেণীর গল্পের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েছিলেন অল্পবয়সেই। আব্দুল মাঝি তার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার রঙ মিশিয়ে বাঘ আর কুমির শিকারের গল্প শুনিয়ে যেত। গল্প শেষে তিনি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে যেতেন, 'তারপর?' অবশ্য এই 'তারপরে'র রহস্যের সন্ধান তিনি কোনদিনই পাননি। বাড়ীর ভৃত্য শ্যামের মুখ থেকে শুনেছেন ডাকাতদলের রোমাঞ্চকর গল্প — বিশু ডাকাত আর রঘু ডাকাতের দুঃসাহসিক কাহিনী; জামাই হত্যাকারী ডাকাত জমিদারের মর্মভেদী বেদনার কথা। এই সব ডাকাতরা তাঁর মনের একদিকে যেমন জাগিয়ে তুলত ভয় ও আতঙ্ক, অন্যদিকে তেমনি জাগাত প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধাবোধ। কারণ এই সব ডাকাতদের যেমন ছিল দৈহিক শক্তি, তেমনি ছিল উদার মন। তারা খবর দিয়ে ডাকাতি করত, কোনরকম ইতরতাকে প্রশ্রয় দিত না। শুধু তাই নয়, তারা অসহায়কে রক্ষার জন্য, দুর্বলকে সবলের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রায়ই এগিয়ে আসত। তাদের চরিত্রের এই উদাত্ততা-মণ্ডিত দিকটি স্বভাবতই মুগ্ধ করত তাঁকে। শৈশবে শোনা এদের কাহিনী তাঁর বিস্মৃতির অতলে

তলিয়ে যায়নি, কোন না কোন ভাবে এর প্রভাব দেখতে পাই তাঁর জীবন ও সাহিত্যে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ডাকাতদলের রণপায় চলার অভ্যাস শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মধ্যে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন, ডাকাতি করার উদ্দেশ্য যদিও ছিল না তার মূলে।

শেষ জীবনে রঘু ডাকাতের এইরকম ভয় ও সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলা চরিত্রের কাহিনী অবলম্বনে রচিত কবিতার প্রারম্ভে তিনি বলেছেন যে, এ কাহিনী তিনি শুনেছেন বুড়ো মোহন সর্দারের কাছে।

কিন্তু এখানে লক্ষ্যণীয়, কবি 'ছেলেবেলা'য় বলেছেন যে রঘু ডাকাতের কাহিনী তিনি শুনেছেন শ্যামের মুখ থেকে, আর আলোচ্য কবিতায় বলেছেন বুড়ো মোহন সর্দারের কাছে। আসলে গল্প-বলিয়ের পরিচয় সম্পর্কিত বিষয়টি বিতর্কযোগ্য সন্দেহ নেই। তবে এ সম্পর্কে কোন বিতর্ক উপস্থিত না করে সহজভাবে বলা যেতে পারে যে, তখনকার কালে ডাকাতের গল্প ছিল লোকের মুখে মুখে প্রচলিত। আর বিখ্যাত রঘু ডাকাতের কাহিনী কারও অজানা ছিল না। তাই ডাকাতের গল্প বলতে গিয়ে শ্যামও বলেছে এর কথা, আবার বুড়ো মোহন সর্দারও হয়তো তাই। সকলেই গল্প বলতে গিয়ে প্রচলিত জনপ্রিয় কাহিনীর অবতারণা করতে চায়, সুতরাং রঘু ডাকাতের কাহিনী দুজনের মুখ থেকে শোনা অসম্ভব নয়। আবার আলোচ্য গল্প-বলিয়ে বুড়ো মোহন সর্দার কোন একসময় ডাকাতদলের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং পরে ঠাকুরবাড়ীতে কর্মে নিযুক্ত হয়েছিল। এ তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; এ বিষয়ে অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয় শেষসপ্তক কাব্যগ্রন্থের ৩২ নং কবিতার ভিত্তিতে।

যাই হোক এই সমস্ত উপকথার গল্প কবির মনের ওপর এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, শৈশবে কল্পনায় তাঁর মনকে তা নিয়ে যেত ভয়-আতঙ্ক শিহরণে মেশা এক রোমাঞ্চকর রহস্য লোকে।—

"ছুটির রবিবার। আগের সন্ধেবেলায় ঝিঁ ঝিঁ ডাকছিল বাইরের দক্ষিণের বাগানের ঝোপে, গল্পটা ছিল রঘু ডাকাতের। ছায়া-কাঁপা ঘরে মিটমিটে আলোতে বুক করছিল ধুক ধুক। পরদিন ছুটির ফাঁকে পালকিতে চড়ে বসলুম। সেটা চলতে শুরু করল বিনা চলায়, উড়ো ঠিকানায়, গল্পের জালে জড়ানো মনটাকে ভয়ের স্বাদ দেবার জন্যে। নিঝুম অন্ধকারের নাড়িতে যেন তালে তালে বেজে উঠছে বেহারাগুলোর হাঁই হুই হাঁই হুই, গা করছে ছমছম। ধূ ধূ করে মাঠ, বাতাস কাঁপে রোদ্দুরে, দূরে ঝিক ঝিক করে কালীদিঘির জল, চিকচিক করে বালি। ডাঙার উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে ফাটল-ধরা ঘাটের দিকে ডালপালা ছড়ানো পাকুড় গাছ।

গল্পের আতঙ্ক জমা হয়ে আছে না-জানা মাঠের গাছতলায়, ঘন বেতের ঝোপে। যত এগোচ্ছি দুরদুর করছে বুক। বাঁশের লাঠির আগা দুই-একটা দেখা যায় ঝোপের উপর দিকে। কাঁধ বদল করবে বেহারারা ঐখানে। জল খাবে, ভিজে গামছা জড়াবে মাথায়। তার পরে?—

'রে রে রে রে রে রে।' " (ছেলেবেলা)

এইসব রূপকথা উপকথার কাহিনী সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এগুলো যদি কারও মুখ থেকে না শোনা যায়, তাহলে এর রস এমন নিবিড় হয়ে উঠতে পারে না, এর প্রকৃত মাধুর্য থেকে যায় অনাস্বাদিত। রূপকথার কল্প রাজাটি আর তখন শিশুমনে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। শৈশবে রবীন্দ্রনাথের রূপকথার গল্প শুনে শুনে উপভোগ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে শিশুরা আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে রূপকথার গল্প পড়ে বই থেকে, শুনতে পায়না কারও মুখ থেকে। অথচ রূপকথার মূল রস নিহিত তার বলার ভঙ্গীতে। বস্তুতঃ গল্প শুনতে শুনতে শিশুমনে যে রূপকথার রাজ্য গড়ে ওঠে, তা বিদায় নিয়ে যাচ্ছে একালের শিশুর মন থেকে, তাদের কল্পনার জগৎ সৃষ্টির কেন্দ্রটি হয়ে যাচ্ছে সঙ্কীর্ণ। রবীন্দ্রনাথ তাই রূপকথার এই অবক্ষয় সম্পর্কে আক্ষেপ করে বলেছেন, " রূপকথা আজকাল ছেলেরা মেয়েদের মুখ থেকে শুনতে পায়না, নিজে নিজে পড়ে ছাপানো বই থেকে।" আরও বলেছেন,—

"তারপরে এসেছে যুগান্তর।
বিদ্যুতের প্রখর আলোতে
ছেলেরা আজ খবরের কাগজে
পড়ে ডাকাতির খবর।
রূপকথা শোনা নিভৃত সন্ধেবেলাগুলো
সংসার থেকে গেল চলে,
আমাদের স্মৃতি
আর নিবে যাওয়া তেলের প্রদীপের
সঙ্গে সঙ্গে।"

(শেষ সপ্তক)

অবশ্য তিনি নিজেও যে কোন কোন রূপকথার গল্প বই থেকে পড়েননি তা নয়। আগেই বলা হয়েছে আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি বিদেশী রূপকথার গল্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বহুলাংশে বইয়েরই মাধ্যমে, আর এই সব কাহিনীও যে তাঁর মনে এনে দিত এক অনাস্বাদিত মাধুর্য ও রহস্যময় ব্যাকুলতা সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। হয়তো রূপকথার গল্প শুনে শুনে তাঁর মনের ক্ষেত্রটা প্রস্তুত হয়েই ছিল কল্পনার জগতে বিচরণের জন্য, তাই সহজেই এই সমস্ত বইয়ে পড়া কাহিনীও তাঁর মনে ঠিক একই রকম আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

সম্ভবে অসম্ভবে মেশা এ জাতীয় গল্প তাঁর মনে প্রথম থেকেই রেখাপাত করেছিল বলেই দেখা যায়, পরবর্তীকালে কবি অনেককেই রূপকথা সংগ্রহের জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং নিজেও যেখানে যার কাছে পেরেছেন গল্প শুনেছেন গভীর আগ্রহ নিয়ে। জমিদারী পরিদর্শনের সময় সামান্য প্রজা 'লালচাঁদ মিঞা'র কাছে 'বাঘসিঙ্গিমামা'র গল্প এবং অনেক দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী (যার নায়ক সে নিজে) শুনেছেন নিছক এই রূপকথার সংস্কারের বশেই। তিনি যে শুধু গল্প শুনতেন তা নয়, প্রশ্ন করে করে গল্পের দৈর্ঘ্য দিতেন বাড়িয়ে।

এছাড়া লোকসঙ্গীতের সংস্কার ও প্রভাব রবীন্দ্রমনের গঠনে কিছুমাত্র কম নয়। একথা বার বার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে ছড়া ও রূপকথা ব্যতীত লোকসাহিত্যের প্রায় অধিকাংশ বিষয়ই মূলতঃ সঙ্গীত বা গীতি রসাত্মক। রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল থেকেই লোকসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন কোন না কোন সূত্রে। তবে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, বাউল ও কীর্তন, যাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় অনুরাগ এবং যাদের দ্বারা সবচেয়ে বেশী পরিমাণে তিনি প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁর সমগ্র কাব্যে সাহিত্যে, সঙ্গীতে যাদের সুর, ভাব ও বাণীর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় কখনও স্বরূপে কখনও পরিশীলিত বা ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে, তাদের সঙ্গে পরিচয় কিন্তু তাঁর মানসগঠনের সময় বাল্য বা কৈশোরে হয়নি বললেই চলে। অবশ্য অন্য অনেক লোকসঙ্গীত শুনতে শুনতে অল্পবয়স থেকেই তাঁর মনে এর রস আস্বাদন ও এর দ্বারা প্রভাবিত হবার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে গেছে সচেতন বা অচেতন ভাবে।

এ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে যে এক সুকর্ষিত, সুমার্জিত আধুনিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ জন্মাবধি পরিবর্ধিত হয়েছেন এবং তাঁদের পরিবারে সব সময় যে সঙ্গীতের হাওয়া বইত সে ছিল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের। সেকালে ধনী অভিজাত পরিবারে সঙ্গীতের পারদর্শিতা বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ বলে গণ্য হত। বলাই বাহুল্য এ সঙ্গীত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। কবি নিজেও এ সম্পর্কে বলেছেন, — "বাংলা দেশে আধুনিক যুগের যখন সবে আরম্ভকাল তখন আমি জন্মেছি। .... দেখেছি তখনকার বিশিষ্ট পরিবারে সংগীত বিদ্যার অধিকার বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ বলে গণ্য হ'ত। বর্তমান সমাজে ইংরেজি রচনায় বানান বা ব্যাকরণের স্খলনকে আমরা অশিক্ষার লজ্জাকর পরিচয় বলে চমকে উঠি, তেমনি হত যদি দেখা যেত — সম্মানী পরিবারের কেউ গান শোনবার সময় সখে মাথা নাড়ায় ভুল করেছে কিম্বা ওস্তাদকে রাগ-রাগিণীর ফর্মাশের বেলায় রীতি রক্ষা করেনি।" (সংগীত চিন্তা)

কবির নিজের জীবনেও তাই শৈশবে খ্যাতনামা সঙ্গীত শিক্ষকের (বিষ্ণু চক্রবর্তী) তত্ত্বাবধানে সঙ্গীতচর্চা আরম্ভ হয়। কিন্তু এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গান দিয়ে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার সূত্রপাত, আসলে সে গান ছিল লোকসঙ্গীত। অন্ততপক্ষে ভাবে ভাষায় গ্রাম্যতাই ছিল তার একমাত্র পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে সে কথাই বলেছেন,- "বিষ্ণু যে গানে হাতে খড়ি দিলেন এখনকার কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নীচের তলার। দুই-একটা নমুনা দিই—

এক যে ছিল বেদের মেয়ে
এল পাড়াতে
সাধের উলকি পরাতে।
আবার উলকি পরা যেমন তেমন
লাগিয়ে দিল ভেলকি
ঠাকুর ঝি,
উলকির জ্বালাতে কত কেঁদেছি

ঠাকুরঝি।

আরো কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া লাইন মনে পড়ে। যেমন —

চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে, জোনাক জ্বালে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হল,
ফার্সি পড়ে তাঁতি।

গণেশের মা, কলাবউকে জ্বালা দিয়োনা,
তার একটি মোচা ফললে পরে।
কত হবে ছানা পোনা।

অতি পুরানো কালের ভুলে যাওয়া খবরের আমেজ আসে এমন লাইনও পাওয়া যায়। যেমন —

এক যে ছিল কুকুর চাটা
শেয়াল কাঁটার বন
কেটে করলে সিংহাসন।" (ছেলেবেলা)

এ গানগুলোর গভীর কোন প্রভাব তাঁর মনের ওপর পড়েছিল কিনা বলা যায় না, তবে এদের ভেতরে ব্যবহৃত হাল্কা চালের বাংলা শব্দ ও বাঁয়া তবলার বোল নিরপেক্ষ দিশি তান কবির মনকে নাড়া দিত সহজে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গভীরতা তাঁকে আকর্ষণ করত সন্দেহ নেই, কিন্তু বিষ্ণুর কাছে শেখা দেশী গানের সারল্য তাঁর মনে সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করেছে অনেকটা পরিমাণে। পরিণত বয়সে সাহিত্য ও সঙ্গীতের রস আস্বাদনে লোকসাহিত্য সঙ্গীতের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেছেন "শিশুদের মন ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন ভোলানো গান শেখানোর শুরু সেই ছড়ায়।"

বিষ্ণুর কাছে দেশী গান শেখা ছাড়াও আরও অনেকের মুখ থেকে অনেক রকমের লোকসঙ্গীতের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছেন। এবং তখন থেকেই এর প্রতি তাঁর অনুরাগও হয়েছিল প্রবল।

কবির পিতার এক অনুচর ছিলেন কিশোরী চাটুজ্জে। তিনি প্রায়ই এসে তাঁকে পাঁচালির ছড়া শুনিয়ে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে তুলতেন। পাঁচালির অনুপ্রাসের ঝকমকি, শব্দের মিল ও ঝঙ্কারই ছিল এর প্রতি তাঁর আকর্ষণের প্রধান কারণ। তার ওপর গান শোনানোর শেষে কিশোরী চাটুজ্জে আফশোষ করে বলতেন যে যদি বালক রবীন্দ্রনাথকে পাঁচালির দলে পেতেন, তাহলে দেশে যা হয় একটা নাম থাকত। শেষোক্ত এই কথা কটি বালক কবির চিত্তকে আরও আলোড়িত করে তুলত এবং পাঁচালির দলে ভিড়ে নতুন নতুন দেশে গান শুনিয়ে আসার অদম্য আকাঙ্ক্ষাটা প্রবল হয়ে উঠে সুদূরের প্রতি তাঁর মনের সহজ আকর্ষণকে আরও গভীর করে তুলত। 'বালক' নামের একটি কবিতাতে তাঁর সে সময়কার মনোমুগ্ধকর অনুভবের প্রকাশ দেখতে পাই।—

"বয়স তখন ছিল কাঁচা, হালকা দেহখানা
ছিল পাখির মত, শুধু ছিল না তার ডানা।

কিশোরী চাটুজ্যে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে,
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া,
থাকত আমার খাতা লেখা, প'ড়ে থাকত পড়া;
মনে মনে ইচ্ছে হত যদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালির দলে,
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।"

এই কিশোরী চাটুজ্জের কাছ থেকে তিনি আরও অনেক এ জাতীয় গান শিখেছিলেন। যেমন, 'ওরে ভাই, জানকিরে দিয়ে এসো বন', 'প্রাণ তো অন্ত হল আমার কমল আঁখি', 'রাঙা জবায় কী শোভা পায় পায়', 'কাতরে রেখো মা রাঙাপায়, মা অভয়ে' বা 'ভাবো শ্রীকান্ত, নরকান্তকারীরে, নিতান্ত কৃতান্ত হবে ভবে' প্রভৃতি এবং এ গানগুলিতে শিশুদের আসর যেমন জমে উঠত তেমন আর কিছুতে হত না।

আবার ঠাকুরবাড়ীর এক ভৃত্য চিন্তা গুন গুন করে গাইত মধুকানের গান আর তিনি চুপ করে বসে তা শুনতেন। তাঁর মনের গঠনে এর সংস্কার ও ফলশ্রুতি হিসেবে দেখতে পাই, পরবর্তী জীবনে এই গান শোনার স্মৃতি হঠাৎ হঠাৎ অনেক সময়েই তাঁর মনে জেগে উঠেছে অকারণে, এবং তাঁর বর্তমানের সঙ্গে, তাঁর চোখে দেখা জগতের সঙ্গে এই ঘটনা এক হয়ে গিয়ে বিচিত্র এক ভাবের সৃষ্টি করেছে। তাঁর অনেক লেখাতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। তার থেকে একটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি, "যখন সেজদাদাদের ঘরে তোষাখানা ছিল এবং চিন্তা বলে একটা চাকর শীতকালের সকালে গুন গুন করে গান করতে করতে কয়লার আগুনে জ্যোতিদাদার জন্যে মাখন দিয়ে রুটি তোষ করত — তখন আমাদের গরম কাপড় ছিল না, একখানা কামিজ প'রে সেই আগুনের কাছে বসে শীত নিবারণ করতুম এবং সেই সশব্দ বিগলিত নবনী সুগন্ধি রুটিখণ্ডের উপরে লুব্ধ দুরাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চুপ করে বসে চিন্তার গান শুনতুম (সে সুরটা এখনও মনে আছে, তাকে মধুকানের সুর বলে) — সেই সমস্ত দিনগুলিকে ঠিক বর্তমানের মত করে দেখছিলুম এবং সেই সমস্ত দিনগুলির সঙ্গে এই রৌদ্রালোকিত পদ্মা এবং পদ্মার চর ভারী একরকম সুন্দরভাবে মিশ্রিত হচ্ছিল, ঠিক যেন আমার সেই ছেলেবেলাকার খোলা জানালার ধারে বসে এই পদ্মার একটি দৃশ্যখণ্ড দেখছি বলে মনে হচ্ছিল।" (ছিন্নপত্রাবলী)

নিতান্ত বাল্যকালে কবি একটি গান শুনেছিলেন, 'তোমায় বিদেশিনী কে সাজিয়ে দিল'। গানটি কে গেয়েছিল তা তাঁর মনে না থাকলেও গানের পদটি তিনি বিস্মৃত হননি কোনদিন। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝেই গানের কলিটি তাঁর মনের মধ্যে গুনগুন করে বেড়াত এ কথা তিনি নিজেই বলেছেন। তবে এর মধ্যে যদি সুরের ব্যঞ্জনা না থাকত, তাহলে কবির মনে

তা এমন প্রভাব জাগাতে পারত কিনা, বা তাঁকে এই ভাবে মুগ্ধ করতে পারত কি না বলা যায় না। সুরের মাধুর্যের জন্যই পদটির এই বিদেশিনী সুন্দরী তাঁর রোমাণ্টিক চেতনায় এক অধরা মাধুরী নিয়ে দেখা দিয়েছিল, মনে হয়েছিল অজানা বা অর্ধজানা জগতে তার বাস, যা একমাত্র রূপকথার মায়ারাজ্যের সঙ্গেই তুলনীয়। এমনকি এই গানটি তাঁর মনে এমন রোমান্সের উপলব্ধি সঞ্চারিত করেছিল যে তার পরিণতি দেখা যায় তাঁর গানে কবিতায়। আবার তিনি এর মধ্যে বাউল গানের ভাব-সাদৃশ্যও খুঁজে পেয়েছেন। জীবনস্মৃতিতে এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন "একদিন ওই গানের ওই পদটার মোহে আমিও একটা গান লিখিতে বসিয়াছিলাম। স্বর গুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইনটা লিখিয়াছিলাম, 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী'— সঙ্গে যদি সুরটুকু না থাকিত তবে এ গানের কী ভাব দাঁড়াইত বলিতে পারি না। কিন্তু এই সুরের মন্ত্রগুণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্তি জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল, আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে — কোন্ রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপর তাহার বাড়ি — তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবী রাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই — হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম—

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
আমি এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী।

ইহার অনেক দিন পরে একদিন বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল —

'খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।'

দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক ওই একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায় — মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির নিঃশব্দ আসা-যাওয়ার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।"

আবার শৈশবে পিতার সঙ্গে বোটে করে বেড়াতে বেড়াতেও শুনতে পেয়েছেন মাঝি মাল্লাদের কণ্ঠের নানা রকম গান। সে সব গান শুনে সেই অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে তাঁর মনে অপরূপ ভাবের উদয় হত। কোন কোন নিস্তব্ধ রাত্রিতে দূরে মিলিয়ে যাওয়া গানের ধ্বনি তাঁর সুদূরের পিপাসাকে অদম্য করে তুলত। এমনকি একটি ছিপছিপে ডিঙি নিয়ে গান গাইতে গাইতে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার এবং সেখানকার সব রহস্য জানবার জন্য তীব্র বাসনাও জাগত।

শুধু তাই নয়, বহুদিন পরে আবার বোটে করে বেড়াতে বেড়াতে জেলে ডিঙিতে একজন মাঝির গাইতে গাইতে যাওয়া গান তাঁর মনে সেই শৈশবে অনুভূত অনির্বচনীয় উপলব্ধিটিকে পুনরায় সঞ্চারিত করেছে। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, ঐ সব লোক-

কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত তাঁর মনের গহনে কিভাবে স্থান করে নিয়েছিল। ছিন্নপত্রাবলীর ৩২ নং চিঠিতে কিংবা শেষ জীবনে রচিত 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের 'ঘণ্টা বাজে দূরে' কবিতাটির মধ্যে এরই স্মৃতিচিত্রটি অভিব্যক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় বাউল বা কীর্তনের ওপর গভীর অনুরাগের পরিচয় থাকলেও তাঁর শৈশবে শ্রুত এ জাতীয় কোন গানের (মধুকানের ঢপকীর্তন ছাড়া) কথা জানা যায় না। মনে হয়, শিলাইদহে এসেই তিনি এ ধরনের গানের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। এখানে তিনি বাউল বৈষ্ণবদের সঙ্গে নানারকম আলাপ আলোচনা করেছেন, তাদের কাছে অনেক গান শুনেছেন; একথা তিনি নিজেই বলেছেন বারে বারে। শৈশবেই তাঁর মনের গঠনে লোকসাহিত্য যে সংস্কার ও প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা পূর্ণতা পেয়েছে পরিণত বয়সে এখানে আসার পর যার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ছড়িয়ে আছে তাঁর সমগ্র সাহিত্যে।

তবে কবি এক জায়গায় বলেছেন যে, যখন তাঁর নবীন বয়স তখন কলকাতাতেই শিলাইদহ অঞ্চলের এক বাউলের মুখে একটি গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। গানটি হল, 'আমি কোথায় পাব তারে'। এর কথা নিতান্ত সহজ হলেও সুরের যোগে তাঁর কাছে গানের অর্থ অপূর্ব উজ্জ্বল হয়ে উঠে দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু এখানে নবীন বয়স বলতে কবি তাঁর জীবনের ঠিক কোন সময়কে বুঝিয়েছেন তা জানা যায় না। এর দ্বারা বাল্য, কৈশোর বা প্রথম যৌবনের যে কোন সময়কেই বোঝান হয়ে থাকতে পারে।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ বাউলের গান শুনেছিলেন প্রধানতঃ গগন হরকরার কাছে। ইনি ছিলেন শিলাইদহ পোষ্ট অফিসের সাধারণ কর্মচারী — গ্রামে গ্রামে চিঠি বিলি করাই ছিল তাঁর কাজ। এঁর পুরো নাম ছিল গগনচন্দ্র দাস এবং সামান্য বাংলা লেখাপড়া ইনি জানতেন। কিন্তু তাঁর গানের সুর, ভাবের ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করেছিল। তিনি প্রায়ই এঁর কাছে বসে গান শুনতেন, শুধু তাই নয় এঁর গান সংগ্রহ করে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশও করেছিলেন। কবির নবীন বয়সে শোনা 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' গানটিও এঁরই রচনা, এবং এই গানটি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল সবচেয়ে বেশী। এর কথা তিনি বলেছেন 'An Indian Folk Religion' নামে এক প্রবন্ধে। আলোচ্য কালে শিলাইদহ অঞ্চলে সর্বাধিক প্রচলিত ছিল লালন ফকিরের গান। জনশ্রুতি আছে যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লালন ফকিরের সঙ্গে ধর্মালোচনা করে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। আবার জানা যায়, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীরাও বোটে বসে লালন ফকিরের কাছে তাঁর গান শুনেছেন, এই ধরনের তথ্য সূত্রের ওপর নির্ভর করেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন ফকিরের সাক্ষাৎকারের সরস কাহিনী গড়ে উঠেছে, শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

অন্যপক্ষে এখানে উল্লেখযোগ্য, লালন ফকির ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। অতএব তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে থাকলে তার আগেই হওয়ার কথা। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের অবস্থিতির কথা জানা গেলেও রবীন্দ্রনাথের কোন লেখায় এ প্রসঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এজন্যেই বোধ হয়

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীও তাঁর পরবর্তী একটি গ্রন্থে বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর পরিচয় ছিল কিনা তার বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীনেরা বলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর আলাপ হয়েছিল কিন্তু সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।'' তবে রবীন্দ্রনাথ এঁর রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত সংগ্রহ করেন ও কিছু কিছু গান মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশ করেন। তাঁর কাব্যরচনা ও রস সাধনায় লালন ফকিরের প্রভাব অনেক সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ এ সময় শিবু সা বা শিবনাথ সাহার কীর্তন গানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। ইনি মনোহর শাহী কীর্তনগানে ঐ অঞ্চল মাতিয়ে তুলেছিলেন; কবি প্রায়ই তাঁর গান শুনতেন এবং জানা যায় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রের অকালমৃত্যুর পর কবি তাঁকে সদলবলে কলকাতায় নিয়ে আসেন।

অন্যপক্ষে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা থেকে জানা যায় যে, গগনেন্দ্রনাথের পুত্র গেহেন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর শোকার্ত মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য দীনেশচন্দ্র সেন ক্ষেত্র কথককে নিয়ে আসেন এবং কথকতা শোনানো চলতে থাকে মাসের পর মাস। ক্ষেত্র কথকের কথকতা শুনতে শুনতে তাঁর মন অনেকটা শান্ত হয়ে এলে শিবু কীর্তনীয়াকে আনানো হয় কুষ্টিয়া থেকে। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথই এঁকে আনিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের লেখা 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থেও এ তথ্যের সাক্ষ্য মেলে।

আবার পুণ্যাবোষ্টমী নামে একজন সুকণ্ঠী বৈষ্ণবীর গানও তাঁকে আকর্ষণ করত গভীরভাবে। এই সব কীর্তনগান যে তাঁর মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই সময় অর্থাৎ জমিদারী পরিদর্শন কালে একদিন পাবনা রাজশাহীর পথে নৌকাযোগে ভ্রমণ করতে করতে তিনি একটি পল্লীসঙ্গীত শুনেছিলেন। গানটি হল —

''যোবতী, ক্যান বা কর মন ভারী
পাবনা থেকে আন্যে দেব
ট্যাকা দামের মোটরি।''

প্রথম শুনে গানটি তাঁর কাছে অদ্ভুত এবং কৌতুককর মনে হলেও স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে এর যে একটি গভীর ভাবাবেদন আছে সে কথা তিনি অনুভব করেছিলেন। অনেক পল্লীসঙ্গীতেরই যে অনুরূপ আপাত স্থূলতার অন্তরালে একটি চিরন্তন আবেদন থাকতে পারে এবং তাঁর সাহিত্যিক মূল্যকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না, সে কথাও তাঁর অনুভব গোচর হয়েছিল ঐ গানটি শুনেই।

এছাড়া আরও এ জাতীয় গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েছিলেন সরলাদেবীর সহায়তায়। সরলা দেবী রাস্তায় গান গেয়ে যাওয়া বাঙালী বা হিন্দুস্থানী ভিখারীদের ডেকে তাদের কাছ থেকে লোকপ্রচলিত অনেক গান শিখে নিতেন, তারপর রবীন্দ্রনাথকে শোনাতেন সে গান।

এবার রবীন্দ্রমননে যাত্রার সান্নিধ্য ও প্রভাবের প্রসঙ্গে আসা যাক। যাত্রা অভিনেয় সাহিত্য, এবং একে লোকনাট্য বলে অভিহিত করেছেন অনেক সমালোচক। দীর্ঘকাল ধরে যাত্রা রসপিপাসু বাঙালী চিত্তের তৃপ্তি সাধন করে এসেছে এবং রবীন্দ্রনাথের শৈশব কালেও

যাত্রাগানের রীতির মধ্যে তার মৌলিক লোকচরিত্র বহুল পরিমাণে বজায় ছিল। তখনও ইউরোপীয় থিয়েটার ও অপেরার প্রভাবে এর আধুনিকীকরণ সম্পূর্ণ হয়নি।

লোকনাট্য হলেও যাত্রার সঙ্গেও কবির প্রাথমিক পরিচয় ঘটেছিল ঠাকুরবাড়ীতেই। আধুনিক কালের মত সিনেমা থিয়েটার ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা তখনও পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে সেকালের অভিজাত জনেরাও যাত্রাগানের মধ্য দিয়ে আনন্দ উপভোগ করতেন। বিশেষত ধনী ঘরে ছিল শখের যাত্রার প্রচলন। তাঁর মেজকাকা গিরীন্দ্রনাথ (অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ) ছিলেন এই রকম একটা শখের যাত্রাদলের দলপতি; নিজেও তিনি যাত্রা লিখেছিলেন, এ ধরনের যাত্রা ছাড়াও ব্যবসাদারী যাত্রার প্রতিও তাঁর এবং সেকালের মানুষের আকর্ষণ ছিল প্রবল। সে জন্যে প্রায়ই তাঁদের বাড়ীতে যাত্রাভিনয় হত।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, এই সমস্ত যাত্রানুষ্ঠান যা তাঁদের বাড়ীতে হত তা ছিল মূলতঃ বড়দের জন্যই, ছোটরা তা উপভোগ করতে পারতেন না। কেবল দূর থেকে তার 'যোগাড় যন্তর' দেখতে পেতেন। আর শুনতে পেতেন নাচের তাল সমে এসে ঠেকতেই ঝমাঝম করতাল।

এমনি করে দেখি দূর থেকে একটুখানি দেখতে এবং শুনতে পাওয়া যাত্রার টুকরো উপাদান তাঁর কৌতূহলকে তীব্র করে তুলেছে, এবং সে জন্যেই বোধহয় যখনই যাত্রা দেখেছেন তখনই মুগ্ধ হয়েছেন এবং গভীরভাবে তাকে উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন।

একবার তিনি শৈশবেই 'নল-দময়ন্তী'র পালা দেখার অনুমতি পেয়েছিলেন, এমন কি রুমালে কিছু টাকা বেঁধে দাদাদের কাছে বসার সুযোগও পেয়েছিলেন। বাহবা দেবার ঠিক জায়গাটিতে ঐ টাকা ছুঁড়ে দেবার রীতি ছিল। তাতে গৃহস্থের সুনাম হত আর যাত্রাওয়ালার উপরি পাওনা। এ যাত্রা দেখে তাঁর যাত্রার আসর ও সঙ্গীত সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা তাঁর স্মৃতিতে দীর্ঘকাল জাগরূক ছিল।

রবীন্দ্রনাথ যদিও পৃথকভাবে যাত্রা সম্পর্কে কোন আলোচনা করেননি, তবুও একথা বলা যায় না যে তিনি যাত্রার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না বা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়নি তাঁর মন। তাঁর নাটকের মধ্যে যাত্রার প্রভাব অনেক সময়ই পরিলক্ষিত হয়। পরে যথাস্থানে এ সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ আছে। এখানে শুধু এটুকুই বলব যে, যাত্রার প্রতি কবিমনের আগ্রহ প্রথমাবধি আন্তরিক ছিল বলেই জমিদারী পরিদর্শনে গিয়েও আমলাদের গঠিত যাত্রাদলকে উৎসাহিত করেছেন, এবং সেইসব যাত্রাভিনয় দেখেছেনও।

এমনি করে দেখি শিশুকাল থেকেই ধীরে ধীরে নানাভাবে লোকসংস্কৃতি তার সহজ শিল্প সৌন্দর্য ও অনাড়ম্বর আয়াসহীন মর্মস্পর্শিতার বিচিত্র গুণে রবীন্দ্রমানসে স্থান করে নিয়েছে এবং তার প্রতি তাঁকে আগ্রহী ও উৎসাহী করে তুলেছে। আর তার ফলস্বরূপ তিনি পরবর্তীকালে লোকসংস্কৃতি তথা লোকসাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন নানাভাবে — পরবর্তী অধ্যায়ে সে প্রসঙ্গই আলোচিত হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

লোকসাহিত্যের পরিচয় ও মূল্যসন্ধানে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলা লোকসাহিত্যের সহজ সত্য ও অনাবিল সৌন্দর্যকে আহরণ করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা তাকে পরিশীলিত মনের উপভোগ্য করে না তুলতেন তবে হয়তো আজও লোকসাহিত্য আমাদের কাছে অপাংক্তেয়ই থেকে যেত, এবং বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তার মর্যাদাপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভবপর হত না।

আগেই বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ যখন এ কাজে ব্রতী হন তখন নগরকেন্দ্রিক ইংরেজী শিক্ষা গ্রাম এবং শহর বাংলার আন্তরিক বিচ্ছেদ একান্ত করে তুলেছিল; ইংরেজী শিক্ষা এবং শহুরে মনের উন্নাসিকতা বশে গ্রামের মানুষ; তাদের জীবন, সংস্কৃতি, সুখ-দুঃখ আমাদের কাছে একান্ত উপেক্ষনীয় হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে লোকসাহিত্য পূর্বনিরূপিত সংজ্ঞা অনুসারে এবং বিশেষভাবে রবীন্দ্রচিন্তানুসারে মূলতঃ গ্রাম্য সাহিত্য ও তা ভদ্রসমাজের প্রত্যন্তবর্তী মননদুর্বল অনভিজাত লোকসমাজের ফসল। সুতরাং লোকসাহিত্য যে তৎকালীন প্রতীচ্য শিক্ষায় প্রবুদ্ধ অভিজাত নাগরিক সমাজের নিকট অপাংক্তেয় হবে সে কথা সহজেই অনুমেয়।

তদুপরি জন্মসূত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক অভিজাত নাগরিক ঐতিহ্যের অধিকারী। সুতরাং সেকালের ভদ্রসমাজের অন্যান্য সকলের মত তাঁরও লোকসাহিত্য সম্পর্কে অবধানের অভাব ও ঔদাসীন্য থাকাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তার পরিবর্তে লোক সাহিত্যের প্রতি তাঁর কবিমনের গভীর আকর্যণ অনুসরণ করলে দেখা যায় আপাতদৃষ্টিতে একান্ত অসম্ভব বলে মনে হলেও ঠাকুরবাড়ীর আবেষ্টনীই তাঁকে লোকসাহিত্যানুরাগী করে তুলেছিল।

প্রথমতঃ দেখি, তাঁদের পরিবারের সুকর্ষিত, সুউন্নত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেও কবি লোকসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন নানাভাবে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। আর সেই সূত্রেই একথা বললে ভুল হবে না যে, এই প্রাথমিক পরিচয়ই তাঁর মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল লোকসাহিত্যের মূল রস আস্বাদনের এবং তার মর্ম উপলব্ধির জন্য।

দ্বিতীয়তঃ কবিচিত্তের পরিবার প্রভাবিত প্রবল স্বদেশানুরাগ ও স্বাজাত্যবোধ তাঁকে লোকসাহিত্য অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করেছিল যথেষ্ট পরিমাণে। যে সময়ে আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই প্রতীচ্য সংস্কৃতি ও ভাবধারাকে গ্রহণ করাই একান্ত কাম্য মনে করেছিলেন ঠিক সেই সময়ে স্বদেশ প্রেমের ঐতিহ্য তিনি পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—"......আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া

রাখিয়াছিল। বস্তুতঃ, সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন।" (জীবনস্মৃতি)

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ইউরোপীয় লোকসংস্কৃতির পুনরনুশীলনের ইতিহাস অনুসরণ করলেও দেখা যায়, স্বদেশ প্রীতি এবং জাতীয়তাবোধই ছিল তার প্রেরণার মূল উৎস। বস্তুতঃ স্বতন্ত্র জাতি ও জাতীয়তাবোধের নবজন্মকালেই মানুষের মন আত্মজন কীর্তিমুখী হয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ দেশপ্রেমের বশবর্তী হয়ে তিনি যখন আমাদের দেশ, দেশের ইতিহাস, ভাবধারা ও সংস্কৃতিকে যথার্থরূপে জানবার জন্য আগ্রহী হয়েছেন, তখনই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন যে লোকসমাজ ও সংস্কৃতিকে না জানলে নিজেদের দেশ এবং জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় লাভ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কেননা লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি আমাদের জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির অংশ মাত্র। অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই এ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ এবং উদাসীন। তাঁরা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেশকে এবং দেশের সংস্কৃতিকে দেখে থাকেন। তাই কবিকে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বলতে শুনি, "মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি, ছোটলোক; এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে।....ভদ্রসমাজ তাদের স্পষ্ট করে দেখতেই পায় না, বিশ্ব সমাজের তো কথাই নেই।" (রাশিয়ার চিঠি)

রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি কেবল দেশ বা দেশবাসী সম্পর্কে নয়। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। লোকসমাজ বা তথাকথিত এই 'ছোটলোক'দের মত তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকেও আমরা চিরদিনই দূরে সরিয়ে রেখেছি; রবীন্দ্রনাথের আগে একবারও আমাদের মনে হয়নি যে এগুলোও আমাদের জাতীয় সম্পদ এবং সযত্নে রক্ষা করবার যোগ্য।

কবি আরও লক্ষ্য করেছেন, ইংরেজী শিক্ষার মোহ আমাদের দেশবাসীর চিত্তকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে তখন আমাদের স্বাধীন চিন্তা, পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং বিচারক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পেয়ে গিয়েছিল। আর সেই কারণেই নিজের দেশ সম্পর্কে কিছু জানতে হলে আমাদের শরণাপন্ন হতে হত ইউরোপীয় পণ্ডিতের; ইউরোপীয় পুঁথিই আমাদের নিকট বেদবাক্য বলে প্রতিভাত হত। আমাদের তৎকালীন এই মানসিক পরিপ্রেক্ষিতটি রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন এইভাবে,—"আমাদের কলেজে যারা ইকনমিকস, এথনোলজি পড়ে তারা অপেক্ষা করে থাকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতের—পাশের গ্রামের লোকের আচার-বিচার বিধিব্যবস্থা জানবার জন্যে। ওরা ছোটলোক, আমাদের মনে মানুষের প্রতি যেটুকু দরদ আছে তাতে করে ওরা আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। পশ্চিম মহাদেশের নানাপ্রকার 'মুভমেণ্ট' এর ইতিহাস এঁরা পড়েছেন। আমাদের জনসাধারণের মধ্যেও নানা মুভমেণ্ট চলে আসছে, কিন্তু সে আমাদের শিক্ষিত সাধারণের অগোচরে। জানবার জন্যে কোন ঔৎসুক্য নেই, কেননা তাতে পরীক্ষা পাসের মার্ক মেলে না।" (তদেব) সুতরাং এই রকম অবস্থায় দেশের শিক্ষিত সাধারণের পক্ষে লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যকে তুচ্ছ ও

হেয়জ্ঞান করা এবং ইউরোপের সমস্ত কিছুর মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই মানসিক ও চরিত্রগত দুর্বলতাকে পূর্ণ উপলব্ধি করেই ভদ্রেতর সাহিত্য সংগ্রহ করে তার প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন; এবং এর সাহিত্যিক রসবিচার দ্বারা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, এই সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যা বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-ঐতিহ্যের সমান মর্যাদার দাবী রাখে, যা কোনক্রমেই আমাদের অবজ্ঞার বিষয় নয়।

১২৯০ বঙ্গাব্দে 'বাউল গানে'র সমালোচনার মধ্য দিয়েই তাঁর লোকসাহিত্যেরস মূল্যায়নের প্রথম সূচনা। প্রকৃত পক্ষে এই সময় 'সঙ্গীত সংগ্রহ' নামে বাউল গানের একটি সংকলন তাঁর হাতে আসে এবং তিনি 'ভারতী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন এ সম্পর্কে 'বাউলের গান' অভিধায়।

এই প্রবন্ধে কবি আলোচ্য বাউলগীতি গুচ্ছকেই প্রকৃত বাংলা সাহিত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন যে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য তখন শিথিল হচ্ছিল হয় ইংরেজীর অনুকরণে নয় সংস্কৃতের অনুসরণে। সেজন্যে তার মধ্যে বাঙালী হৃদয়ের যথার্থ ভাব ও ভাষার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় না। অথচ 'সঙ্গীত সংগ্রহে'র এই গানগুলোর মধ্যে বাঙালীর প্রাণের মূল সুরটি ধ্বনিত হয়েছে অতি সহজেই; এর মধ্যে সমগ্র বাঙালী হৃদয়ের ভাব ও ভাষা যেন আপনাকে প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। এর কারণ তিনি স্পষ্ট করে না বললেও যা বলতে চেয়েছেন, তার সারার্থ হল এই যে, লোকসাহিত্য সেই সাধারণ লোকেই সৃষ্টি করে থাকে, যাদের ভাবধারার সঙ্গে সেই দেশের নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন হয়নি, যার ভাষা ইংরেজীর অনুকরণে বিকৃত হয়নি।

এর পরে তিনি যে কথা বলেছেন তা অত্যন্ত মূল্যবান। বস্তুতঃ এর আগে বাউল গানের ভাব সম্পদ নিয়ে এমন করে কেউ চিন্তাও করেননি বা কোন আলোচনাও করেননি। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল এই, আমাদের দেশের অতি সাধারণ মানুষের অতি তুচ্ছ কথার মধ্যে এমন সব বাণী শোনা যায় যার আবেদন যে কোন দেশের শিক্ষিত sophisticated দেরও মুগ্ধ করতে পারে অনায়াসে। অথচ আমরা তার কোন খবর তো রাখিই না, পরন্তু বিদেশী সাহিত্যে অনুরূপ ভাবের প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হই। এর অন্যতম উদাহরণ, আধুনিক ইংরেজী কবিতায় 'মনের মানুষ' এর জন্য প্রাণের ব্যাকুলতার প্রকাশ দেখে আমাদের দেশের অনেকেই সেই আদর্শে উচ্চভাবের কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছেন। আর একটি দৃষ্টান্ত, আমরা universal love কথাটা বিদেশীদের মুখ থেকে শুনে বিস্মিত হয়ে ভাবি এমন কথা তো আগে কোনওদিন শুনিনি। অথচ উভয় প্রসঙ্গেরই যে প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় আমাদের দেশের বাউলের মুখে, ভিখারীর গানে, তার কোন খবরই আমরা রাখিনা। বলাই বাহুল্য, এই ভাব অবলম্বনে গান রচনার জন্য ভিখারী গায়কেরা পরের অর্থাৎ বিদেশী সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়নি কখনও। এর নিদর্শন স্বরূপ কবি 'সঙ্গীত সংগ্রহ' থেকে অনুরূপ দুটি ভাবেরই উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন ও এ সম্বন্ধে বলেছেন, এই সব গানের "বাংলা কেমন সহজ, ভাব কেমন সরল, ইহাকে দেখিলেই এমনি আত্মীয়

বলিয়া মনে হয় যে, কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ইহাকে প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিই।"

'মনের মানুষ' এর ভাবনায় ভরা বাউল গান তিনি পরে আরও শুনেছেন এবং তাদের উচ্চতর সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন অনেক জায়গায়। তবে বাইশ বছরের তরুণ কবিকৃত প্রথম লোকসাহিত্য সমালোচনা প্রবন্ধ 'বাউলের গান'এ এই সঙ্গীতের ভাব-বিশ্লেষণ হয়তো ততটা গভীর হয়নি, কিন্তু এখানে তিনি এই সঙ্গীতের ঐশ্বর্যকে স্বীকৃতি দিয়ে দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছেন তা বর্তমান প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে এ সব কবিতা এত উচ্চভাব সম্পন্ন যে, যে কোন বিদেশী সাহিত্যের সমান রসমূল্যের দাবী রাখে।

এ বিষয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম এই প্রবন্ধ মাধ্যমেই শিক্ষিত বাঙালীকে দেশীয় গান-কবিতা সংগ্রহের কর্তব্যে আহ্বান জানান।—

"সঙ্গীত সংগ্রহের অপরাপর খণ্ডের জন্য উৎসুক রহিলাম। গ্রাম্য গাথা ও প্রচলিত গীতসমূহ (যে বিষয়ের ও যে সম্প্রদায়েরই হউক না কেন) সকলে মিলিয়া যদি সংগ্রহ করেন, তবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিস্তর উপকার হয়। আমরা আমাদের দেশের লোকদের ভাল করিয়া চিনিতে পারি, তাহাদের সুখ-দুঃখ আশা ভরসা আমাদের নিকট নিতান্ত অপরিচিত থাকে না। ভিক্ষুকেরা, মাঝিরা যে সকল গান গাহে, তাহা লিখিয়া লইতে অধিক পরিশ্রম নাই। আমরা এইরূপ দুই একটি গান লিখিয়া লইয়াছিলাম, তাহাই প্রকাশ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করি। এইখানে বলিয়া রাখিতেছি, পাঠকেরা যদি কেহ নিজ নিজ সাধ্যানুসারে প্রচলিত গ্রাম্যগীত সকল সংগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করেন তবে তাহা ভারতীতে সাদরে প্রকাশিত হইবে।"

কেবল কর্তব্য নির্দেশ বা উপদেশ দান করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, প্রবন্ধ শেষে নিজের সংগৃহীত তিনটি লোকসঙ্গীতও উদ্ধৃত করে দিয়েছিলেন।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাউল সম্পর্কে এই প্রথম প্রবন্ধ রচনার পরেই লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ও অনুসন্ধানের এবং পুনরনুশীলনের উৎসাহ কবিমনে আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। সাজাদপুর থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে লিখিত একটি পত্রের মধ্যে তাঁর লোকসাহিত্যানুশীলনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। পত্রটির রচনাকাল ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ২১ শে ভাদ্র, ১৩০১ বঙ্গাব্দ। এর মধ্যে তিনি লিখেছেন যে, তিনি ছড়া সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত আছেন, এবং এর রসে তিনি সম্পূর্ণ নিমগ্ন।

এরই কিছুদিন পরে (১৬ই আশ্বিন, ১৩০১ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ ১লা অক্টোবর, ১৮৯৪ খৃ:) কবি চৈতন্য লাইব্রেরীতে 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। মনে হয়, পূর্বোক্ত এই ছড়া সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটিরই উল্লেখ ছিল। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, এখানেই সর্বপ্রথম প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্যছড়াকে বক্তৃতার বিষয় গৌরব দান করলেন, এতদিন পর্যন্ত বিদগ্ধ সমাজে যা ছিল নিতান্তই অপাংক্তেয়। এই ঘটনায় অনেকেই যে সেদিন বিস্মিত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভাষণটি সম্পর্কে কবির নিজস্ব মতামত কি ছিল তাও জানা যায় কদিন পরে লেখা (১৭ই অক্টোবর, ১৯৯৪) তাঁরই

একটি চিঠি থেকে।

"কাল ব..........র সঙ্গে 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধ নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন, অমন একটা তুচ্ছ উদ্দেশ্যবিহীন বিষয় নিয়ে আমি কেন সাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতে গেলুম তিনি বুঝতে পারেননি। আমি বললুম, কালিদাস শকুন্তলা কেন লিখেছিলেন এবং সেটা আজ পর্যন্ত কেন টিকে আছে? আমাদের চারদিকে যে সমস্ত ছোটো বড়ো জিনিস আছে এবং প্রতি মুহূর্তে এসে পড়ছে তাদের কত রকম ভাবে দেখা যেতে পারে, তাদের ভিতর থেকে কত রকম সুখ আবিষ্কার করা যেতে পারে—এইটেই হচ্ছে সব প্রধান চর্চার বিষয়। যে শিক্ষা মানুষের মনকে সচেতন করে দেয়, বিশ্বসংসারকে নানাভাবে অনুভব করবার শক্তি সঞ্চার করে, সেইটেই হচ্ছে মানুষের পক্ষে খুব একটা মূল্যবান শিক্ষা। সাহিত্যে আর কোনো প্রত্যক্ষ ফল নেই, কিন্তু সে মানুষের প্রকৃতিকে সব দিকে সচেতন করে তোলে—তার অর্থ, সে মানুষের প্রকৃতিকে বৃহৎ করে দেয়, পূর্বে যেখানে তার কোনো অধিকার ছিল না সেখানেও তার অধিকার বিস্তার হতে থাকে। প্রাপ্ত ফলের অপেক্ষা পাবার শক্তিটা ঢের বড়ো—সেইজন্য সাহিত্যে অবলম্ব বিষয়ের দিকে ততটা বেশি মনোযোগ দেয় না যেমন তার রচনার দিকে, কল্পনার দিকে, প্রকাশের দিকে। কিন্তু এ সমস্ত কথা ব.......ঠিক বুঝতে পারলেন কিনা ঠিক বলতে পারিনে।" (ছিন্নপত্রাবলী)

চৈতন্য লাইব্রেরীতে পঠিত ভাষণটিই সাধনা পত্রিকায় 'মেয়েলি ছড়া' নামে প্রকাশিত হয় ও পরে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামে তা মুদ্রিত হয়।

সাধারণ 'মেয়েলি ছড়ার' মধ্যে যে এত সৌন্দর্য থাকতে পারে তা রবীন্দ্রনাথই দেখালেন এই প্রবন্ধের মধ্যে। এই মেয়েলি ছড়াগুলো বহুল প্রচলিত এবং বহুযুগের ধারা অতিক্রম করে মেয়েদের মুখে মুখে একালে এসে পৌঁছেছে। অথচ এতদিন পর্যন্ত এ সমস্ত ছড়া শুনেও এর অন্তর্নিহিত সহজ সৌন্দর্য ও কাব্য রস-মূল্য সম্পর্কে কারও মনে কোনও প্রশ্ন জাগেনি। রবীন্দ্রভাবনায় ভাবিত হয়েই আমরা প্রথম ছড়াকে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পেলাম এবং তার যথার্থ মূল্য সম্পর্কে সচেতন হলাম। এখানেই লোকসাহিত্য রসিক রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় মহিমা।

এই প্রবন্ধে তিনি এই ছড়াগুলোকে শিশুসাহিত্য বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এরা মানবসমাজে আপনি জন্মেছে। কবিকণ্ঠে একথার বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমাদের মন সর্বদাই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভাবনার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, শরৎ আকাশের হাল্কা মেঘের মত সেই সব ভাব বিচিত্র রূপ ধারণ করে সর্বদাই; ফলে আমাদের অন্যমনস্ক মন প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন সচেতন ভাবে কোন একটা বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে চিন্তা করি তখন এ সমস্ত ছায়াময়ী মরীচিকা মুহূর্তের মধ্যে অপসারিত হয়; আমাদের কল্পনা আমাদের বুদ্ধি একটা বিশেষ ঐক্য অবলম্বন করে একাগ্রভাবে প্রবাহিত হয়। জাগ্রত মনের পরিশীলিত জীবনচেতনাই পরিণত সাহিত্যের প্রেরণা রচনা করে। আর আপনভোলা আবছা রহস্যে ঘেরা জীবনসৌন্দর্য অশিক্ষিত-পটু শিশু-শিল্পের উপজীব্য। শিশুর মন শিক্ষার ভার-মুক্ত, পরিণাম-বুদ্ধিহীন। যুক্তি চিন্তা তাদের অন্তরে ক্ষীণ; সুসংলগ্ন কার্য-কারণ সূত্র ধরে কোন জিনিষকে প্রথম থেকে শেষ

পর্যন্ত অনুসরণ করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। তাই আদিম মানবের, মানব সভ্যতার বাল্য-মনস্কতার অক্ষয় সৌন্দর্য মূর্তি বলেই, অসংবদ্ধ ছড়ার ছবি রবীন্দ্রনাথের এত ভাল লাগে। সেইজন্য বোধহয় 'ছেলেবেলাকার স্মৃতি' থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়।

এই সব ছড়ার ভাষা অত্যন্ত সহজ, ভাবও অতি সাধারণ। তার ওপরে আবার ভাবগুলো সব অসংলগ্ন, কার্যকারণ সূত্র ছাড়াই একের পর এক এসে উপস্থিত হয় এর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাই ছড়াকে স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে, স্বপ্নেও যেমন অনেক এমন ঘটনা ঘটে যায় যার একের সঙ্গে অপরের কোন্ মিল নেই, সবই অদ্ভুত, এখানেও তাই। তিনি আরও বলেছেন, ছড়ার শিল্পে চিত্র সৃষ্টিই প্রধান কথা, অর্থের ভাবের সুগভীর তাৎপর্য বহন এর উদ্দেশ্য নয়।

ছড়ার এই বৈশিষ্ট্যের কথা বহুদিন পরেও এ সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনায় স্থান দিয়েছেন ও এর চরম মূল্য নির্ধারণ করেছেন; এ প্রসঙ্গ পরে আসবে।

কিন্তু 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে তিনি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন ছড়ার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্যের ওপরে। ছড়ায় ছোট ছোট টুকরো টুকরো কথার মধ্যে অনেক প্রাচীন ঘটনার, জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের, সমাজের অনেক রীতি-নীতির পরিচয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে অভিব্যক্ত অনেক আনন্দ বেদনা আজও আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করে গভীর ভাবে। আর এখানেই এর চিরন্তন আবেদন যা সাহিত্যকে সর্বকালীন হয়ে উঠতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে তিনি এর মধ্যে ছড়ার অনেক উদাহরণও দিয়েছেন।

এই সময় ছড়ার রসভাবনা কবির চিত্তকে দোলা দিয়েছে নিরন্তর, উপরোক্ত প্রবন্ধ ছাড়াও চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে তাঁর আন্তরিকতার স্পষ্ট প্রকাশ। এই সূত্রে ছিন্নপত্রাবলীর ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত ১৫১ সংখ্যক পত্র এবং ৫ই অক্টোবর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত ১৫৯ সংখ্যক পত্র বিশেষভাবে স্মরণীয়।

তথ্যের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যায়, আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনার আগে থেকেই কবি ছড়া সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন, একথা তিনি নিবন্ধটির সূচনাতেই জানিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য ঠিক কবে থেকে যে তিনি একাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তা এর থেকে জানা যায় না।

সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় (মাঘ, ১৩০১, ও কার্তিক, ১৩০২) তাঁর সংগৃহীত ছড়া সমূহ আলোচনা সহ প্রথমে প্রকাশিত হয়। পরে এ সবই ছেলেভুলানো ছড়া শিরোনামে লোকসাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত অনেকগুলো ছড়া লোকসাহিত্য গ্রন্থের সংগ্রহ থেকে পরিবর্জিত হয়েছে। মনে হয়, এগুলো উক্ত গ্রন্থের পূর্ব প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে বলেই সম্ভবতঃ ছড়া সঙ্কলনে আর তার পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এই ছড়াগুলো হল (১) নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন বেঁধেছে,(২) ডালিম গাছে পরভু নাচে, (৩) তাল গাছ কাটম বোসের বাটম গৌরী এল ঝি, (৪) চাঁদ কোথা পাব বাছা জাদুমণি।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে, অবনীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতেও ছড়া সংগ্রহের জন্য কবির আন্তরিক প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। সাজাদপুর থেকে লেখা তারিখহীন এই চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

"অবন,

আজ তোমার কাছ থেকে আরো কতকগুলি ছড়া পাওয়া গেল। বেশ লাগচে। এখানে আমাদের সাজাদপুরের খাজাঞ্চির কাছ থেকে গোটা আষ্টেক ছড়া যোগাড় করেছি এবং যাকে পাচ্ছি তাকেই অনুরোধ করচি। তোমাদের বুড়ি দাসীটি কলকাতায় ফিরলে ভুলো না।

রবিকাকা"

(রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত অবনীন্দ্রনাথকে লিখিত রবীন্দ্র পত্রাবলীর পাণ্ডুলিপি)

অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেকে সে সময় লোকসাহিত্য সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন সাগ্রহেই; তারও প্রমাণ পাওয়া যায় সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের সাহিত্য-পরিষদ ও সাধনা পত্রিকাতে।

এইসব সংগ্রাহকদের অনেকেই নিজের নিজের মত করে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছড়া সংগ্রহ করেছেন, আবার কোন কোন সংগ্রাহক রবীন্দ্র সংগৃহীত ছড়ার পরিপূরক হিসেবে কয়েকটি ছড়া প্রকাশিত করেছেন। যেমন, সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকার ১৩০১ মাঘ সংখ্যায় সম্পাদক রজনীকান্ত গুপ্ত রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত তিনটি ছড়ার এক একটি পাঠান্তর পাদটীকায় দেন। তাছাড়া এ পত্রিকার ১৩০২ কার্তিক সংখ্যায় বাঁকুড়া বেলেতেড়, বন বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, সাঁওতালপরগণা থেকে সংগৃহীত কতকগুলো ছড়া রবীন্দ্র-সংগ্রহের পরিপূরক হিসেবে মুদ্রিত হয়। সংগ্রাহকদের মতে এগুলো মূলতঃ পাঠান্তর।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ নিজে সাঁওতালি ছড়া সংগ্রহ করেও অনুবাদ করেছিলেন। বহুদিন পরে কিশোরী মোহন সাঁতরাকে লেখা একটি চিঠিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। —"......মাঝে মাঝে লেখার প্রয়োজনে সাঁওতালি ছড়ার খোঁজ করেছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম সাহিত্য-পরিষদে তাদের কবর হয়েছে। ওগুলো পাঠিও। মূলগুলি সাঁওতালি, কিন্তু বাংলাটা আমার।"

কিন্তু এই ছড়াগুলো রবীন্দ্রনাথ কবে কিভাবে ও কোন পরিবেশে সংগ্রহ ও অনুবাদ করেছিলেন তা আজ আর জানা যায় না, এবং কবিকৃত অনুবাদগুলোও আমাদের নিকট এখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে।

তবে ছড়া সংগ্রহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবি যা বলেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।- **"শুদ্ধ মাত্র এই রসের (কবি কথায় 'বাল্য রস') দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। রুচিভেদ বশত সে রস সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধকরি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে; এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহ-সংগীত সুর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে**

আমাদের পিতৃ পিতামহগণের শৈশব নৃত্যের নূপুর নিক্কণ ঝঙ্কৃত হইতেছে। অথচ আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশ বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটোবড়ো অনেক জিনিস অলক্ষিত ভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।''

নিতান্ত প্রাসঙ্গিক ভঙ্গীতে লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ঐতিহাসিক মূল্যটিও কত অনায়াসে নির্দেশ করে গেলেন কবি। লোকসমাজ নিয়ত বিবর্তনশীল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লোকসমাজের বিলোপ সাধিত হচ্ছে এবং হবে। আর সেটাই একান্ত কাম্য। সমাজের সর্বস্তরে অনগ্রসরতার অন্ধকার দূর করাই কল্যাণ-ব্রতী রাষ্ট্র ও সমাজের মৌলিক দায়িত্ব। কিন্তু সেই সঙ্গে আদিমতার উৎস জাত শিল্প কলাটি যেন লুপ্ত না হয়, পঙ্ক মুক্ত করতে গিয়ে পঙ্কজকে হারিয়ে যেন দরিদ্র না হয় আমাদের বিকাশমান সভ্যতা। জ্ঞানবুদ্ধির প্রসারের সঙ্গে লোকসমাজের অভ্যুদয় ঘটবেই; কিন্তু তার যেটুকু সোনার ফসল তা যেন আমাদের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে সম্পূর্ণ সঞ্চিত হয়ে থাকে।

কিন্তু কবির একার পক্ষে এই সমস্ত দেশীয় সম্পত্তি রক্ষা করা সহজসাধ্য ছিল না। এজন্য তিনি দেশের প্রত্যেককে লোক সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পরিচয় পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হতে উৎসাহিত করেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদকেও যে কবি লোকসাহিত্য সংগ্রহ ব্যাপারে কতটা উৎসাহিত করে তুলেছিলেন তার অন্যতম নিদর্শন, পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত ছড়া সংকলনের পাদটীকা। এখানে পত্রিকা সম্পাদকও পাঠকদের নিকট আবেদন জানিয়ে বলেছেন, ''উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশের পুরস্ত্রীগণ আম ষষ্ঠী, মূল ষষ্ঠী প্রভৃতি ব্রতের কথা বলিয়া থাকেন। এগুলি শাস্ত্রের কথা নামে পরিচিত আছে। এখন ব্রতাদির বিলোপ দশা ঘটিতেছে। সহৃদয় পাঠকবর্গ কথাগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে ভাল হয়।''

পরবৎসরেই 'সাধনা' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২) শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত 'গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবি সঙ্গীত সংগ্রহ' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'কবি সংগীত' প্রবন্ধটি। পরে সমগ্র আলোচনাটি লোকসাহিত্য গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

কবি সঙ্গীত প্রসঙ্গে পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই গীতিসাহিত্যকে সঙ্গত কারণেই লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করেননি। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ার দরুন এটিও আমাদের আলোচনার অঙ্গীভূত হয়েছে।

লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মত কবি সঙ্গীত গ্রাম্য-সাহিত্য নয়। এর উদ্ভব যেখানেই হোক না কেন শহুরে পরিবেশেই এর মুখ্য অভ্যুদয় ও পরিণতি।

রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির আলোচনা কালে বলেছেন যে, বাংলার প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। কিন্তু এর পরমায়ু অতি অল্প, হঠাৎ কিছুদিনের জন্য আবির্ভূত হয়েই এরা হঠাৎই বিলীয়মান হয়ে গেছে, এর কারণ এইসব

গানের কবিগণ অর্থাৎ কবিওয়ালারা তাঁদের রচনায় চিরন্তন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেননি, যার দ্বারা এরা অমরত্ব লাভ করতে পারত।

কবিগান সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এই প্রথম রাজসভার পরিবর্তে সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য এ সাহিত্য রচিত হয়েছিল। বর্তমানে সাহিত্য মাত্রই যে সাধারণের জন্য রচিত হয়ে থাকে তার প্রথম পদক্ষেপ এইখানে। এজন্য বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে কবিগানের কিছুটা মূল্য রয়েছে।

কিন্তু সাহিত্য হিসেবে এই সব রচনা উৎকৃষ্ট রস-মূল্য দাবী করতে পারে না। প্রধানতঃ বৈষ্ণব পদাবলী বা শাক্ত পদাবলী থেকে কবিগানের উপজীব্য বিষয় গৃহীত হলেও ঐ সব কাব্যের ভাবের গাম্ভীর্য, প্রকাশ নৈপুণ্য এর মধ্যে নেই। কারণ তা ছিল রচয়িতা ও সমসাময়িক শ্রোতা উভয়েরই শিক্ষা কিংবা রুচির আয়ত্তের অতীত। এমনকি এসবের মধ্যে সাহিত্য রসও নেই বললেই চলে। এর মূল কারণ শ্রোতাদের ক্ষণিক অবসরকে উত্তেজনায় মাতিয়ে রাখাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য এবং এই শ্রোতাদের অনেকেরই সূক্ষ্ম শিল্প রুচিবোধের অভাব ছিল। তদুপরি এই গানগুলো মূলতঃ সুর সংযুক্ত বাগ্‌যুদ্ধের আকারে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল,—শেষের দিকে আসরে দাঁড়িয়ে গান বাঁধা হত উপস্থিত বুদ্ধির সহযোগে। সুতরাং ভাবের গভীরতা, রসের মাধুর্য, সূক্ষ্ম কলা-নৈপুণ্য এর মধ্যে আশা করা যায় না। কবিওয়ালারা অনুপ্রাসের ছটা ও কথার কৌশল দিয়ে আসর মাতিয়ে রাখতেন। তাঁদের গানে সাহিত্য রস সৃষ্টি অপেক্ষা উত্তেজনার উদ্রেক করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য।

কবিগানের পরিণামী রস অবক্ষয় যুগের শহর জীবনের ফসল হলেও রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের আলোচনার পংক্তিতে কেন এদের স্থান দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতেই পারে। তার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে অনুমান করা যেতে পারে যে বৈষ্ণব ও শাক্ত পদের ভাব ও ছন্দ ভেঙে অশিক্ষিত পটু সহ-জ কবি কবিওয়ালাদের স্থূল রুচি, স্থূল মূর্তি এই শিল্পকর্ম লোকসাহিত্যেরই স্বভাব-যুক্ত। তাই এ জাতীয় গানের সাহিত্যিক মূল্য কিছু না থাকলেও সাহিত্যজগতে এদের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গেই কবি জোর দিয়েছেন বেশী।

'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটি রচনার পরের বছরই কার্শিয়াং বাসকালে তিনি অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মেয়েলি ব্রত' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভূমিকা লিখে পাঠান। কবি স্বয়ং যখন 'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদন কালে 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রভৃতি সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন তখন অঘোরনাথ তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন বলে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন।

লোকসাহিত্য সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি আগেও যা বলেছিলেন, এই ভূমিকায়ও সেই কথাই বললেন। আপাতদৃষ্টিতে এইসব ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলে মনে হলেও এদের মূল্য অপরিসীম। ইউরোপে এ সমস্ত বিষয় সংগ্রহের জন্য উদ্যম দেখা যায়। অথচ আমাদের দেশের লোকেরা এ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, যে সমস্ত কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পেয়ে এসেছে তারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হয়ে যায় না। উপরন্তু

যারা অন্তরের সঙ্গে স্বদেশকে ভালোবাসে, তারা স্বদেশের সঙ্গে অন্তরঙ্গ রূপে পরিচিত হতে চায় এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা ব্যতীত সেই পরিচয় কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

যে ব্রতকথাগুলো অঘোরনাথের দ্বারা সংগৃহীত হতে পেরেছে তার দ্বারা যে ভবিষ্যতে কোন না কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে সে ধারণা ছিল কবির আন্তরিক।

এই প্রসঙ্গে ভূমিকা শেষে কবি 'বাবু শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র কুমার রায়ের' নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কারণ ইনি বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন পার্বণ সংগ্রহ করে 'সাধনা'য় প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে এই পার্বণগুলোও বাংলা সাহিত্যে স্থায়ীভাবে রক্ষা করার যোগ্য এবং সেই কারণেই সব শেষে কবি তাঁকে অনুরোধ করেছেন এগুলোকে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করার জন্য।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়েলি ব্রতর ভূমিকালোচনার পরে লোকসাহিত্য প্রসঙ্গে প্রধানতঃ গ্রাম্যসাহিত্যের প্রতি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভারতী পত্রিকায় (১৩০৫, ফাল্গুন-চৈত্র) আবার একটি প্রবন্ধ লেখেন; এবারকার আলোচ্য উপাদান ছিল কবির সংগৃহীত ছড়া—প্রবন্ধের নাম 'গ্রাম্য সাহিত্য'।

কবির বক্তব্য, এই গ্রাম্য সাহিত্য ধারার মধ্যে কল্পনার বিস্তার বা কাব্যকলার উচ্চ আদর্শ না থাকলেও তা আমাদের গ্রামের মানুষের হৃদয়ের সুখ-দুঃখের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। গ্রামবাসীরা যে জীবন ভোগ করে আসছেন প্রতিদিন, এইসব গ্রাম্য কবিরা সেই জীবনকে ছন্দের তালে বাজিয়ে তোলেন, সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করেন। সেইজন্য, বাংলার জনপদের মধ্যে ছড়া, গান, কথা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোলা দিচ্ছে তাকে কাব্য হিসাবে গ্রহণ করতে গেলে তার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম, সমস্ত লোকালয়কে জড়িয়ে পাঠ করতে হয়। তারাই এর ভাষা, ছন্দ, এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করে তোলে। গ্রাম্য সাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির , গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে। সে কারণেই বাঙালীর কাছে এর একটা বিশেষ রসমূল্য আছে।

কাব্যগুণের প্রতি কবির স্বভাবগত অতি আকর্ষণের বশেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু লোকসাহিত্যের সামাজিক বা নৃতাত্ত্বিক মূল্যকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেননি। বস্তুতঃ গ্রাম্যসাহিত্যের রসমূল্যও যে গ্রামীণ সামাজিক জীবনবোধের ফসল এবং সেই সূত্রে সেই সাহিত্যও যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ এ সম্পর্কে কবি সচেতন।

গ্রাম্যসাহিত্যের গঠন রীতি এবং রসমূল্যায়নেও তাঁর দৃষ্টি যথাযথ এবং যথাপরিমিত; অথচ কত গভীর পরিমাণে তা অন্তর্ভেদী।—

'ইহাদের মধ্যে কাব্যকলার আদর্শ খুব উচ্চ হইতেই পারে না। কারণ সাহিত্য রস গ্রহণে যে অবকাশ, চর্চা ও অনুশীলন আবশ্যক তাহা এখানে স্থানকালোচিত নহে। আবৃত্তিকারী মুখে মুখে বলিয়া চলে এবং শ্রোতাগণ তখনি তখনি তাহা শুনিয়া যায়। ছন্দ-মিল-ভাষা-কলা-কৌশল পরখ করিবার যথেষ্ট সময় ও সামর্থ্য নাই। যে কথাটা চট করিয়া সমবেত সকলের মনে প্রবেশ করিতে পারে তাহার বেশি পেলে জিনিসটা ভাল

হৌক আর মন্দ হৌক তাহার মূল্য থাকে না। তাহা ছাড়া, যে লোকটা আবৃত্তি করে তাহার সুরভঙ্গী অঙ্গভঙ্গী, তাহার হাসি ও চোখমুখের ভাবে কাব্য সজীব হইয়া উঠে। অতএব শ্রোতা এবং বক্তা, স্থান এবং কাল সবশুদ্ধ জড়াইয়া না দেখিলে গ্রাম্য কবিতার সম্পূর্ণতা গ্রহণ করা যায় না।"

গ্রাম্য সাহিত্য পরিবেশনের শৈলী সম্পর্কে কবির অবধানের স্পষ্ট পরিচয় এখানে বিদ্যমান।

'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে কবি মূলতঃ দুজাতীয় ছড়ার আলোচনা করেছেন উদাহরণ সহযোগে। সে ছড়াগুলো হল হর গৌরীর গান এবং রাধা কৃষ্ণের গান, বাংলাতে এ দুধরনের গানই সর্বাধিক জনপ্রিয়। এই গানগুলোর মধ্যে বাঙালী যেন কথা বলে উঠেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এর মধ্যে হরগৌরীর গানে রয়েছে সামাজিক দাম্পত্য বন্ধন, আর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানে সমাজ বন্ধনের অতীত প্রেমই প্রাধান্য পেয়েছে।

সাহিত্যে বাস্তবতার একটি বিশেষ স্থান আছে। হরগৌরীর গানগুলোর মধ্যে এই বাস্তবতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাই এগুলোকে বাঙালী আপন হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পেরেছে এবং এ কারণেই এর সাহিত্যিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায়না কিছুতেই। রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলেছেন আশ্চর্য সুন্দর ভাষায়, "........হরগৌরী সম্বন্ধীয় গ্রাম্য ছড়াগুলি বাস্তব ভাবের। তাহা রচয়িতা ও শ্রোতৃবর্গের একান্ত নিজের কথা। সেই সকল কাব্যে জামাতার নিন্দা, স্ত্রীপুরুষের কলহ ও গৃহস্থালীর বর্ণনা যাহা আছে তাহাতে রাজভাব বা দেবভাব কিছুই নাই; তাহাতে বাংলাদেশের গ্রাম্য কুটিরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছড়াইয়া উঠিতে পারে নাই।" (গ্রাম্য সাহিত্য)

কিন্তু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ছড়াগুলি স্বতন্ত্র জাতীয়, সেখানে বাস্তবিকতার কোঠা পার হয়ে মানসিকতার ভাবলোকে উত্তীর্ণ হতে হয়। প্রাত্যহিক ঘটনা, সাংসারিক ব্যাপার, সামাজিক রহস্য সেখানে স্থান পায় না। বৃন্দাবনের সেই অপরূপ রাখালের রাজ্য বাঙালী ছড়া রচয়িতা ও শ্রোতাদের মানস রাজ্য।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ছড়াসাহিত্যের জনপ্রিয়তার কারণ সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছেন তা অভূতপূর্ব এবং শাশ্বত সাহিত্য মূল্যায়নেরও বুঝি চাবিকাঠি। এই প্রসঙ্গে কবি-বাণীর একটি মাত্র অংশ উদ্ধার করছি,—

"হরগৌরীর গান যেমন সমাজের গান, রাধাকৃষ্ণের গান তেমনি সৌন্দর্যের গান। ইহার মধ্যে যে অধ্যাত্ম তত্ত্ব আছে তাহা আমরা ছাড়িয়া দিতেছি। কারণ তত্ত্ব যখন রূপকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে তখন তো সে আপন তত্ত্বরূপ গোপন করে। বাহ্যরূপেই সে সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণের রূপকের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা বাংলার বৈষ্ণব অবৈষ্ণব, তত্ত্বজ্ঞানী ও মূঢ় সকলেরই পক্ষে উপাদেয়, এই জন্যেই তাহা ছড়ায় গানে যাত্রায় কথকতায় পরিব্যাপ্ত হইতে পারিয়াছে।" (তদেব)

তাহলেও অতি-মোহ কবির মূল্য চেতনাকে আবিষ্ট করতে পারেনি একেবারেই। প্রবন্ধ শেষে তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে এইসব গ্রাম্য ছড়া আমাদের গ্রাম্য সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও এর মধ্যে অনেক দৈন্য অনেক সঙ্কীর্ণতা রয়ে গেছে স্বাভাবিক কারণেই। এদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ, নায়ক নায়িকার সম্বন্ধ নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিকই; কিন্তু তার প্রসার সঙ্কীর্ণ, তাতে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের রাধাকৃষ্ণের কথায় হৃদয়বৃত্তির চর্চা হয়েছে, কিন্তু তাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয়নি। তাতে বীরত্ব, মহত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও ত্যাগ স্বীকারের আদর্শ নেই।

তারপরে দেখা যায়, ১৩০৫ বঙ্গাব্দের পর বেশ কয়েক বছর রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের বিশেষ কোন বিষয় অবলম্বন করে আর কোন স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেননি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে লোকসাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ তখন কমে গিয়েছিল। তাঁর এসময়ের অনেক রচনাতেই দেখি সূত্রান্তর উপলক্ষ্য করে লোকসাহিত্যের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। আর লোকসাহিত্য সম্পর্কিত সে সমস্ত উক্তি প্রত্যুক্তি সংক্ষিপ্ত হলেও কবির সুগভীর ভাবনার পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন, আমাদের দেশের চিন্তানুশীলনের অন্যতম উপাদান লোকসাহিত্য। শুধু তাই নয়, তা আমাদের দেশের লোকশিক্ষারও বাহন। এই সমস্ত সাহিত্য লোক মনোরঞ্জনের ফাঁকে ফাঁকে প্রাকৃত সাধারণকে জ্ঞান-শিক্ষা, ধর্ম-শিক্ষা প্রভৃতি দিয়ে থাকে। ফলে আমাদের দেশে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রটি কেবল বিদগ্ধ সমাজের গণ্ডীতেই আবদ্ধ হয়ে নেই, তার প্রাকৃত ও সহজ সরল রূপটি সাধারণেরও আয়ত্তগম্য।

১৩১১ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনের চৈত্রসংখ্যায় 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধের একটি অংশে তাঁর এই অনুভবেরই প্রকাশ দেখা যায়। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বাংলা দেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলার সাহিত্যভাষার পরিবর্তে চারটি উপভাষাকে ব্যবহারের সঙ্কল্প করেন, এবং তাঁদের এই সঙ্কল্পের প্রতিবাদ প্রসঙ্গেই লোকশিক্ষার বাহন এইসব লোকসাহিত্যের ভাষার কথা সেখানে এসে পড়েছে। আমাদের বর্তমান আলোচনায় অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লোকসাহিত্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে উক্ত অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এখানে বলেছেন, "আমাদের দেশে প্রাচীন ভাষার সহিত আধুনিক প্রাকৃত ভাষাগুলির....আকস্মিক সম্বন্ধ নহে, বরাবর সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার নাড়ীর যোগ রহিয়া গেছে। অন্য কারণ ছাড়িয়া দিলেও ইহা দেখিতে হইবে, আমাদের দেশের ধর্মসাহিত্যের একমাত্র প্রস্রবণ সংস্কৃত। পুরাণ পাঠ, কীর্ত্তন, পৌরাণিক যাত্রা, কথকতা, তর্জা, কবির লড়াই প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের সাধারণ লোকের উপদেশ ও আমোদের উপকরণ, সমস্তই স্বভাবতই সংস্কৃত কথাকে দেশের সর্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত দেশের সাধারণের এই জ্ঞানসম্বন্ধের ভাবসম্বন্ধের পথ চিরদিন অবারিত আছে।"

কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা-কথকতার মাধ্যমে প্রচারিত আমাদের এই সহজ লোকশিক্ষার ধারাটি যে ক্রমবিলীয়মান কবি তা বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। 'য়ুনিভার্সিটি বিল' প্রবন্ধেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি, তার ভাল-মন্দ, ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পূর্ণ সচেতন; এবং স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতি প্রবল অনুরাগের বশেই কিভাবে এই শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতি সাধন করা যায় সেই ভাবনায় ভাবিত হয়েছিলেন তিনি। আর এই চিন্তা সূত্রেই লোকশিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসঙ্গও কবিমনে স্থান পেয়েছে। অবশ্য সেই সঙ্গে তাঁর সুগভীর লোকসংস্কৃতি প্রীতিও যুক্ত হয়েছে সন্দেহ নেই। ১৩১১-১২ বঙ্গাব্দে লিখিত অনেক প্রবন্ধেই তাঁর এই লোকসংস্কৃতি তথা সাহিত্য ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এবার সে প্রসঙ্গেই আসা যাক, যদিও এ সম্পর্কে আগেও কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এ সময়ের বিভিন্ন আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি লোক-সাহিত্যের নবরূপায়ণ সাধন করে আধুনিক শিক্ষার পাদপূরণ সম্ভাবনাতেও বিশ্বাসী ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত, আমাদের দেশে লোক-শিক্ষা নামের যে দুটি সহজ উপায় অনেক দিন থেকে প্রচলিত আছে তা হল যাত্রা এবং কথকতা। বর্তমানে তাদের আধুনিক শিক্ষার উপযোগী করে ঢেলে সাজাতে হবে। এবং তাদের মধ্যে স্থান পাবে ইতিহাস, সাহিত্য ও কাল্পনিক আখ্যায়িকা। কারণ কেবলমাত্র পৌরাণিক যাত্রা ও কথকতা আধুনিক কালের উপযোগী নয়। অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই, এই সব প্রচলিত যাত্রা, কথকতায় শিক্ষণীয় উপাদান অনেক আছে এবং বর্তমানে তাদের বর্জন করারও কোন প্রয়োজনীয়তা নেই; তবে তার ওপরে নতুন করে আরও একটি কর্তব্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে। সে হল দেশের প্রতি, সাধারণের প্রতি আমাদের কর্তব্যের প্রসঙ্গ।

লোক-শিক্ষা প্রসঙ্গে যাত্রা ও কথকতার আরও একটি চরম মূল্য কবি নির্ধারিত করেছেন। তা হল এই, যাত্রা ও কথকতার সাহায্যে জনসাধারণকে বিদ্যালয়ে না পড়িয়েও শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে এবং তাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষা অধিক শিক্ষা লাভই সম্ভব। তাঁর মতে প্রকৃতির মধ্যে কোন শিক্ষাকে বদ্ধমূল করে দেবার পক্ষে এমন সুন্দর উপায় আর নেই। তাছাড়া 'ইস্কুলে পড়া' জ্ঞান শিক্ষার্থীর প্রকৃতির মধ্যে সহজেই যথেষ্ট গভীর ভাবে প্রবেশ করে না।

এই সব ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রাচীন লোক-সংস্কৃতির উন্নতি ও প্রসার সাধনের প্রসঙ্গ আপনা থেকেই এসেছে কবির মনে। অথচ কবি আক্ষেপের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, লোকসংস্কৃতি তথা সাহিত্যের উন্নতির দিকে যথেষ্ট নজর না দিয়ে আমরা বিদেশী ভাবধারায় ভাবিত হয়েই দেশ, দেশের জনসাধারণ এবং তাদের শিক্ষা দীক্ষার উন্নতি কল্পে ব্রতী হয়েছি। ফলে দেশের থেকে অনেক দূরে সরে আসতে হয়েছে আমাদের মত নব শিক্ষাভিমানী বিদেশীভাবে ভাবিত নাগরিকদের। অথচ যাত্রা-কথকতা-কীর্তন প্রভৃতির মধ্যে সর্বজনীনতার বাতাবরণ যেন স্বতঃস্ফূর্ত হয়েই ছিল। আমাদের দেশের ভদ্র ভদ্রেতর সকল মানুষ ভাব বিনিময়ের আগ্রহে একত্র হত তার ছত্রাতপতলে। প্রত্যেকে একই সঙ্গে আমোদ প্রমোদে অংশ গ্রহণ করত, দেশের মধ্যে একটা আনন্দস্রোত প্রবাহিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা নিরানন্দময় শুষ্ক মরুভূমি হয়ে উঠেছে। তাই কবির মনে হয়েছিল, 'মেলা' ইত্যাদি গঠন করে সেখানে যাত্রা-কথকতা-কীর্তন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে পারলে

আবার ভদ্র ভদ্রেতর নির্বিশেষে সকলে একত্রে মিলিত হবার এবং একসঙ্গে চিন্তানুশীলনের সুযোগ পাবে নতুন করে। আর তাতে দেশেরই মঙ্গল।

এখানে স্মরণ করতে হয়, দূরদর্শী মহর্ষি পিতার অনুসরণে কবি তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন যথাক্রমে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের পৌষ ও মাঘ মেলায়। আজও তার ধারা চলে আসছে অক্ষুণ্ণ গতিতে।

কিন্তু কবিভাবনার কথাতে আবার যদি ফিরে যাই, দেখব ১৩১২ বঙ্গাব্দে তিনি আবারও ছাত্রদের আহ্বান জানিয়েছেন দেশের যথার্থ পরিচয় লাভের জন্য এবং বলেছেন তার সন্ধান করতে হবে দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন— "সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলেভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞতব্য বিষয় নিহিত আছে।"(আত্মশক্তি)

অতঃপর ১৩১৪ বঙ্গাব্দে। (২০ শে মাঘ) আবার দেখি, লোকসাহিত্য সংগ্রহে উৎসাহী ও উৎসাহদাতা রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের রূপকথা সংকলনের ভূমিকা লিখে দিচ্ছেন এবেং সেখানেও তিনি ব্যথিত চিত্তে বলেছেন যে, আজকাল আমাদের দেশের রূপকথা বিলুপ্তপ্রায়, তার স্থান দখল করেছে ইংরেজী Fairy Tales। তাই রূপকথা সংগ্রহের জন্য এবং মূল সুরটি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারার জন্য রূপকথা সংগ্রাহক কবির ধন্যবাদার্হ।—

"দক্ষিণাবাবুকে ধন্য। তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন, তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।"

রূপকথা সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথের অদম্য উৎসাহের আর একটি পরিচয় পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য থেকে। তিনি বলেছেন,—" তিনি কাকীমাকে (রথীর মা) দিয়েও অনেক রূপকথা সংগ্রহ করিয়েছিলেন। কাকীমা সেগুলি একখানি খাতায় লিখে রাখতেন, তাতে অনেক ভালো ভালো রূপকথা ছিল। তাঁর সেই খাতাখানি থেকেই আমার 'ক্ষীরের পুতুল' গল্পটি নেওয়া।"

অবশ্য মৃণালিনী দেবীর হাতে লেখা এই রূপকথা সংগ্রহের খাতাটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি এবং এর সংগ্রহের কালও জানা যায় না। তবে 'ক্ষীরের পুতুল' বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে। অতএব মৃণালিনী দেবীর খাতাটির বয়স তার চেয়ে বেশী ছিল, কেবল এই কথাই বলা যেতে পারে।

এছাড়া ১৩১৭ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে মীরাদেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির

মধ্যেও তাঁর লোকসাহিত্য সংগ্রহ প্রচেষ্টার নিদর্শন মেলে। সেখানে দেখি, কবি লিখেছেন, " তোর মামা কিংবা মামাশ্বশুরকে বলিস সেই বাউলদের গান আমাকে শীঘ্র সংগ্রহ করে পাঠাতে। দেরি না করে।" (চিঠিপত্র— ৪র্থ খণ্ড)

ঠিক এই বছরই তিনি 'আত্মবোধ' প্রবন্ধে বাউলদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ও তাঁদের ধর্ম নিয়ে আলোচনার কথা বিবৃত করেছেন বিস্তারিত ভাবে। বাউল ধর্ম ও সাহিত্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সে আলোচনাটির গুরুত্ব অপরিসীম। সেজন্য এখানেই আলোচনার বক্তব্যটি সংক্ষেপে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

প্রবন্ধটি রচনার কিছুদিন আগে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের দুজন বাউলের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁদের ধর্মের বিশেষত্বটি সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে একজন বলেন, বলা বড় কঠিন, ঠিক বোঝান যায় না। অপরজন কিন্তু ঠিক এর বিপরীত কথাই বলেন। তাঁর মতে তাঁদের ধর্মের বিশেষত্বটি খুব সহজেই সকলকে বোঝানো যায়। সেই বিশেষত্বটি হল, তাঁদের সম্প্রদায়কে গুরুর উপদেশে প্রথমে আপনাকে জানার জন্য প্রস্তুত হতে হয়; এবং সেই আপনাকে জানার মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরকে অনুভব করা সহজ হয়ে ওঠে। কবি তখন তাঁদের আবার জিজ্ঞাসা করেন যে কেন তাঁরা তাঁদের এই ধর্মের কথা বিশ্বের সবাইকে শোনান না। এ প্রশ্নের উত্তরে বাউল বলেন, "যার পিপাসা হবে সে গঙ্গার কাছে আপনি আসবে।......... সবাই আসবে। সবাইকে আসতে হবে।"

নিরক্ষর শাস্ত্রশিক্ষাহীন বাউলের মুখের এই সামান্য কথা কবির মনে এক অনির্বচনীয় অভিব্যক্তি সৃষ্টি করেছিল। তিনি এর সঙ্গে উপনিষদের বাণীর মিল খুঁজে পেলেন। তাঁর মনে হল তপোবনের ঋষি এবং বাংলার বাউল একই কথা বলতে চেয়েছেন। উভয়েরই বক্তব্য, মানুষ স্থির হয়ে বসে নেই; সে যাত্রা করেছে আপনার পরিপূর্ণতার অভিমুখে। জাগতিক প্রয়োজনের চেয়েও গভীর প্রয়োজন অর্থাৎ আপনাকে পাবার জন্যই সে বেরিয়েছে। কারণ আপনাকে না পেলে তার আপনার চেয়ে যে বড় তাকে পাবার কোন উপায় নেই। তাই দেখা যায় এই আপনাকে বিশুদ্ধ করে, প্রবল করে, পরিপূর্ণ করে পাবার জন্যই মানুষ কত তপস্যা করছে।

আমাদের বৈরাগী বাংলার একটি ছোট নদীর ধারে সামান্য কুটীরে বসে এই 'আপনি'র খোঁজ করে চলেছে এবং নিশ্চিন্ত হাস্যে বলছে, সবাইকেই আসতে হবে এই 'আপনি'র খোঁজ করতে । কেননা এ তো বিশেষ মতের বিশেষ সম্প্রদায়ের ডাক নয়, সমস্ত মানবের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য আছে এ যে তারই ডাক।

এখানে উল্লেখযোগ্য, বাউলদের এই সামান্য কথার মধ্যে কবি যে এমন গভীর অর্থ খুঁজে পেলেন, তার মূলেও রয়েছে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য এবং স্বদেশাভিমান। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর রাহস্যিক কবি প্রতিভা তাঁর সকল 'অপূর্ব বস্তু নির্মাণে'রই মূল উৎস। কিন্তু তাহলেও আগেই বলেছি, তাঁর পরিবারের ছিল প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীর আত্মিক যোগ। তাই শিশুকাল থেকেই উপনিষদের বাণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, উপনিষদের সঙ্গে যদি তাঁর পরিচয় না থাকত, তিনি যদি কেবলই লোকসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হতেন তবে বাউলদের এই বাণী

তাঁর মনে এমন অসামান্য আবেদন সৃষ্টি করতে পারত না। কবি নিজের সুসংস্কৃত সুশিক্ষিত মন নিয়ে লোকসাহিত্যের পর্যালোচনা করেছেন বলেই এর মধ্যে এমন সুগভীর ভাব ও তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন। নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, এই সমস্ত অখ্যাত-অজ্ঞাত বাউলের সামান্য তুচ্ছ কথার মধ্যে যে এমন সুগভীর তাৎপর্য নিহিত থাকতে পারে তা এতদিন পর্যন্ত কারও মনে হয়নি। ভদ্র সম্প্রদায় চিরদিন এদের অবজ্ঞাই করে এসেছেন, এদের গভীরে প্রবেশ করেননি; তাই তাঁদের বাণী ও সাহিত্যের যথার্থ মূল্যও অনুধাবন করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথই এ বিষয়ে প্রথম পথিকৃৎ।

তাছাড়া আলোচ্য প্রবন্ধে কবি কেবল বাউল সাহিত্য তথা সঙ্গীতের কথাই এমন করে বললেন না, বাংলা দেশে পথ চলতে চলতে শোনা যায় এমন গানের কথাও তিনি বললেন, যার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে বৈদিক ঋষির গভীর ভাবনা সমৃদ্ধ বাণী 'অবিরাবীর্ম এধি'। তাঁর আগে কেউ এ সম্পর্কে এমন করে ভাবেননি, ভাবতে পারার উপায় ছিল না।

তিনি বলেছেন ''মানুষের ইচ্ছার ক্ষেত্র টুকুতে তিনি আছেন, অথচ নেই। এইজন্য সেই জায়গাটাতে আমরা এত আঘাত করছি, আঘাত পাচ্ছি, ধূলায় আমাদের সর্বাঙ্গ মলিন হয়ে উঠেছে; সেখানে আমাদের দ্বিধা দ্বন্দ্বের আর অন্ত নেই, সেইখানেই আমাদের যত পাপ। সেইখান থেকেই মানুষের এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পূর্ণ হয়ে উঠুক। বৈদিক ঋষির ভাষার এই প্রার্থনাটাই এই বাংলা দেশে পথ চলতে চলতে শোনা যায় এমন গানে যে গান সাহিত্যে স্থান পায়নি, এমন লোকের কণ্ঠে যার কোন অক্ষরবোধ হয়নি। সেই বাংলা দেশের নিতান্ত সরল চিত্তের সরল সুরের সারি গান ঃ 'মাঝি তোর বইঠা নে রে আমি আর বাইতে পারলাম না'। তোমার হাল তুমি ধরো, এই তোমার জায়গায় তুমি এসো, আমার ইচ্ছা নিয়ে আমি আর পেরে উঠলুম না। আমার মধ্যে যে বিচ্ছেদটুকু আছে সেখানে তুমি আমাকে একলা বসিয়ে রেখো না। হে প্রকাশ, সেখানে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।'' (আত্মবোধ)

এই প্রসঙ্গ সূত্রেই কবির বাউল সাহিত্যভাবনার পরিচয় আর একটু তলিয়ে দেখা যাক। সমগ্র লোকসাহিত্যের মধ্যে বাউল সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সর্বাধিক। এমন কথাও মনে হতে পারে যে, এই সঙ্গীত ধারার আপাত সহজ সরল ভাব ভাষার মধ্যে কবি যে সুগভীর তাৎপর্য ও উচ্চ সাহিত্যিক মূল্য আবিষ্কার করেছিলেন এবং তার সঙ্গে আপন রাহস্যিক কবিপ্রাণের এমন সংযোগ অনুভব করেছিলেন, যা হয়ত অন্যত্র দুর্লভ হয়েছিল।

তারই ফলে দেখি, পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি রচনার ঠিক তিন বছর পর ১৩২০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'ছোটো ও বড়ো' নামে আধ্যাত্মিক ভাবনা সমৃদ্ধ একটি মননশীল নিবন্ধের মধ্যে বাউলের কথাকে অনায়াসে স্থান দিয়েছেন; এখানেও অনন্ত ব্রহ্মের সঙ্গে বাউলের 'মনের মানুষ' এর তুলনা তো করেছেনই, তাছাড়া ইহুদীদের পুরাণের সঙ্গেও তার তুলনা করেছেন। এ প্রবন্ধে বর্ণিত 'বাউল' সম্পর্কিত কবির মতামত নিঃসন্দেহে সুগভীর অর্থবহ।

তিনি এখানে বলেছেন, বহুদিন আগে বাউল্ বৈরাগীর মুখে শোনা গান— 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে', তাঁকে মুগ্ধ করেছিল এবং গভীর ভাবে ভাবিতও করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এই গানের মধ্যে মানুষের অন্তরের একটি কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ঈশ্বরই হলেন এই মনের মানুষ; নইলে মানুষ কার জোরে এই মানুষ হয়ে উঠছে। ইহুদিদের পুরাণ বলেছে, ঈশ্বর মানুষকে আপনার প্রতিরূপ করে গড়েছেন। স্থূল বাহ্যভাবে এ কথার অর্থ যাই হোক না কেন, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে এক সুগভীর সত্য। ঈশ্বর মানুষের অন্তরে থেকে আপনাকে দিয়েই তো মানুষকে তৈরী করে তুলেছেন। সেইজন্যেই মানুষ আপনার সব কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড় সব কিছুর অতীত একটি সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করে থাকে। আর সেই জন্যেই ওই বাউলের দলও বলেছে, 'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়'। সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনা সত্তা ক্ষণে ক্ষণে কেবল আপনার স্পর্শ একটুখানি দিয়ে যায়; আর সেই অসীমকে আপনার করে পাবার জন্যেই প্রাণের ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় এই ভাবে; 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে'। অসীমের মধ্যে যে একটি ছন্দ দূর ও নিকট রূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মত চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ ও সর্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করছে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেছে।

তিনি আরও বলেছেন, এই 'মনের মানুষ'ই হলেন অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্ম। তাঁকে কোন স্থূল রূপের মধ্যে অনুভব করা যায় না, কোন বিশেষ স্থানে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না। তাঁকে জ্ঞানের সাধনার মধ্যে দিয়ে জানতে হবে, কিন্তু সে জানা কেবলই জানা, সে জানা কোন স্থানে এসে বদ্ধ হবে না। স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে, মঙ্গলকে সাধন করতে করতে আপনাকে নিয়ত দানের মধ্যে দিয়েই এই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ 'মনের মানুষ' এর অস্তিত্ব নিয়ত অনুভব করতে হয়।

এ সব রচনায় রবীন্দ্রনাথ 'বাউল' প্রভৃতি লোকসাহিত্যকে কেবল আবিষ্কার করলেন না, নতুন মূল্যে তার অন্তর্নিহিত দর্শন-ভাবনাকে আপনার চিত্ত মধুরিমা দিয়ে নতুন করে সৃষ্টি করলেন; অভিজাত সাহিত্যের ক্ষেত্রে কালিদাসের মেঘদূত অনেকটা এইরকমই নতুন সৃষ্টিরূপ পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়।

'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধ রচনার বছর দুই পরে ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রবাসীতে 'হারামণি' নামে এক নতুন বিভাগের সূত্রপাত হয় এবং সে বিভাগ প্রচলনের উদ্দেশ্য বিবৃত হয় নিম্নলিখিত ভাষায়।—

"এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত কবির বা স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। প্রবাসীর পাঠক এই কার্যে আমাদের সহায় হইবেন আশা করি। অনেক গ্রামেই এমন অনেক নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর কবি মাঝে মাঝে দেখা যায় যাঁহারা লেখাপড়া অধিক না জানা সত্ত্বেও স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট ভাবের কবিত্বরসমধুর রচনা করিয়া থাকেন, কবিওয়ালা, তর্জাওয়ালা, বাউল, দরবেশ, ফকির প্রভৃতি অনেকে এই দলের। প্রবাসী পাঠক পাঠিকারা ইহাদের যথার্থ কবিত্বপূর্ণ রসভাবপূর্ণ রচনা সংগ্রহ

করিয়া পাঠাইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিব।"

দেখা যায় এই আবেদনেও প্রথম সাড়া দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হারামণির প্রথম বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে কবির সংগৃহীত একটি বাউলগান 'মনের মানুষের সন্ধানে' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়। গানটির আরম্ভ 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।' এবং এর স্বরলিপিও প্রকাশিত হয় সঙ্গে সঙ্গে। বিশেষ ভাবে স্মরণীয় এই গানটির কথাই বলেছেন 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে।

এই গানটির রচয়িতা হলেন গগন হরকরা। ইনি ছিলেন শিলাইদহ পোষ্ট অফিসের পিওন। জমিদারী পরিদর্শনের কাজে এঁর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীর তথ্য সূত্রানুযায়ী, চিঠি বিলির কাজে এঁকে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে হত। এবং সেই সূত্রেই এঁর গীতি কুশলতা সম্পর্কে তিনি অবহিত হন। আর তারই ফলে তখন অনেক দিনই দেখা যেত, সঙ্গীত তথা লোকসাহিত্য রসিক কবি সন্ধ্যার পর নির্জনে বোটের ছাদে বসে গগনের মরমী সঙ্গীত উপভোগ করছেন মুগ্ধ বিস্ময়ে।

সুতরাং, এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে, তিনি গগন হরকরার মুখ থেকেই উপরোক্ত গানটি শুনেছিলেন। কিন্তু বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য , রবীন্দ্রনাথ নিজে গানটির রচয়িতা হিসেবে গগনের নাম উল্লেখ করলেও কোথাও বলেননি যে তিনি এই গানটি তাঁর মুখ থেকে শুনেছেন। তিনি সর্বত্রই বলেছেন শিলাইদহ অঞ্চলের এক বৈরাগী বাউল এই গানটি তাঁকে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বৈরাগীর নাম সম্পর্কে কবি নীরব।

যেখান থেকেই কবি গানটি সংগ্রহ করে থাকুন না কেন, এর সুর, ভাব ও বাণী যে তাঁর মনের গভীরে রেখাপাত করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই দেখা যায় পরবর্তী কালেও অনেক আলোচনার মাধ্যমে কবি এই গানটির গভীর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য সম্পর্কে দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীকে সচেতন করে তুলেছেন। সে প্রসঙ্গও পরে আসবে।

এ বৎসরই প্রবাসীর বিভিন্ন সংখ্যার হারামণি অংশে তিনি আরও কুড়িটি বাউল গান প্রকাশ করেন 'লালন ফকিরের গান', এই শিরোনামে, এ সব গানের বিস্তারিত পরিচয় বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে পাওয়া যাবে। এ গানগুলি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে।

ঐ সময়ে শিলাইদহ অঞ্চলে লালন ফকিরের গানই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। আর রবীন্দ্রনাথ ঐ অঞ্চলেই লালনের গানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। অবশ্য লালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল কিনা সঠিকভাবে জানা যায় না। এ নিয়ে নানরকম মতভেদ আছে।

এ সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের আখড়া থেকে তাঁর গানের খাতাখানা সংগ্রহ করেন এবং তাঁদের এক কর্মচারীকে দিয়ে তা নকল করিয়ে নেন।

ক্ষিতিমোহন সেনের 'বাংলার বাউল' বইটি থেকে জানা যায়, প্রবাসীতে যখন এইসব গভীর ভাবনা সমৃদ্ধ মরমী সঙ্গীতগুচ্ছ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন

অনেকের মনেই এদের রচয়িতা সম্পর্কে সংশয় জাগে; সে সময় কারও কারও এমন ধারণাও হয়েছিল যে, নিরক্ষর বাউলদের নামে প্রচারিত এইসব গানগুলো প্রকৃত পক্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই রচনা। শ্রী সেন একথা রবীন্দ্রনাথকে জানালে, রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:—

"শিক্ষিত লোকের মুরদ তো আমার অজানা নাই। এই সব জিনিস যে তাঁহাদের রচনা শক্তির বাহিরে তাহা আমি খুবই বুঝি। একটা গান পাইলে হয়তো তাঁহারা কতক অনুরূপ আর একটা গান করিতে পারেন। কিন্তু মূলটা রচনা শিক্ষিত লোকের কর্ম নয়। অন্তত আমার তো তাহার কাছাকাছি শক্তিও নাই।"

এই কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল তথা সাধারণভাবে অশিক্ষিত পটু গ্রাম্য সহজ কবিদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সুগভীর শ্রদ্ধাবোধের এবং তাদের রচনার আধ্যাত্মিক তথা দার্শনিক ভাব ও অনাবিল সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর মুগ্ধতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনও বাংলার বাউলগানের একজন উৎসাহী সংগ্রাহক ছিলেন। কিন্তু যে সব বাউলের নিকট থেকে তিনি গান সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই তাঁকে এ গানগুলো সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন, একথা তিনি নিজেই তাঁর 'বাংলার বাউল' গ্রন্থে বলেছেন, অবশ্য তিনি তাঁর এই সংগ্রহ রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়েছিলেন। কবি এই সব অশিক্ষিত লোকের রচনায় এত অল্প কথায় এমন গভীর সত্যের প্রকাশ দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ সেই কারণেই তিনি শ্রীসেনকে অনুরোধ করেছিলেন, এর মধ্যে যেগুলো প্রকাশ করতে বাধা নেই সেগুলো প্রকাশ করতে এবং অন্যগুলো প্রকাশের জন্য অনুমতির চেষ্টা করতে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাউল ও বাউলগান' গ্রন্থে বলেছেন যে , তিনি নিজে দীর্ঘদিন ধরে বাউল গান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং তাদের সাধনার কথা জানার জন্যে বহু স্থানে গিয়েছেন এবং সেই সূত্রে অনেক 'বাউল ও বাউলানী'র সংস্পর্শেও এসেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি শ্রীক্ষিতিমোহন সেন সংগৃহীত সুউচ্চ ভাব ও ভাষা সম্পন্ন বাউল গানের অনুরূপ গানের সন্ধান পাননি। তিনি আরও বলেছেন যে, শ্রীসেনের সংগ্রহের অন্তর্গত গীতিগুচ্ছের ভাবভাষা অত্যন্ত আধুনিকতাগন্ধী এবং একটু লক্ষ্য করলেই এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের মৌলিক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এমনবি তিনি তাঁর এই বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য অনেক উদাহরণও দিয়েছেন। এর থেকে মনে হয়, তাঁর ধারণা হয়েছিল যে এ গানগুলো রবীন্দ্রভাবাপন্ন কোন আধুনিক কবির রচনা। যে গানগুলোকে তিনি রবীন্দ্ররচনার অনুকৃতি বলে চিহ্নিত করেছেন, তা হল এই— (১) 'নিঠুর গরজী, তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে', (২) 'হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি', (৩) 'আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে' প্রভৃতি।

পরিশেষে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "বাংলা সাহিত্যের সহিত যাঁহারা বিশেষভাবে পরিচিত, তাঁহারা এই গানগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই গানগুলির মধ্যে

যথেষ্ট আধুনিক হস্তক্ষেপ আছে এবং ইহা পল্লীর অশিক্ষিত বা সাবেকী ধরনের অর্ধশিক্ষিত বাউলের রচনা নয়।"

কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য পর্যালোচনা করলে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহন সেনের বাউল সংগ্রহের সঙ্গে কেবল পরিচিতই ছিলেন না, এর থেকে অনেক উদ্ধৃতিও তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর কোন কোন প্রবন্ধে। আর বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, শ্রীভট্টাচার্য যে বিশেষ গানটির (নিঠুরগরজী) ভাব এবং ভাষার মধ্যে সবচেয়ে বেশী আধুনিক বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধে সেই গানটিকেই বাউল গানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। (Spiritual Freedom ; The Religion of Man; 'The Philosophy of our people', Presidential Address at the Indian Philosophical congress, Modern Review; January-June, 1926)

তদুপরি কবি নিজেই বলেছেন যে তাঁর অনেক গানে ও কবিতায় বাউল গানের প্রভাব পড়েছে তাঁর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে। অতএব এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে উপরোক্ত বাউলগানসমূহ রবীন্দ্রকাব্যের অনুসরণে রচিত নয়। বরং রবীন্দ্রনাথই ঐ সব গানের অনেক ভাব গ্রহণ করেছেন তাঁর কাব্যসাহিত্যসঙ্গীতে।

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথকে সেই সমস্ত বাউল গানই আকৃষ্ট করেছিল সর্বাধিক পরিমাণে, যার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে সর্বপ্রকার সংস্কার প্রথার অতীত এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি— রূপের মধ্যে অরূপকে, সীমার মধ্যে অসীমকে, মনের মধ্যে মনের মানুষকে সন্ধান করার এক তীব্র আকুতি। বাউলদের গুহ্য সাধন পদ্ধতির পরিচায়ক গানসমূহ কবির মনে কোন রেখাপাত করেনি।

প্রবাসীতে বাউলের গান প্রকাশের পরবর্তী উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা হল, ১৩২৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে আসেন। এ সময়ে বাঙ্গালোর বাসকালে একদিন (৮ই মার্চ) Mysore Mythic Society তে The Folk Religion of India সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। ভাষণটিতে বাংলার বাউলদের কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। Mysore Mythic Society প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এবং এর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চার উন্নয়ন।

এই প্রতিষ্ঠানের সূচনার দশ বছর পর রবীন্দ্রনাথ এখানে ভাষণ দান কালে দক্ষিণ ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সুদূর বাংলার লোকায়ত দর্শন ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার। আর কবির এই প্রয়াস সভার সকলের মর্ম স্পর্শ করতে পেরেছিল বলে মনে হয়। এই সভার সভাপতি মহীশূরের যুবরাজ এ সম্পর্কে যা বলেছেন তাও আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তার মধ্যে রবীন্দ্র চিন্তাধারারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হল এই যে, রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা থেকে দুটি জিনিস শেখা গেল; প্রথমটি আমরা দেশ সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ, দেশকে জানতে হলে আমাদের লোকসাহিত্যের আলোচনা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়টি কোন 'জাত' বা সম্প্রদায় নীচ নয় (The Quarterly Journal of the Mythic Society.1919)

দেখা যায়, এর পরেও রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ঐই সব বাউল সাধকদের বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন নানা জায়গায়।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে অর্থাৎ ১৩২৭ বঙ্গাব্দে লণ্ডনের 'উইগ মোর হল' এ রবীন্দ্রনাথ বাংলার মরমী কবিদের সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন; ঐ বছরই নেদারল্যাণ্ডসে-ও তিনি দিন পনেরো ছিলেন। এর মধ্যে আমস্টারডাম, রটারডাম, হেইগ, লাইডেন, য়ুট্রেস্ট এ বক্তৃতা দান করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল, The Message of the East : কোন কোন স্থানে বাংলার লোকধর্ম বা বাউলদের সম্বন্ধেও বলেন। এর পরেই নভেম্বর মাসে ফিলাডেলফিয়ার একটি মহিলাদের কলেজে 'বাংলার মরমী কবি'দের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। নিউইয়র্কে তাঁর একটি বক্তৃতার বিষয় হল 'The Poet's Religion'। এর মধ্যেও বাউলদের কথা এসে পড়েছে নানাভাবে।

ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণ কালে প্রদত্ত কবির এসব বক্তৃতাসমূহ Creative Unity নামে সংগৃহীত হয়।

The Poet's Religion এ দেখি রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ কবি শেলীর ভাবধারার সঙ্গে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের নিরক্ষর বাউল বৈরাগীর চিন্তাধারার সাদৃশ্য অনুভব করেছেন। তিনি বলেছেন, The prevalent rites and practice of piety, according to this poet (Shelley) are like magic spells – they only prove men's deperate endeavour and not their success. He knows that the end we seek has its own direct call to us, its own light to guide us to itself. And truth's call is the call of beauty. Of this he says :

"Thy light alone,–– like mist o'er mountain driven,
Or music by the night wind sent,
Thro' strings of some still instrument
Or moonlight on a midnight stream
give grace and truth of life's unquiet dream"

About this revelation of truth which call us on, and which is every where, a village singer of Bengal sings :

" My master's flute sounds in every thing,
drawing me out of my house to every where ,
While I listen to it I know that every step I take
is in my master's house.
For he is the sea, he is the river that leads to the sea,
and he is the landing place."

কবির এই আন্তরিকতা-দীপ্ত অপরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরই ফলে বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজের নিকট বাউলগানের মর্যাদা গেল অনেক বেড়ে।

অপর একটি প্রবন্ধে তিনি ম্যাথু আর্নল্ড এর চিন্তাধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন একটি বৈদিক মন্ত্রের। আর তারপরই বলেছেন এমন একটি বাউলগানের কথা যার মধ্যে ঐ একই ভাবের অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়।

তাছাড়া বাউলদের ধর্ম ও সাহিত্যকে উপজীব্য করে লিখলেন 'An Indian Folk Religion' প্রবন্ধটি। উদ্দেশ্য বাউলদের সত্যকে জানার আকুতি, মনের মানুষের জন্য ব্যাকুলতা যা তাদের ধর্ম সাধনার অঙ্গীভূত তাকেই বিশ্লেষণ করে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা।

সত্যকে জানার জন্য যে গভীর আকাঙ্ক্ষা, এবং আত্মোপলব্ধির জন্য যে তীব্র ব্যাকুলতা ধ্বনিত হয়েছিল প্রাচীন ভারতের বৈদিক কবির ধ্যানে, আজও তার প্রতিধ্বনি শোনা যায় বাংলার আউল -বাউল-বৈরাগীর কণ্ঠে, পথচলতি ভিক্ষুকের গানে। এ সম্পর্কে কবি আরও বলেছেন, "They (Baul) live outside the social recognition and their very obscurity helps in their seeking, from a direct source, the enlightenment which the soul longs for, the eternal life of love."

অতঃপর কবি এই বাউলগানের বিষয়বস্তুর বিচার বিশ্লেষণ করে সাহিত্য ক্ষেত্রে এদের প্রকৃত মূল্য তথা তাদের উচ্চ কাব্যাদর্শ সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে চাইলেন এবং সেই সঙ্গে বিশ্ববাসীর নিকট দিয়ে গেলেন সাধারণ গ্রামবাসী গগন হরকরার পরিচয়— যিনি বিখ্যাত বাউল গান 'আমি কোথায় পাব তারে, মনের মানুষ যে রে'র রচয়িতা।

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে কবি বাউলদের দর্শনের পরিচয় প্রসঙ্গও বাদ দেননি , বাউলরা মনে করেন, মানবদেহই হল মন্দির, এর মধ্যেই দেবতার অধিষ্ঠান। অথচ মানুষ তার নিজের মধ্যে এই দেবতার অবস্থানকে পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারে না বলেই সর্বত্র তাঁকে খুঁজে বেড়ায়। অবশ্য তিনি একথাও বলেছেন যে, বাউলেরা তাঁদের দেহতত্ত্বমূলক সাধনার কথা গোপনীয় বলেই মনে করেন, আর সেজন্যেই সাধক ব্যতীত এ সাধনার রহস্য সকলেরই অজানা।

আরও উল্লেখযোগ্য, এই প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলো বাউল গানের অনুবাদও করেছেন। আবার ঐ বছর The Fugitive গ্রন্থে তাঁর আরও কয়েকটি বাউল গানের ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়।

এর কয়েক বছর পর (১৩৩২) ভারতীয় দর্শন সম্মেলনের সভাপতিত্ব গ্রহণের জন্য কবির কাছে আহ্বান এল। তখনো তিনি এই অধিবেশনে আবার বাউল ও বাউল দর্শনের কথাই বললেন।

সাধারণ লোকের ধর্মচেতনার মধ্যে মুক্তির যে তত্ত্ব নিহিত, সংস্কৃত শাস্ত্রে তা কি আকার নিয়েছে এবং ভারতীয় মুক্তিতত্ত্বের সঙ্গে খৃষ্টান মুক্তিতত্ত্বের পার্থক্য কোথায় তাও এই ভাষণে কবি অল্প কথায় ব্যক্ত করেছেন। প্রবন্ধের প্রারম্ভে তিনি বলেছেন পাশ্চাত্য জগতে কবিতা ও দর্শন পৃথক বিষয়। তাই প্লেটো তাঁর 'Ideal Republic' থেকে কবিদের নির্বাসনের পরিকল্পনা করেছিলেন। অথচ ভারতে কবিতা ও দর্শন মিলে মিশে রয়েছে। শঙ্করাচার্যের নামের সঙ্গে অনেক কাব্যকবিতা যুক্ত করা হয়। মধ্যযুগের সন্ত সাধকদের দার্শনিক তত্ত্ব কাব্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলার বাউল ও ঐ শ্রেণীর নানা সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করে কবি দেখান যে এঁরা তত্ত্বকথা কত সহজ ও সরল কবিতায় প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, পরবর্তী কালে (১৯৩০ খৃ: অর্থাৎ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে) হিবার্ট বক্তৃতার ধর্মদেশনায়ও রবীন্দ্রনাথ হিন্দু শাস্ত্র থেকে সংস্কৃত শ্লোক, বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ থেকে পালি শ্লোক যেমন উদ্ধৃত করেছেন, তেমনই করেছেন বাংলা দেশের নিরক্ষর আউল-বাউল-সাঁই-ফকিরদের গান। বিশেষ সম্প্রদায়ের বা বিশেষ ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিলেই তা সাম্প্রদায়িক হয় না; কারণ লেখক মাত্রই বিশেষ ভাষা ও বিশেষ সংস্কৃতির মধ্যে লালিত --- সুতরাং তার পক্ষে সেটুকু পক্ষপাতিত্ব অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম ব্যাখ্যানের মধ্যে যে ধর্ম ভূমিকা দেখতে পাই তা ভারতীয় তথা ঔপনিষদিক। তবে তার মধ্যে যা সর্বজনগ্রাহ্য তাকেই তিনি বিশ্বধর্মের আসন দান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষণসমূহ প্রধানতঃ ভারতীয় হিন্দুধর্মের পটভূমির ওপর রচিত হলেও তা বিশ্বমানবের ধর্মসমস্যার পাদপূর্ণ করেছে।

তাঁর এই হিবার্ট বক্তৃতা মালা 'The Religion of Man' নামেই পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পাশ্চাত্য শ্রোতাদের নিকট রবীন্দ্রনাথ যে কেবল ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতবাদের ভাষ্য করলেন তা নয়, ভারতের প্রাকৃত জনসমাজের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য রয়েছে তারও ব্যাখ্যা করলেন। এই 'অশিক্ষিত' সাধারণের কথা সম্ভবতঃ তিনিই সর্বপ্রথম বিদেশে বিবৃত করেন।

ভারতীয় দর্শন মহাসভায় রবীন্দ্রনাথ যে বাউল সাধকের গানের কথা উদ্ধৃত করেছেন সে সাধক কবি হলেন শ্রীহট্টের হাসন রজা এবং গানটি হল,—

"মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম
নাকে পয়দা করিয়াছে খুসবয় বদবয়।"

কবি এই গানটির মধ্যে বৈদিক কবির উপলব্ধির প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন। লোক কবির এই 'আমি' হল বেদের পরম পুরুষ, যিনি মানুষের মধ্যে এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একই সঙ্গে বিরাজ করেন।

এ আলোচনায় অপর একটি বাউল গান 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়' এর প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এই গানের কথার মধ্যে আভাস পাওয়া যায় ঔপনিষদিক তত্ত্বের। শুধু তাই নয়, এর ভাব, এর বাণী তাঁকে শেলীর কবিতার The mystical spirit of Beauty'র কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে বারে বারে।

অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বাউলধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বাংলার এই সব বাউলরা সবধর্মের অতীত। কোন ধর্মীয় আচার ও সংস্কার তাঁদের সাধনার প্রতিবন্ধক হতে পারে নি। তাই তাঁদের সঙ্গীত ধারায় ধ্বনিত হয়েছে সর্বধর্ম সমন্বয়ের মূল কথা; মন্দির বা মসজিদ কোথাওই বাউলদের মুক্ত ধর্মের ভাবনা আবদ্ধ হয়ে নেই।

আবার দেখি মহম্মদ মনসুর উদ্দীন কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত বাউল গানের সংকলন 'হারামণি' (১ম খণ্ড)র ভূমিকায়ও কবি বাউলদের এই সর্বধর্মসমন্বয়ের মূল মন্ত্রটির কথা বলেছেন,

"...... আমাদের দেশে ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি — এ জিনিস হিন্দু মুসলমান উভয়েরই; একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরাণে পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা।"

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে অতি উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা সকলের অগোচরে সাধারণের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এমনকি এক এক সময় এক এক ধর্মের প্লাবন বয়ে গেছে দেশের ওপর দিয়ে; তারপরে হয়ত সে ধর্ম বিলুপ্তও হয়েছে; কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই সমস্ত ধর্মের মর্মবাণীটি ধ্বনিত হয়ে এসেছে একই ভাবে. অথচ তা কোন সচেতন মনের প্রয়াস নয়। রবীন্দ্রনাথই প্রথম সাধারণ লোকের মধ্যে প্রবাহিত এই ধর্মান্দোলনের ধারাটি লক্ষ্য করেছেন এবং এসম্পর্কে সকলকে অবহিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

এবার লোকসাহিত্যের অপর একটি উপাদান ছড়ার প্রসঙ্গে আসা যাক। আগেই বলেছি, বহুদিন আগে ১৩০১-১৩০২ বঙ্গাব্দে কবি ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন এবং সে সম্পর্কে মননশীল আলোচনাও করেছিলেন। তারপর আবার বহুদিন পরে জীবন সায়াহ্নে বাংলা ছন্দের আলোচনা কালে ছড়ার ছন্দের কথা স্মরণ করেছেন। শুধু তাই নয়, তার ওপর একটা বিশেষ গুরুত্বও আরোপ করেছেন। তাঁর মতে ছড়ার ছন্দই খাঁটি বাংলা ছন্দ, এর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রাণের সুর মিলিত হয়েছে। বাংলার লোকসাহিত্য দীর্ঘদিন যাবৎ লৌকিক বা ছড়ার ছন্দে রচিত হয়ে এসেছে; এবং লোকসাহিত্যের মত এ ছন্দও রয়ে গেছে অবজ্ঞার অন্ধকারে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এ ছন্দকে তুচ্ছতার গ্লানি মুক্ত করলেন এবং বললেন যে এই লঘু চালের ছড়ার মধ্যে একটা অপরিসীম ভার বহন ক্ষমতা আছে, তদুপরি এর ভঙ্গী মোটেই একঘেয়ে নয়। ছোট বড় নানা ভাগে বেঁকে বেঁকে চলেছে।

এতদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় উচ্চতর ভাবপ্রকাশের বাহন ছিল পয়ার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই প্রথম অনুভব করলেন, ছড়ার ছন্দেও অনায়াসেই সেই গভীর তথা উচ্চভাবের প্রকাশ হতে পারে। 'ক্ষণিকা' কাব্য রচনা করে আপন অনুভবের যাথার্থ্য তিনি প্রমাণ করেছেন অনেক আগেই।

ছড়ার ছন্দের 'যতি' প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "যতিকে কেবল বিরতির স্থান না দিয়ে তাকে পূর্তির কাজে লাগাবার অভ্যাস আরম্ভ হয়েছে আমাদের ছড়ার ছন্দ থেকে। ছড়া আবৃত্তি করবার সময় আপনি যতির জোগান দেয় আমাদের

কান।..... ছড়ার রীতি এই যে, সে কিছু ধ্বনি জোগায় নিজে, কিছু আদায় করে কণ্ঠের কাছ থেকে; এই দুইয়ের মিলনে সে হয় পূর্ণ। প্রকৃতি আমের মধুরতায় জল মিশিয়েছেন, তাকে আমসত্ত্ব করে তোলেন ; সেজন্যে রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই কৃতজ্ঞ। তেমনি যথেষ্ট যতি মিশেল করা হয়েছে ছড়ার ছন্দে, শিশুকাল থেকে বাঙালী তাতে আনন্দ পায়।" (ছন্দ)

আবার দেখি ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে কবি ছড়ার ভেতরকার অর্থের অসংগতি ও ভাবের অসংলগ্নতা সম্পর্কে যে কথা বললেন, তা তিনি আগেই বলেছেন 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে।

তবে 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে তিনি বিদেশী আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে ছড়ার তুলনা করে তার মূল্যকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছেন।—

"আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যে অবচেতন চিত্তের এই সমস্ত স্বপ্নের লীলাকে স্থান দেবার একটা প্রেরণা দেখা যায়। আধুনিক মনস্তত্ত্বে মানুষের মগ্নচৈতন্যের সক্রিয়তার উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। চৈতন্যের সতর্কতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বপ্নলোকের অসংলগ্ন স্বতঃসৃষ্টিকে কাব্যে উদ্ধার করে আনবার একটা প্রয়াস দেখতে পাই। নীচের ছড়াটির মত এই জাতের রচনা কোনো আধুনিক কবির হাত দিয়ে বেরিয়েছে কিনা জানিনে। খবর যা পেয়েছি তাতে জানা যায়, এর চেয়ে অসংলগ্ন কাব্যের অভ্যুদয় হয়েছে,—

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে,
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
দুপারে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।
ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেমেছে,
ঝুনু ঝুনু চুল গাছটি ঝাড়তে নেগেছে।
কে দেখেছে, কে দেখেছে, দাদা দেখেছে।
আজ দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে।
....
....

সুদূর কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই কাব্য যারা আউড়িয়েছে এবং যারা শুনেছে তারা একটা অর্থের অতীত রস পেয়েছে; ছন্দতে ছবিতে মিলে একটা মোহ এনেছে তাদের মনের মধ্যে। সেইজন্যে অনেক নামজাদা কবিতার চেয়ে এর আয়ু বেড়ে চলেছে। এর ছন্দের চাকা ঘুরে ঘুরে চলেছে বহু শতাব্দীর রাস্তা পেরিয়ে।"

এমনি করেই দেখি, রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নবমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছেন, শুধু তাই নয়, বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে এর স্থান করে প্রায় অসম্ভব সাধন করেছেন বলা চলে।

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্র-সৃজনী মানসে লোকসাহিত্য-সংস্কারের প্রভাব-পরিচয়

বাল্যকাল থেকেই লোকমানস, লৌকিক সংস্কার ও লোকসাহিত্যের সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছিল গভীরভাবে। প্রথম বয়সের এই আকর্ষণ ও কৌতূহল পরে তাঁর হৃদয়ের আবেগ ও মননশীলতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবিকে লোকসাহিত্যের শিল্পরস সন্ধানে আগ্রহী করে তুলেছিল। শুধু তাই নয়, লোকসাহিত্যের সহজ সৌন্দর্য ও মাধুর্য এবং লোকজীবনের অপরূপ বৈশিষ্ট্য তাঁর স্বভাব-কবি মনকে বিকশিত করে তুলতে সহায়তা করেছিল; এবং সেই সঙ্গে তাঁর সহজাত সৌন্দর্য-প্রিয়তা ও রোমাণ্টিক চেতনাকে, তাঁর সুরবোধ ও চিত্রকল্পনাকে উদ্রিক্ত করে তুলেছিল অনেকটা পরিমাণে। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে তার প্রমাণ বিকীর্ণ হয়ে আছে। দেখা যায় কাব্যে, নাটকে, কথাসাহিত্যে সর্বত্রই লোকসাহিত্যের প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে কখনও কবির জ্ঞাতসারে, কখনও বা অজ্ঞাতসারে। এমনকি তাঁর শেষজীবনের রচনাতেও এ প্রভাব হ্রাস পায়নি। এবার লোকসাহিত্যের মাধ্যমে কবি-রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রসৃষ্টির মাধ্যমে লোকজীবনের উজ্জীবিত অভিব্যক্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সৃজনধর্মী রচনায় এমন অনেক ভাব ও বাণী, ভাষা ও ছন্দ এবং আঙ্গিক বা গঠনশৈলীর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় যা একান্তভাবেই তাঁর লোকসাহিত্য-সংস্কারের ফলশ্রুতি। বলাই বাহুল্য, তিনি যদি জীবনে কোনদিন লোকসংস্কৃতি তথা লোকসাহিত্যের সংস্পর্শে না আসতেন তবে তাঁর রচনায় কখনোই অনুরূপ ভাব ও বাণীর, ভাষার ও ছন্দের প্রকাশ ঘটা সম্ভব হত না। অবশ্য একথাও ঠিক, জীবনে কেবলমাত্র লোকসাহিত্যের সংস্রব লাভ করলেও তা সম্ভবপর হত না কোনমতেই। কারণ, রবীন্দ্রনাথ যদি ঠাকুরবাড়ীর সুউন্নত, সুকর্ষিত, পরিশীলিত পরিবেশে জন্মগ্রহণ না করতেন এবং তাঁর মনে যদি একই সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধিত না হত তবে তাঁর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ অন্যদিকে মোড় নিত। ফলে তাঁর এই প্রাচ্য পাশ্চাত্য ভাবধারা সমন্বিত সুসংস্কৃত সুপরিমার্জিত মননের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির অসংস্কৃত অপরিমার্জিত সহজ উপাদানের এমন সার্থক সামঞ্জস্য স্থাপিত হতে পারত না। আর তাহলে লোকসাহিত্যের অন্তর্নিহিত অনাবিল সৌন্দর্য সহজ সত্য ও অনাড়ম্বর ভাবের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেও তিনি সেই লোকায়ত চরিত্রের পরিশীলিত যে অপূর্ব নবরূপ রচনা করেছেন, তা কখনো করতে পারতেন না। আর এই মানস গঠনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে কবির শিল্পী-সত্তার সর্বপ্রধান কৃতিত্ব।

এখন এই সমন্বয়-ইতিহাসের তথ্য-চিত্রটুকু অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই লোক-সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত রবীন্দ্ররচনাকে কয়েকটি প্রধান পর্বে বিভক্ত করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

প্রথম পর্বে থাকবে এমন সব রচনা যাতে পরিস্ফুট আছে লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তুগত প্রাধান্য।

দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হবে লোকসাহিত্য থেকে আহৃত ভাববস্তুর প্রাধান্যমূলক রচনার কথা।

তৃতীয় পর্বে রচনার মৌলিক ভাববস্তুর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করে লোকসাহিত্যের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি যেখানে ধরা পড়েছে, তারই পর্যালোচনা করা হবে।

চতুর্থ পর্বে আসবে রবীন্দ্ররচনায় লোকসাহিত্যের প্রভাবের প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের অনেক রূপক, উপমা, অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন তাঁর রচনায় এবং আরো অনেক ক্ষেত্রে তার গঠনশৈলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আপন রচনার ভাষা, ছন্দ বা বাক্‌শৈলীতে তাকে আত্মীকৃত করে নিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের মূল বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশের জন্য উপরোক্ত পর্ব-বিভাজনই যথেষ্ট নয়। এজন্যে এবং আলোচনার সুবিধার্থে বর্তমান অধ্যায়ে কাব্য, নাটক, কথাসাহিত্য প্রমুখ রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ধারা অবলম্বন করে তাদের প্রত্যেকের ওপর লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের সাজুয্য পূর্বোক্ত পর্যায় ক্রমে বিশ্লেষণ করব পৃথক পৃথক ভাবে।

কাব্য

এবারে রূপকথা বিধৃত রবীন্দ্রকাব্য নিয়ে আলোচনা শুরু করে মূল প্রসঙ্গে আসা যাক।

শৈশবে রবীন্দ্রনাথ রূপকথা শুনে যে আনন্দ পেয়েছিলেন সে আনন্দ ধরা দিয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে। রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই কোথাও বিষয়বস্তুতে, কোথাও ভাববস্তুতে, কোথাও তুলনায় উপমায় রূপকথা আত্মপ্রকাশ করেছে কোনও না কোন ভাবে।

আসলে তাঁর অবচেতনার মধ্যে ছড়িয়ে ছিল রূপকথার মায়ালোক। আর তাই যখনই সুন্দর কিছু দেখেছেন, মুগ্ধ হয়েছেন, তখনই রূপকথার রসে নিমগ্ন হয়েছেন এবং রূপকথা অবলম্বন করে বাল্যস্মৃতি মিশিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। বলাই বাহুল্য, এই প্রবণতা বশে রচনা করেছেনও অনেক কবিতা। এসম্পর্কে বিশদ আলোচনার আগে কবি হৃদয়ের সুতীব্র আকূতির পরিচায়ক একটি পত্রাংশ তুলে ধরছি, —"বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম তা হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত। বেশ ছোটো নদীর কলরবের মতো, ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং ছোটোখাটো কথাবার্তার মতো, বেশ নারকেল পাতার ঝুরঝুর কাঁপুনি, আম-বাগানের ঘন ছায়া এবং প্রস্ফুটিত সর্ষে ক্ষেতের গন্ধের মতো —বেশ সাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়—অনেকখানি আকাশ আলো নিস্তব্ধতা এবং সকরুণতায় পরিপূর্ণ!" (ছিন্নপত্রাবলী)

এই পত্রটির রচনাকাল ৮ই এপ্রিল, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ। প্রায় একই সময়ে অনুরূপ

মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক রূপকথার কাহিনীকে উপজীব্য করে লিখেছেন দুটি কবিতা —'বিম্ববতী'(১২৯৮, ফাল্গুন) এবং 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' (চৈত্র, ১২৯৮)।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী অভি বা অভিজ্ঞার (হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা) মুখ থেকে শোনা একটি রূপকথা 'সোনারতরী'র 'বিম্ববতী' কবিতার মূল প্রেরণা। (নলিনী দেবীকে লেখা একটি পত্র, গ্রন্থ পরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী—ঊনবিংশ খণ্ড)

ড: সুকুমার সেন কিন্তু বলেন 'বিম্ববতী' কবিতার গল্পটি বিদেশী রূপকথার গল্প। যদিও রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রয়োজন মত এতে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত করে নিয়েছেন। ড: সেন বিশদ আলোচনা সূত্রে বলেছেন, —

"আসলে গল্পটি বাংলাদেশের অথবা ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলেরই নয়, য়াকোব ও বিলহেল্‌ম গ্রিম কর্তৃক সংগৃহীত জার্মান রূপকথা। (প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৮১২ খৃষ্টাব্দ, ইংরেজী অনুবাদ --বাছাই করা গল্পের প্রকাশ ১৮২৩)। রবীন্দ্রনাথ গল্পটি কি রূপে শুনেছিলেন জানি না। তবে গ্রিমের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে তিনি কাহিনীকে নিজের মনের মতো ছাঁট কাট করে নিয়েছিলেন।" (অমৃত, নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৬৭)

আলোচনা কালে তিনি রবীন্দ্রনাথ কৃত পরিবর্তনসমূহ দেখিয়েছেন একটি একটি করে; আরও বলেছেন, গ্রিমের গল্পের নাম 'তুষারের সাদা এক টুকরো (schnee Witteschen বা schee waisschen)।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার নাম বিম্ববতী।

অবশ্য কবি নিজে এ প্রসঙ্গে কিছু বলেননি। ড: সুকুমার সেনের আলোচনা অনুষঙ্গে মনে হয় ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁকে জেনে না জেনে জার্মান রূপকথাই হয়তো শুনিয়েছিলেন এবং ঠাকুরবাড়ীর পরিবেশে তা একেবারে অস্বাভাবিক ছিল না।

তবে একথাও ঠিক, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মূল কাহিনীর বিষয় ও ভাবটি বজায় থাকা সত্ত্বেও উপস্থাপনার গুণে একে বাংলা রূপকথার পর্যায়ভুক্ত বলেই মনে হয়।

'বিম্ববতী' সম্পর্কে আরও একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। কবিতাটিকে একদিকে যেমন রূপকথা হিসেবে গ্রহণ করা যায়, তেমনি আবার রূপক হিসেবেও উপস্থাপিত করা যেতে পারে অনায়াসে। ঈর্ষার জ্বালায় রাজকন্যা বিম্ববতীর বিমাতার মৃত্যু এবং বিম্ববতীর সঙ্গে এক অনিন্দ্য সুন্দর রাজপুত্রের মিলন আপাতভাবে কবিতাটির কাহিনী অংশ হলেও এর মধ্যে একদিকে মানুষের অহং এর তীব্রতার সঙ্গে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের নগ্নতা এবং ক্রূরতা, অন্যদিকে সৌন্দর্যের শুভ্রতার প্রসঙ্গই রূপায়িত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই রূপকটিই হয়তো কবিতাটির লক্ষ্য, রূপকথা উপলক্ষ্য মাত্র, যদিও তাই নিয়েই তার রূপসৌন্দর্য।

সোনার তরীর 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' কবিতাটিতেও অভিব্যক্ত হয়েছে রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার চিরন্তন কাহিনী। এ কবিতাটিকেও অনায়াসেই রূপকের পর্যায়ভুক্ত করা চলে। চিরকালীন মানুষের চিরন্তন প্রেমই কবিতাটির তাৎপর্যে বিদ্যমান।

রাজপুত্র ও রাজকন্যা দুটি হৃদয়ের প্রতীকমাত্র।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, রূপকথার অলৌকিক পরিবেশকে রবীন্দ্রনাথ রূপান্তরিত করেছেন আধুনিক পরিবেশে। সে জন্যে দেখি, এ কবিতার রাজপুত্র রাজকন্যাকে লাভের জন্য পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে অনেক বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম করে পার হয়নি তেপান্তরের মাঠ, সাত সমুদ্র তেরো নদী কিংবা দৈত্যপুরীতে গিয়ে রাজকন্যার ঘুম ভাঙায়নি সোনার কাঠির স্পর্শে। এখানে উভয়েই আধুনিক জীবন পরিবেশে আধুনিক নায়ক নায়িকার মত একই পাঠশালার বিদ্যার্থী —

"রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা
দুজনে দেখা হত পথের মাঝে
কে জানে কবেকার কথা।"

অবশ্য কবিতাটির শেষ স্তবকে দেখি চিরকালীন রূপকথার মতই,—

"রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে
স্বপনে দেখে রূপরাশি
রূপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
দেখিছে কার সুধাহাসি।"

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, রূপকথার মূল বিষয় অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন আধুনিক রোমাণ্টিক মনের বাসনাসিক্ত নব রূপকথা। যুগাতিক্রম করতে করতে রূপকথা এখানে বর্তমান যুগের ভাবলোকে প্রবিষ্ট হয়েছে।

এর কিছুদিন পরে রচিত 'সোনারতরী' কাব্যের 'নিদ্রিতা' (১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯) এবং 'সুপ্তোত্থিতা' (১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯) কবিতা দুটিও রূপকথার পর্যায়ভুক্ত। যদিও কবি আগের দুটি কবিতার মত এদের রূপকথা অভিধায় অভিহিত করেননি, তা সত্ত্বেও অস্বীকার করবার উপায় নেই, বিষয়বস্তুতে, মোহময় পরিবেশে, লৌকিক-অলৌকিক সম্ভব-অসম্ভব ঘটনার পারম্পর্যে এরা রূপকথাই; নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা' ও 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতাত্রয়ী মূলতঃ একই ভাবধারার বাহক।

লক্ষ্যণীয়, 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' কবিতার মত আলোচ্য কবিতাদুটিতে রাজপুত্র ও রাজকন্যা আধুনিক পরিবেশে একই পাঠশালার বিদ্যার্থী নয়। 'নিদ্রিতা'য় রাজপুত্র সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে তেপান্তরের মাঠ অতিক্রম করে অবশেষে উপস্থিত হয়েছে ঘুমের রাজ্যে এবং সেখানে নিদ্রিত পুরীতে প্রবেশ করে অনায়াসে মালা পরিয়ে দিয়েছে স্বপ্নে দেখা রাজকন্যার কণ্ঠে। আর তারপরেই 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতায় রাজকন্যা ঘুম ভেঙে উঠে ব্যাকুল বিস্ময়ে ভাবতে বসেছে, 'কে পরালে মালা!'

এছাড়া 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতার রচনারীতিতে রূপকথার বাচনভঙ্গীও পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।

বহু প্রচলিত একটি রূপকথার কাহিনীকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের

'সাতভাই চম্পা' কবিতাটি, যদিও মূল কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ রূপটি অভিব্যক্ত হয়নি উক্ত কবিতায়, তবুও এর মধ্যে রূপকথার বিষয়বস্তুগত প্রাধান্যকে অস্বীকার করা যায় না কোনমতেই। এর ছত্রে ছত্রে উৎসারিত হয়েছে রূপকথার সেই দুখিনী এক মায়ের জন্য সাত ভাই চম্পা ও পারুলদিদির অন্তহীন ব্যাকুলতা যা পাঠকের চেতনায় সঞ্চারিত করে দেয় রোমান্টিক বেদনা বোধ।

'কণিকা' কাব্যের 'চুরি নিবারণ' কবিতাটিকেও উক্ত শ্রেণীভুক্ত করা যায়। দুয়োরানীর প্রতি সুয়োরানীর ঈর্ষা অবলম্বনেই সংক্ষিপ্ত কবিতাটি রচিত।

উপরোক্ত প্রায় সমস্ত কবিতাতেই আত্মপ্রকাশ করেছে রূপকথার ইউটোপিয়ার জগৎ যার সঙ্গে রোমান্টিক মানসলোকের সম্পর্ক অতি-ঘনিষ্ঠ। অতএব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, রূপকথাশ্রিত রবীন্দ্র-কবিতাসমূহ রোমান্টিকতার একটি অনাস্বাদিত জগতের দিকেই আমাদের চালিত করে । আরও উল্লেখযোগ্য, এই কবিতাগুলো পরিণত মনের নিকট নিছক রূপকথা হিসেবেই গ্রাহ্য হয় না; এদের অন্তর্গত রূপকথার বিষয়বস্তুসমূহ আমাদের বাস্তব জীবনের কোন ঘনীভূত ব্যঞ্জনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে।

এ তো গেল বিষয়গত প্রাধান্যের কথা। এবার ভাবগত প্রাধান্যের প্রসঙ্গে আসা যাক।

রূপকথার জগতের সম্ভব-অসম্ভব লৌকিক-অলৌকিকে মেশা রহস্যময় অনুভূতি শৈশবে কবির অবচেতনায় মায়াময় কল্পলোক সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে যে রোমান্টিক কল্পনার তথা সৌন্দর্যানুভূতির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তার অন্যতম প্রেরণা যে রূপকথার মায়ালোকই রচনা করেছে কখনও প্রত্যক্ষভাবে কখনও পরোক্ষে, একথা অস্বীকার করা যায় না।

'ছবি ও গান' কাব্যের 'মাতাল' (১২৯০) কবিতায় কবির মনের যে গভীর আবেগ ও অনুভূতি এবং এক রহস্যময় সৌন্দর্যদীপ্ত অজানা রহস্যলোকের জন্য যে রোমান্টিক ব্যাকুলতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে রূপকথার আভাস সুস্পষ্ট। —

"চাঁদের কিরণ পান করে ওর ঢুলুঢুলু আঁখি,
কাছে ওর যেয়ো না,
কথাটি শুধায়ো না,
ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে বসে আছে একাকী।
ঘুমের মতো মেয়ে গুলি
চোখের কাছে দুলি দুলি
বেড়ায় শুধু নূপুর রণরনি।
আধেক মুদি আঁখির পাতা
কার সাথে যে কচ্ছে কথা।
শুনছে কাহার মৃদু মধুর ধ্বনি।
অতি সুদূর পরীর দেশে—
সেখান থেকে বাতাস এসে
কানের কাছে কাহিনী শুনায়।

কত কী যে মোহের মায়া,
প্রাণের কাছে স্বপ্ন ঘনায়।
কাছে ওর যেয়ো না,
কথাটি শুধায়ো না,
ঘুমের মেয়ে তরাস পেয়ে যাবে,
মৃদু প্রাণে প্রমাদ গণি
নূপুরগুলি রনরনি
চাঁদের আলোয় কোথায় কে লুকাবে।"

'সোনার তরী' কাব্যের 'হিং টিং ছট' (১২৯৯, জ্যৈষ্ঠ) কবিতাটিও অনেকটা এ জাতীয়। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, কবিতাটি যদিও মূলতঃ বিদ্রূপাত্মক এবং এর ব্যঙ্গের লক্ষ্য বস্তুকেও আধুনিক জীবন পরিবেশেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব, তবুও এর হবুচন্দ্র রাজা, গবুচন্দ্র মন্ত্রী, তাঁর রাজ্য ও রাজসভা এবং তাদের আজগুবি চিন্তাধারার সঙ্গে রূপকথার জগতের ফ্যানটাসীর (fantasy) ঐক্য অনুভব করা যায়।

এ কাব্যের শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' (২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩০০) কবিতায় এক বিদেশিনী সুন্দরীর অস্তিত্ব কল্পনায় রূপকথার মায়াঞ্জন স্পষ্ট। অবশ্য রবীন্দ্রকাব্যে লোকসাহিত্যের বিচার প্রসঙ্গে কবিতাটির আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। এ স্থলে সে কথা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় পরে যথাস্থানে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

তবে একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন, এ কবিতার বিদেশিনী সুন্দরী যেন দুবছর পরে লেখা 'চিত্রা' কাব্যের 'সিন্ধুপারে' (২০ শে ফাল্গুন, ১৩০২) কবিতার 'অবগুণ্ঠিতা'র পূর্বাভাস। উভয় কবিতাতেই মূলত: একই ভাবের অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়, যদিও পরবর্তী কবিতাটিতে রূপকথার ভাব ও ব্যঞ্জনা অনেক বেশী সুস্পষ্ট।

'সিন্ধুপারে' কবিতাটিতে আগাগোড়া রূপকথার মোহময় আবেশ অনুভব করা যায়। এখানে গভীর নিশীথে কৃষ্ণ অশ্বে উপবিষ্টা অবগুণ্ঠিতা রহস্যময়ীর আহ্বানে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অজানার উদ্দেশ্যে অভিযাত্রা এবং অবশেষে জনহীন সিন্ধু পুলিনে কৃষ্ণবর্ণ গুহার অভ্যন্তরস্থিত এক সুরম্য সুসজ্জিত প্রাসাদে অনুপ্রবেশের মধ্যে যে রোমাঞ্চকর অনুভূতি তা সহজেই আমাদের রূপকথার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু এ সবই বাহ্য রূপক মাত্র। রূপকথার ভাব অবলম্বনে এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এক সুগভীর তত্ত্ব — কবিতাটির শেষাংশেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই অবগুণ্ঠিতা রহস্যময়ীই হলেন রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা, নিরুদ্দেশ যাত্রার বিদেশিনী সুন্দরীও তাই।

এই তত্ত্বটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মৃত্যুর পরে 'সিন্ধুপারে' এই জীবনদেবতাই আমাকে চিরপরিচিত প্রিয় মূর্তিতে দেখা দিয়েছিলেন — আমি মিথ্যা ভয় করেছিলাম, মনে করেছিলাম যিনি আমাদের জীবন লীলাভূমির মাঝখানে আসিয়া আমাদের সহিত খেলা করিয়াছিলেন তিনি বুঝি চিরকালের মত ছুটি লইলেন, আর একজন কোন অচেনা লোক সমাজের পূর্বাপরের মাঝখানে একটা ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদ আনয়ন করিতেছে— কিন্তু সে লোকটি যেমনি ঘোমটা তুলিয়া ফেলিল অমনি দেখিলাম আমাদের সেই

চিরকালের সঙ্গীটি একটুখানি ভয় দেখাইয়া আরো যেন অধিকতর ভালোবাসার সঙ্গে কাছে টানিয়া লইল।" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বার-অ্যাট-ল কে লিখিত পত্র, ৬ই চৈত্র, ১৩০২)

এই প্রসঙ্গে একথা বলা বোধহয় অসংগত হবে না যে, রূপকথার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের জন্যই এই সুগভীর তত্ত্বটি নিছক তত্ত্ব হিসেবে প্রকাশিত না হয়ে এমন সুন্দর রূপকাবরণের মাধ্যমে অনির্বচনীয় কাব্য ব্যঞ্জনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে। পক্ষান্তরে বলা যেতে পারে, এখানে কবির পরিশীলিত মনই রূপকথার সহজ ভাব ও অনাবিল সৌন্দর্যকে নিয়ে গেছে গভীর মননশীল ভাবনাময় অসীম সৌন্দর্যলোকে।

একথা রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক কবিতা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সে সব ক্ষেত্রেও দেখা যায় রূপকথার রূপজগত কবির মনকে নিয়ে গেছে অরূপ জগতে, অসীম রহস্যলোকে। 'কল্পনা' কাব্যের 'ভ্রষ্ট লগ্ন' (৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪) কবিতায় রূপকথার সুস্পষ্ট ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়।—

"শয়নশিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল রবে।
অলস চরণে বসি বাতায়নে এসে
নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে।
এমন সময় অরুণ ধূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।
সোনার মুকুটে পড়েছে ঊষার আলো,
মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।
শুধালো কাতরে 'সে কোথায়! সে কোথায়!'
ব্যগ্রচরণে আমারি দুয়ারে নামি—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
'নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি !"

এখানে লক্ষ্যণীয়, এই কবিতায় রূপকথার ভাব ও ব্যঞ্জনা সহজে অনুভূত হলেও তার লোকায়ত রূপটির পরিচয় স্বতঃস্ফূর্ত নয়; অনেক পরিশীলিত আকারে তা পরিবেশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ কবিতার নবীন পথিক ও তার জন্যে সুগভীর রোমান্টিক ব্যাকুলতা রূপকথার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও এই নবীন পথিক আসলে সেই সত্তা রবীন্দ্রনাথ যাকে বিশ্বদেবতা বলে অভিহিত করেছেন নানা জায়গায়।

প্রায় অনুরূপ ভাবের অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় 'খেয়া' কাব্যের 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ' (১৩ই শ্রাবণ, ১৩১২) কবিতা দুটিতে। এখানেও রাজার দুলালের জন্য সংসারানভিজ্ঞা কিশোরীর ব্যাকুলতা এবং রথচক্রে তার মুগ্ধ হৃদয়ের দানটি নিষ্পেষিত হয়ে যাওয়ার মধ্যে রূপকথার সুরটি অনুরণিত হলেও, তার গভীরে নিহিত তত্ত্বটিতে পূর্বকবিতায় অভিব্যক্ত তত্ত্বের সাদৃশ্য সহজেই অনুভব করা যায়।

আবার অন্যত্রও যখন দেখি কবির বিশ্বদেবতার জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষা —

"সাড়া কারো নাইরে, সবাই
ঘুমায় অকাতরে
প্রদীপখানি নিবে গেল
দুয়ার-দেওয়া ঘরে।
তুই কেন আজ বেড়াস ফিরি
আলোয় অন্ধকারে,
তুই কেন আজ দেখিস চেয়ে
বন পথের পারে।
শব্দ কোথাও শুনতে কি পাস
মাঠে তেপান্তরে।
মাটি কোথাও উঠছে কেঁপে
ঘোড়ার পদভরে।
কোথাও ধূলো উড়ছে কি রে
কোনো আকাশ কোণে,
আগুন শিখা দেয় কি দেখা
দূরে আম্র বনে।" (জাগরণ, খেয়া)

তখনও আমরা তার মধ্যে অনুভব করতে পারি রূপকথার অনায়াস ব্যঞ্জনা।

'খেয়া' কাব্যের 'সব পেয়েছির দেশ' (৯ই আষাঢ়, ১৩১৩) কবিতাটি যে কবির রূপকথার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফসল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কবিতাটির মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রূপকথার ছাপ সুস্পষ্ট, যদিও অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে এর রস নিবিড়তর এবং এর ইঙ্গিত সুদূর প্রসারী হয়েছে। এর ভাষা ও ছন্দে যে লোকসাহিত্যের অনুকৃতি পরিলক্ষিত হয় সে প্রসঙ্গ পরে আলোচিতব্য।

এ কবিতাগুলো রচনার বহুদিন পরে কবি 'বালি' (১লা অক্টোবর, ১৯২৭ অর্থাৎ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) নামে একটি কবিতা লেখেন। তাঁর বালি দ্বীপ ভ্রমণের পর সেখানকার স্মৃতি বহন করে এটি রচিত। কবিতাটির মূল উপজীব্য প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বালিদ্বীপের আত্মিক সম্পর্ক যা বহু প্রতিকূলতায়ও বিনষ্ট হয়নি, বালিদ্বীপের অন্তরে তা ফল্গুধারার মত প্রবাহিত। পরে কবিতাটি 'সাগরিকা' নামে 'মহুয়া' কাব্যে স্থান পেয়েছে।

এ কবিতাটির মধ্যেও রূপকথার ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট। সহসা এ কবিতাটি পাঠ করলে এবং তার মূল পটভূমিকার পরিচয় অজানা থাকলে একে রূপকথাধর্মী কবিতা বলে ভুল করা একেবারে অসম্ভব নয়।—

"সাগর জলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়া ছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটির পরে কুটিল রেখা লুটিল চারিপাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে

চিকণ সোনা লিখন ঊষা আঁকিয়া দিলে স্নেহে।
মকরচূড় মুকুট খানি পরি ললাট 'পরে
ধনুক বাণ ধরি দখিণ করে
দাঁড়ানু 'রাজবেশী'
কহিনু, 'আমি এসেছি পরদেশী।''
অথবা,
''ফুরালো দিন কখন নাহি জানি,
সন্ধ্যাবেলা ভাসিল জলে আবার তরীখানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে,
প্রলয় এল সাগর জলে দারুণ ঢেউ তুলে।
লবণ জলে ভরি
আঁধার রাতে ডুবিল মোর রতনভরা তরী।''

এই সমস্ত কল্পনার পশ্চাতে রয়েছে রূপকথার পরোক্ষ প্রেরণা। অবশ্য একই সঙ্গে সংস্কৃত 'ক্লাসিক' সাহিত্যের প্রভাবও যে এখানে প্রত্যক্ষ যুক্ত হয়ে রয়েছে, সে কথাও অবশ্য স্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রমনে সংস্কৃত কাব্যের ভাব-কল্পনার সঙ্গে রূপকথার কল্পলোকের সার্থক সমন্বয়ই এরূপ সার্থক ভাব-রূপায়ণের সহায়ক হয়েছে।

রূপকথার রাজপুত্র যে কবির মনোলোক অধিকার করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় 'পরিশেষ' কাব্যের 'রাজপুত্র' কবিতায় (১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৮)। এখানে কবি 'রূপকথা-স্বপ্নলোকবাসী' রাজপুত্রকে অবলম্বন করে গভীর ভাবের জগতে অনুপ্রবেশ করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, রাজপুত্র কল্পনামাত্র নয়, অজানা রহস্যলোকের অধিবাসীও নয়। বিশেষ মুহূর্তে তার পরিচয় পাওয়া যায়, 'জানি বলে যারে জেনেছিনু তারি মাঝখানে।' আর তার পরে,

''তার ভাষা
প্রাণে দেয় আনি
সমুদ্র পারের কোন অভিনব সৌন্দর্যের বাণী।
সেদিন বুঝিতে পারে মন
ছিল সে যে নিশ্চেতন
তুচ্ছতার অন্তরালে
এতকাল মায়া নিদ্রা-জালে।
তার দৃষ্টিপাতে মোরে নূতন সৃষ্টির ছোঁওয়া লাগে,
চিত্ত জাগে।—
বলি তার পদযুগ চুমি,
রাজপুত্র তুমি।''

এর কিছুদিন পরে লেখা 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'খেলনার মুক্তি' (১৩ই আষাঢ়, ১৩৩৯) কবিতাটি গভীর ভাবনা সমৃদ্ধ সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকসাহিত্য প্রভাবিত রবীন্দ্রকাব্যেও য় তার মূল্য অপরিসীম সে কথা অস্বীকার করা যায় না কোনমতেই। কবিতাটির আবহ

রচনায়, ভাষা ও ভঙ্গীতে রূপকথা ও ছড়ার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভাষা ও ভঙ্গী এবং তার ওপর ছড়ার প্রভাব প্রসঙ্গ পরে যথাস্থানে আলোচনার অবকাশ আছে। এখন এখানে রূপকথা থেকে আহৃত ভাববস্তু কতখানি প্রাধান্য পেয়েছে সে কথাই আলোচনা করছি।

রূপকথার কাহিনী কবিতাটির মধ্যে কোথাও আত্মপ্রকাশ করেনি, যদিও তার সর্বত্রই রূপকথার সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা অনুভব করা যায়।

কবিতাটি শুরু হয়েছে মণিদিদির জাপানী পুতুল হানাসানের বিবাহের উদ্যোগ দিয়ে। ঘটনাটি একান্তভাবেই বাস্তব এবং তার পরিবেশটিও নিঃসন্দেহে আধুনিক। কিন্তু চামচিকের সহায়তায় হানাসানের মেঘেদের রাজ্যে অন্তর্ধানের মধ্যে একটি সুগভীর তত্ত্ব নিহিত থাকলেও এই অসম্ভব আজগুবি কল্পনার পশ্চাতে রয়েছে রূপকথার fantasyর পরোক্ষ প্রেরণা। তারপর যখন দেখি,—

"মণি দিদি এসে দেখে পালঙ্কে তো নেই হানাসান।
কোথা গেল, কোথা গেল!
বটগাছে আঙ্গিনার পারে
বাসা করে আছে ব্যাঙ্গমা;
সে বলে, 'আমি তো জানি,
চামচিকে ভায়া
তাকে নিয়ে উড়ে চলে গেছে।'
মণি বলে, 'হেই দাদা, হেই ব্যাঙ্গমা,
আমাকেও নিয়ে চলো, —
ফিরিয়ে আনি গে।'
ব্যাঙ্গমা মেলে দিল পাখা;
মণি দিদি উড়ে চলে সারারাত্রি ধরে।"

তখন অনুমান করতে কোন বাধা থাকেনা যে এর মধ্যে আধুনিক জীবন পরিবেশ এবং লৌকিক চরিত্র ও সম্ভাব্য ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে রূপকথার ইউটোপিয়ার জগত আর সেখানকার অলৌকিক চরিত্র ও অসম্ভব ঘটনা একাকার হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, কবিতাটির শেষ পর্যন্ত তার পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট।

বলাই বাহুল্য, কবিতাটি রূপক মাত্র। এই রূপকের অন্তরালে যে তত্ত্বটি অভিব্যক্ত তা হল, খেলনার শৃঙ্খলমুক্ত খেলার মধ্যেই মুক্তির প্রকৃত আনন্দকে এবং সৃষ্টিকর্তার বৃহৎলীলার মাধুর্যকে আস্বাদন করা যায়। আর মানুষের দৈনন্দিন জীবনের টুকরো টুকরো হাসি কান্নার যে খেলা তা এই বৃহৎ লীলারই অংশমাত্র, সৃষ্টিকর্তার নিকট তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা সত্তা নেই।

সুতরাং অস্বীকার করবার উপায় নেই, কবিতাটির রূপকল্পনা এবং রূপকার্থ দুইই অসামান্য; আর তার মূলে রূপকথা প্রেমিক কবি মনের প্রেরণা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

আবার শেষ জীবনে লেখা (১৩৪৬) একটি কবিতায় দেখি প্রত্যক্ষভাবে রূপকথার

জগতে তাঁর কল্পনার অবাধ অভিসার। অবশ্য এখানে কোন গভীর ভাব বা তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেনি। কবিতাটির 'রূপকথায়' নামটিও এ সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

এবার শিশু (১৩১০) এবং শিশু ভোলানাথ (১৩২৯) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত রূপকধর্মী কবিতার প্রসঙ্গে আসা যাক। বর্তমান আলোচনায় এ দুই কাব্যের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; এবং এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ দুই কাব্যের রচনাকালীন ব্যবধান দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও উভয় কাব্যস্থ কবিতাসমূহের আলোচনা একসঙ্গে করাই সমীচীন বলে বোধ করছি, কেননা লোকসাহিত্য-প্রাসঙ্গিক আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এরা মূলতঃ সমগুণসম্পন্ন। তাছাড়া একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, এ পর্যন্ত আলোচিত রূপকথা-ভাবধর্মী কবিতা সমূহের সঙ্গে এদের মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

বস্তুতঃ, আমাদের আলোচ্য কাব্য দুটি শিশু-বিষয়ক। সুতরাং ,স্বাভাবিক ভাবেই এদের মধ্যে শিশু ও শিশু মনস্তত্ত্বের সবিশেষ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আবার শিশুর সঙ্গে রূপকথার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ হওয়ায় এদের অন্তর্গত অনেক কবিতাতেই রূপকথার ভাব ও রূপজগৎ আত্মপ্রকাশ করেছে অনায়াসে; বলাই বাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশু মানসিকতার ভাবানুষঙ্গেই তার পরিচয়। এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়, শিশু রবীন্দ্রনাথের অনেক ভাবনা-কল্পনা এবং রহস্যময় অনুভূতির স্মৃতি পরবর্তীকালে কবি রবীন্দ্রনাথকে শিশুমনের রহস্য উদঘাটনে ও তার মানস রাজ্য অর্থাৎ রূপকথার কল্পজগৎকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করেছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই আলোচ্য কবিতা সমূহে শিশু এবং তার কল্পজগৎ এমন সুষম সুন্দর রূপ লাভ করেছে। পক্ষান্তরে পূর্বালোচিত কবিতাসমূহে অভিব্যক্ত রূপকথার ভাববস্তুতে পরিণত মানসিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। সেখানে সর্বত্রই রূপকথার অন্তরালে নিহিত রয়েছে এমন সব সুগভীর তত্ত্ব যা একান্তভাবেই কবির পরিণত মনের চিন্তাশীলতার ফসল। অবশ্য 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যের অন্তর্গত এ জাতীয় কবিতা সমূহে শিশু মনের সহজ সারল্য, কল্পনা প্রবণতা ও চিন্তাধারার সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের মননশীলতা যে একেবারে যুক্ত হয়নি এমন কথা বলা চলে না। তবে এক্ষেত্রে তা ততটা প্রধান হয়ে উঠতে পারেনি যতটা পেরেছে শিশুমনের কল্পনার ক্ষেত্রটি।

একথা সর্বজনবিদিত, শিশুমনে নেই কোন সংশয়-অসংশয়ের দ্বন্দ্ব, নেই লৌকিক-অলৌকিক, সম্ভব-অসম্ভবের প্রভেদ। যে জগতে তার মানস অভিযাত্রা চলে অব্যাহত গতিতে তা রূপকথারই কল্পলোক - বাস্তব জগতের সঙ্গে তার কোন মিল নেই এবং পরিণত মনের নিকট তা অলীক কল্পনা মাত্র। অথচ শিশুর নিকট এ জগত পরম সত্য, প্রকৃত বাস্তব জগতই তার কাছে অ-প্রকৃত। সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এই অসম্ভব, অলৌকিক রাজ্যের অস্তিত্ব অনুভব করে এবং আনন্দিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'এ হল শিশুর 'মনের লীলা' কিছুই না নিয়ে তার সৃষ্টি, তার আনন্দ'। এবং শিশুর এই কিছুই না নিয়ে সৃষ্টির আনন্দ রূপায়িত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। শুধু তাই নয়, অনেক প্রবন্ধেও বিষয়টি ব্যাখ্যাত হয়েছে সুনিপুণ কৌশলে।

শিশুমনের এই লীলার মাধুর্যকে উপলব্ধি করা বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত সহজ-সাধ্য নয়। কারণ তারা সম্পূর্ণ ভিন্নলোকের অধিবাসী, তাদের কল্পনার ধারাও ভিন্নরূপ।

কবি এই কথাই বলেছেন, তাঁর একটি কবিতায়। তাঁর মতে শিশু থাকে 'জগৎমায়ের অন্তঃপুরে' যেখানে, —

"সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে
সূর্যশশী
খোকার সাথে হাসে, যেন
একবয়সী
সত্যবুড়ো নানা রঙের
মুখোশ পরে
শিশুর সনে শিশুর মতো
গল্প করে।।"

(ভিতরে ও বাহিরে, শিশু)

এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা থাকে জগৎ-পিতার বিদ্যালয়ে। আর সেখানে দেখা যায় —

"জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে চলে
সূর্যশশী
নিয়ম থাকে বাগিয়ে লয়ে
রশারশি।" (তদেব)

শুধু তাই নয়, কবি সুকৌশলে এই দুই অসম রাজ্যের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন বাস্তব পৃথিবীতে, —

"চাঁপার ডালে চাঁপা ফোটে
এমনি ভাবে
যেন তারা সাত ভায়েরে
কেউ না জানে।
....
দিঘি থাকে নীরব হয়ে
দিবা রাত্র,
নাগকন্যের কথা যেন
গল্প মাত্র।
সুখ দুঃখ এমনি বুকে
চেপে রহে।
যেন তারা কিছুমাত্র
গল্প নহে।" (তদেব)

অথচ শিশুর জগতে তার বিপরীতই ঘটে থাকে অবলীলাক্রমে। কারণ সে জগত রূপকথার রাজ্য এবং উক্ত কবিতাটিতে তা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত।

এ রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান যে কোথায় তা সকলেরই অজানা। পরিণত মনে তো এর অস্তিত্ব সম্পর্কেই যথেষ্ট সংশয়। কিন্তু শিশুচিত্তবিহারী কবি বলেন, "খোকার

মনের ঠিক মাঝখান ঘেঁষে যে পথ গিয়েছে সৃষ্টি শেষে" সেই পথ ধরে যাত্রা করলেই "সকল উদ্দেশ হারা সকল ভূগোল ছাড়া এই অপরূপ অসম্ভব দেশে" উপস্থিত হওয়া যায়। আর সেখানে এমন সব ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায় ইতিহাসে যার পরিচয় মেলে না। (খোকার রাজ্য, শিশু)।

এই হল কবির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা শিশুর মানসরাজ্য। এবার শিশুর দৃষ্টিতে তার পরিচয় লাভের চেষ্টা করা যাক। আমরা জানি, প্রত্যক্ষ জগত সম্বন্ধে শিশুর মনে কিছুটা দ্বিধা ও অবিশ্বাস থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ এই কল্পনার জগতের বিষয়ে তার মনে কোন সংশয়ই নেই। তাই সে অনায়াসেই বলতে পারে, "ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে" সেখানেই সাতমহলা পুরীতে 'তেপান্তরের পরপারবর্ত্তিনী রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে, এবং উপকথার রাজ্যের নাপিতভায়া, শেয়াল ভায়াও থাকে ঐ ছাদেই। সে আরও বলে, ঐ ছাদের কোণেই গভীর বনে অবস্থিত রাক্ষসদের ঘর এবং সেখানে নিদ্রিতা রাজকন্যার ঘুম ভাঙায় স্বয়ং শিশুই সোনার কাঠির পরশ লাগিয়ে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, শৈশবে বাড়ীর ছাদের নিভৃত অংশ রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করত গভীরভাবে এবং তাঁর বাল্যসঙ্গিনীর মুখে শোনা তাঁদের বাড়ীর অভ্যন্তরস্থিত অজানা অদেখা রাজবাড়ীর রহস্য তাঁর শিশুমনকে নিয়ে যেত রূপকথার মায়ালোকে। 'শিশু' কাব্যের রাজার বাড়ি এবং শিশু ভোলানাথ কাব্যের জ্যোতিষী কবিতাটির অংশ বিশেষের ভাব কল্পনার পশ্চাতে অনেকখানি পরিমাণে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ঐ রাজবাড়ীর রহস্যময় স্মৃতির পরোক্ষ প্রেরণা।

'শিশু ভোলানাথ' কাব্যের 'ঘুমের তত্ত্ব' কবিতায় (২৭ শে আশ্বিন, ১৩২৮) দেখা যায় যে, শিশু নিজে তো এই সব অসম্ভব রাজ্য ও সেখানকার অধিবাসীদের অস্তিত্ব কল্পনা করেই; তদুপরি কেউ যদি এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনরকম সন্দেহ প্রকাশ করে তবে সে বিস্মিত হয়ে বলে ওঠে, —

"নেই তবুও আছে এমন
নেই কি কত জিনিস?"

এবং 'নেই অথচ আছে' এমন সব জিনিসের প্রত্যক্ষ গোচরীভূত না হওয়ার কারণ সম্পর্কিত সুগভীর তত্ত্ব প্রকাশেও সে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। তার মতানুসারে 'ঘুমের তলায় তলিয়ে থাকে' বলেই সিঁড়ির নীচের ঘরে বসবাসকারিণী রাজকন্যাকে দেখা যায় না; 'নাপিত ভায়া', 'শেয়াল ভায়া', 'ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী' ও আমাদের দৃষ্টিপথে আসে না ঐ একই কারণে। আবার মাঝে মাঝে সে আশঙ্কিত হয়ে মাকে বলে, ঘুম ভাঙার পর যদি—

"নাপিত ভায়া, শেয়াল ভায়া,
ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী
ভিড় করে সব আসবে যখন
কি যে করবে তুমি।"

বলা বাহুল্য, এ আশঙ্কার নিরসনও করে শিশু নিজেই। কবিতাটির শেষাংশেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রকাব্যে শিশুর কল্পনায় রূপকথার ভাব ও জগৎ কিভাবে ধরা দিয়েছে তারই একটি রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা এ পর্যন্ত করা গেল।

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এখানেই শিশু কল্পনার পূর্ণ পরিসমাপ্তি নয় বা কেবলমাত্র এই উপলব্ধিটুকুতেই শিশুমন সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে না। তাঁর অনেক কবিতাতেই দেখা যায় দূরত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিত শিশু মাঝে মাঝেই কারণে অকারণে সুদূরের অভিলাষী হয়ে উঠেছে; যাকে সে সম্পূর্ণ জানতে পারেনা—বহুলাংশেই যা তার নাগালের বাইরে সেই অনির্দেশ্য রহস্যালোক তার কাছে রূপকথার জগতের বাণী বহন করে নিয়ে এসেছে বিশেষ কোন মুহূর্তে। 'খেলা-ভোলা' কবিতাটিতে যেমন দেখি, কোনও এক শারদ প্রভাতে ছুটির দিনে দূর থেকে ভেসে আসা সানাইয়ের সুর শিশুর মনকে উতলা করে তুলেছে। আবার কোনো শীতের মধ্যাহ্নে "দূরে কোন বাড়ীর ছাদে ছোট্ট মেয়েকে বেগনি রঙের শাড়ী রোদ্দুরে দিতে দেখেও তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছে এক অপ্রত্যক্ষ রূপলোক। তার মনে হয়েছে ঐখানেই বুঝি তেপান্তরের পার এবং ঐখানেই আছে রাজার বাড়ী। এমনকি সে আকুল হয়ে ভেবেছে, তার যদি একটা 'পক্ষীরাজের বাচ্চা ঘোড়াও' থাকত তাহলেও সে পাড়ি জমাতে পারত তেপান্তরের মাঠের উদ্দেশ্যে, এবং প্রযোজন বোধে না হয় ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কাছ থেকে পথের নির্দেশও নিয়ে যেত।

এর সঙ্গে অনায়াসেই তুলনা করা যায় কবির শৈশব-স্মৃতির। সেখানেও দেখি, কোনও কোনও নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর তাঁর মন ভোলাত সহজেই এবং শহরের দূরবর্তী বাড়ীগুলো তাঁর নিকট রহস্যময় রূপে প্রতিভাত হত, তার মধ্যে তিনি যেন শুনতে পেতেন সুদূরের আহ্বান। জীবন স্মৃতিতে তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন, "দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম—চোখে পড়িত আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেলশ্রেণী; তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত 'সিঙ্গির বাগান' পল্লীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধারে যে তারা গয়লানী আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়ালঘর, আরো দূরে দেখা যাইত তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্ন রৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সকল অতিদূর বাড়ির ছাদে এক একটা চিলেকোঠা উঁচু হইয়া থাকিত; মনে হইত তাহারা যেন নিশ্চল তর্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সংকেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজভাণ্ডারের সিন্দুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্নমাণিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ওই অজানা বাড়িগুলিকে কত খেলা ও কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাই-করা মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাথার উপরে আকাশের খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া 'চাই চুড়ি চাই, খেলনা চাই' হাঁকিয়া যাইত — তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।"

(জীবনস্মৃতি)

শৈশবের এই ধরনের আরও অনেক বিচিত্র অনুভূতিকে কবি তাঁর শেষজীবনে লেখা

'আকাশ প্রদীপ' গ্রন্থের ধ্বনি (২১।১০।৩৮) কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। সেখানেও দেখা যায় নির্জন দুপুরে চিলের সুতীক্ষ্ণ ডাক বালক রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে চঞ্চল করে তো তুলতই, সেই সঙ্গে অলিগলি তাঁর শিশুমনকে 'বোগদাদের বসোরার পরদেশী পসরার স্বপ্নে' বিভোর করে তুলত। তদুপরি আরও বলেছেন,

"বাতায়ন কোণে
নির্বাসনে
যবে দিন যেত বয়ে
না চেনা ভুবন হতে ভাষাহীন নানা ধ্বনি লয়ে
প্রহরে প্রহরে দূত ফিরে ফিরে
আমারে ফেলিত ঘিরে।
জনপূর্ণ জীবনের আবেগ পৃথ্বী নাট্যশালে
তালে ও বেতালে
করিত চরণপাত,
কভু অকস্মাৎ
কভু মৃদু বেগে ধীরে
ধ্বনি রূপে মোর শিরে
স্পর্শ দিয়ে চেতনারে জাগাইত ধোঁয়ালি চিন্তায়
নিয়ে যেত সৃষ্টির আদিম ভূমিকায়।
চোখে-দেখা এ বিশ্বের গভীর সুদূরে
রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে
ছন্দের মন্দিরে বসি রেখা-জাদুকর কাল
আকাশে আকাশে নিত্য প্রসারে বস্তুর ইন্দ্রজাল।
যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়,
শুধু যেথা কত কী যে হয়—
কেন হয় কিসে হয় সে প্রশ্নের কোনো
নাহি মেলে উত্তর কখনো।"

অস্বীকার করবার উপায়ও নেই, খুব সুস্পষ্ট রূপে না হলেও রবীন্দ্রনাথের নিজের শৈশবের এই সব বিচিত্র অনুভূতির সঙ্গে পূর্বোক্ত 'খেলা ভোলা' কবিতায় অভিব্যক্ত শিশুর আত্মোপলব্ধির সাদৃশ্য অনুভূত হয় সহজেই।

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরবাড়ীর বালকদের বাড়ীর বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল, এমনকি বাড়ীর ভেতরেও যে সর্বত্র তাঁদের অবাধগতিবিধি ছিল তাও নয়। কবি নিজেই বাল্য স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন, ভৃত্যদের মহলে 'শ্যামের গণ্ডী'তে আবদ্ধ হয়ে তাঁর অনেক সময়ই অতিবাহিত হত। এই সময় গৃহকোণে আবদ্ধ বালক রবীন্দ্রনাথ বাহির বিশ্বকে দেখতেন আড়াল আবডাল থেকে, দূরত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হলেও তা পূরণ করে নিতেন কল্পনার সাহায্যে। তদুপরি নানাজনের মুখ

থেকে শোনা রূপকথা-উপকথার কাহিনীগুলোও তাঁর সুদূর মানসাভিসারে সহায়তা করত অনেকটাই। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে বা কোন কোন আত্মস্মৃতিমূলক কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে দেখি অনেক সময়ই কল্পনা প্রবণ শিশু রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অনায়াসেই রূপকথার জগতের নায়করূপে কল্পনা করে নিয়েছেন আর সেইসঙ্গে তাঁর মন অবাধে বিচরণ করেছে সুদূর রহস্যলোকে, অজানার উদ্দেশ্যে—কখনও পালকীতে চড়ে, কখনও বা ময়ূরপঙ্খীতে কিম্বা ঘোড়ায়; আবার কখনও সম্মুখীন হয়েছেন ডাকাত দলের, কখনও বা বাঘের। এমনকি এইসব বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম করার সময় তিনি রোমাঞ্চকর শিহরণও অনুভব করেছেন অনায়াসেই।

মনে হয় তখন থেকেই সুদূরের প্রতি, অনির্দেশ্য রহস্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের মূল সুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর শিশু বিষয়ক বিভিন্ন কবিতায় তার আভাস পাওয়া যায়। নিজের শৈশবের সুদূর দিগন্তশায়ী রূপকথার রাজ্য স্মরণ করে কবি শিশু রহস্যলোক কল্পনা করেছেন এবং দেখা যায় এ সমস্ত কবিতায় শিশুও তাঁরই মত নিজেকে রূপকথার নায়কে পরিণত করতে কোন দ্বিধা করেনি।

সেই জন্য দেখা যায়, কখনও শিশু কল্পনায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে 'ডাকাত হানা' মাঠের মধ্যে দিয়ে জোড়াদিঘির পাড় ঘেঁষে পাড়ি জমায় সুদূরের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে অবশ্যই পাল্কীতে তার মাতাও থাকেন। এই যাত্রা পথেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ডাকাত দলের সঙ্গে তার সংঘর্ষও ঘটে যায়। আর তারপরে তার মাতা এবং পাল্কী বাহকগণ যখন ভীত সন্ত্রস্ত তখনই সে অবলীলায় সকলকে পরাভূত করে মায়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু এত বীরত্ব প্রদর্শনের পরও মাতার আদর উপভোগের ও তাঁর ক্রোড়ে উপবেশনের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষাও বীরপুরুষ এই শিশুটির কল্পনায় বাদ যায় না। সবশেষে তাকে আক্ষেপের সুরে একথাও বলতে শোনা যায়, —

"রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা
এমন কেন সত্যি হয় না, আহা।
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে।
শুনত যারা অবাক হত সবে,
দাদা বলত, কেমন করে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে।
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে
ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।" (বীরপুরুষ, শিশু)

আবার 'পথহারা' কবিতায় দেখি শিশু স্বপ্নে পথ হারিয়ে এমন এক জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে যেখানে উপকথার গল্পের আতঙ্ক জমা হয়ে আছে, সেখানে কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যায় না, বোঝা যায় না এবং একটা অস্পষ্ট ভয়ের উপলব্ধি জাগে।

এখানেই শেষ নয়। শিশু রাজগঞ্জের মধুমাঝির নৌকো খানাকে ময়ূরপঙ্খীতে পরিণত করে যেতে চায় সাত-সমুদ্র তের নদীর পারে। আবার কখনও কোনও বর্ষার দিনে তার মনে হয়, বাবার খাতা থেকে ছেঁড়া কাগজে তৈরী নৌকো দিয়েই তার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ

হবে অনায়াসে।

আরও উল্লেখযোগ্য এই মানস অভিযাত্রার সময় শিশু নিজেকে রাজপুত্র বলেই মনে করে আর তার নৌকোও ভরা থাকে সোনা মাণিকে। কিন্তু এই যাত্রাপথে যাদের সে সঙ্গে নিতে চায় তারা কেউই মন্ত্রীপুত্র বা কোটালপুত্র নয়, তারা তার খেলার সঙ্গী আশু ও শ্যাম। আর এই মানস ভ্রমণের জন্য সে সময়ও বেশী চায় না। সে অনায়াসে বলে,

"ভোরের বেলা দেব নৌকো ছেড়ে,
দেখতে দেখতে কোথায় যাব ভেসে
দুপুর বেলা তুমি পুকুর ঘাটে
আমরা তখন নতুন রাজার দেশে।
পেরিয়ে যাব তিন পূর্ণির ঘাট
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠ,
ফিরে আসতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে,
গল্প বলব তোমার কোলে এসে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তের নদীর পার।" (নৌকা যাত্রা, শিশু)

আর সবচেয়ে বড় কথা, শিশু সেই অসম্ভব রাজ্যে বাণিজ্য যাত্রা করার আগ্রহাতিশয্যে কিন্তু প্রিয়জনদের কথা বিস্মৃত হয় না একেবারে; এমনকি সেখান থেকে দুর্লভ এবং আশ্চর্য সব দ্রব্যসামগ্রী এনে তাদের উপহার দেবার প্রলোভনও দেখায়। (দুঃখহারা)

শিশু মানসিকতা ও রূপকথার ভাবের প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ রূপকথার সুয়োরানী অপেক্ষা দুয়োরানীই শিশুমনকে আকর্ষণ করে বেশী। তাই দেখা যায় দুয়োরানী কবিতায় শিশু তাঁর মাকে দুয়োরানীর স্থলাভিষিক্ত করার ঐকান্তিক বাসনা প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। তার মনে হয়, তার মা সত্যি সত্যি দুয়োরানী হলে তার রূপকথার রাজ্যে অবাধ বিচরণ খুবই সহজসাধ্য হত, এবং তাহলে রূপকথার রাজপুত্রের মতই তার হাতে থাকত ধনুক বাণ এবং তার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত রাক্ষস ও বাঘ ভাল্লুকরা গভীর বনমধ্যস্থিত তাদের কুঁড়ে ঘরের নিকটে আসতে সাহস পেত না একেবারে।

কিন্তু এখানেও লক্ষ্যণীয়, শিশু তার মাকে দুয়োরানী রূপে কল্পনা করলেও সেই দুয়োরানী মায়ের মুখ থেকে নতুন রূপকথা শোনার আগ্রহ প্রকাশ করতেও ভোলে না।

আসলে শিশুর রূপকথা শোনার আগ্রহ চিরন্তন এবং এই চিরন্তন আগ্রহকে রবীন্দ্রনাথ রূপায়িত করেছেন নানাভাবে ভিন্ন ভিন্ন কবিতায়।

তাই দেখা যায়, কোন কোন মেঘলা অথবা বর্ষার দিনে সময়ে অসময়ে শিশু তার মায়ের মুখে রূপকথার গল্প শুনে ছুটির আনন্দ উপভোগ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে; এবং তখন তার স্পষ্ট করে বলতেও বাধে না, —

"আজকে আমি লুকিয়েছি মা,
পুঁথিপত্তর যত —

পড়ার কথা আজ বোলো না।
যখন বাবার মতো
বড়ো হব তখন আমি
পড়ব প্রথম পাঠ—
আজ বলো মা, কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।" (ছুটির দিনে, শিশু)

বলাই বাহুল্য, রূপকথা শিশুর নিকট পুরনো হয় না কোনদিনই, এমনকি একই গল্প বারবার শুনলেও না। আর এই গল্প শোনার আগ্রহাতিশয্যে অনেক সম্ভব অসম্ভব ভাবনা কল্পনা তার মনে স্থান পায় অনায়াসে। 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যের 'সময়হারা' কবিতাটিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে দেখি, শিশু সহজেই সময়ের গতি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারে এবং এজন্যে সে উল্লসিতও হয়ে ওঠে। কারণ তার ধারণা, এমন হলে তার মায়ের গল্প বলার বেলা কখনও ফুরোবে না, এবং রাত হবে না বা রাত শেষ হবে না কোনমতেই।

এছাড়াও আরও অন্যভাবে এবং আশ্চর্যরকমে শিশু রূপকথার আস্বাদ লাভ করতে চায়; আর যেহেতু তার মনে বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে কোন সুচিহ্নিত সীমারেখা নেই তাই সে অনায়াসে বলতে পারে —

"মা যদি তুই আকাশ হতিস,
আমি চাঁপার গাছ,
তোর সাথে মোর বিনি কথায়
হত কথার নাচ।

উড়ো মেঘের ছায়াটি তোর
কোথায় থেকে এসে
আমার ছায়ায় ঘনিয়ে উঠে
কোথায় যেত ভেসে
সেই হত তোর বাদল বেলার
রূপকথাটির মতো,
রাজপুত্তুর ঘর ছেড়ে যায়
পেরিয়ে রাজ্য কত।
সেই আমারে বলে যেত
কোথায় আলেক-লতা
সাগর পারের দৈত্য পুরের
রাজকন্যার কথা।
দেখতে পেতেম দুয়োরানীর
চক্ষু ভর ভর

শিউরে উঠে পাতা আমার
কাঁপত থরো থরো।'

(বাণী বিনিময়,শিশু ভোলানাথ)

এইসব থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, শিশুমনে রূপকথার মূল্য কত বিচিত্রচারী অতিকল্পনা পুলকিত। রবীন্দ্রনাথ শিশু মনস্তত্ত্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আপন সূক্ষ্ম, স্পর্শ-কাতর রোমান্টিক ভাবনাকে অপরূপ রূপ দিয়েছেন শিশুরই অনুভবের ভাষায়। শিশুর জগত আর কবির জগতে এই সার্থক সমন্বয়ের সেতু বন্ধন করেছে কবিমনে আবাল্য বিকশিত রূপকথা প্রীতি। কিন্তু শিশুর অনুভব আর লোকোত্তর প্রতিভার পরিশীলিত ভাবজগতের ব্যবধান দুস্তর। এই সব কবিতায় সেই ফাঁক তিনি ভরাট করে দিয়েছেন কবিমন আর শিশুমনের মধ্যে আশ্চর্য লুকোচুরি খেলার কৌশলে। শিশু তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে রূপকথার মাধুর্য ও রস অনুভব করে থাকে। কিন্তু যা তার কাছে দুর্বোধ্য, সাহিত্য জগতে তার যত মূল্যই থাক না কেন শিশুর কাছে তার কোন মূল্যই নেই। এই সূত্রেই 'সমালোচক' কবিতায় দেখি রূপকথা নয় বলে শিশু তার বাবার রচনার প্রতি কোন রকম আকর্ষণ তো অনুভব করেই না উপরন্তু তার সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে।

এবারে আমরা সেই সমস্ত রবীন্দ্র কবিতার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে প্রয়াসী হব, রূপকথা প্রভাবিত কবিতা হিসেবে যাদের মূল্য পূর্ব আলোচিত কবিতা সমূহের ন্যায় অপরিমেয় অথচ তাদের প্রযুক্তিগুণে ধরা দিয়েছে নতুন রস সৌন্দর্য। পূর্ব আলোচিত কবিতা সমূহে দেখেছি রূপকথার কাহিনী, বিষয়বস্তু বা ভাবই সেখানে সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে; কিন্তু এ জাতীয় কবিতায় তা হয়নি; তার পরিবর্তে এখানে সর্বত্রই দেখি, কবিতার মূল ভাববস্তুর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করে রূপকথার রসলোক কখনও প্রত্যক্ষ কখনও বা আভাসে ইঙ্গিতে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে।

এই সূত্রে প্রথমেই স্মরণীয় প্রভাতসঙ্গীত কাব্যের অন্তর্গত 'পুনর্মিলন' (১২৯৮, চৈত্র) কবিতাটি। অন্য দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথের সমগ্র লোকসাহিত্য প্রভাবিত কবিতার ক্ষেত্রে উক্ত কবিতাটি একটি বিশিষ্ট মর্যাদালাভের অধিকারী। কারণ এটিই হল সেই কবিতা যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম রূপকথা তথা লোকসাহিত্যকে স্থান দিয়েছেন এবং বলা যেতে পারে, পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন কবিতায় লোকসাহিত্যের যে বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তার সূচনা এখানেই।

তাই এবারে উক্ত কবিতাটিতে রূপকথা কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং তার প্রয়োগ কতখানি সার্থক ও সামঞ্জস্য পূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

জীবনের বিশেষ মুহূর্তে প্রকৃতির সঙ্গে পুনর্মিলনজনিত এক আনন্দময় অনুভূতির প্রভাবে কবির চিত্ত যেভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তা অভিব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি এ কবিতায় নিজের শৈশবের প্রকৃতি প্রীতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন। আর তাঁর শৈশবের নিসর্গচেতনার সঙ্গে রূপকথার মায়ালোক ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল বলেই রূপকথার প্রসঙ্গও সেই সূত্রে এসে পড়েছে অনিবার্যভাবে, যদিও তা খুবই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে ও কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতির ভূমিকা অসামান্য। প্রকৃতি তাঁর কাছে সবচেয়ে জীবন্ত এবং সবচেয়ে সত্য সত্তারূপে প্রতিভাত। শিশুকাল থেকেই এর সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় ও সহজযোগ; এবং তখন নিসর্গের সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্য বালক রবীন্দ্রনাথের নিকট রূপকথার অপরূপ রাজ্যের বাণী বহন করে আনত—বর্তমান প্রসঙ্গে সে কথাই আমাদের বিশেষভাবে আলোচিতব্য। তারপরে যৌবনের প্রারম্ভে হৃদয়ের সহজ তাড়না বশে কবির জীবনের সঙ্গে বহির্জগতের এই কল্পলোকের আন্তরিক যোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর সেজন্য কবি তীব্র বিচ্ছেদ বেদনাও অনুভব করতে থাকেন। অবশেষে হঠাৎ একদিন হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারটি ভেঙে যাওয়ায় আবার তিনি শিশুকালের বিশ্বকে ফিরে পেলেন। শুধু যে পেলেনই তা নয়, বিচ্ছেদের ব্যবধানের সূত্র ধরে তার পূর্ণতর পরিচয় হৃদয়কে আলোড়িত করে তুলল এবং আনন্দে কবি উদ্বেল হয়ে উঠলেন। 'পুনর্মিলন' কবিতায় কবি হৃদয়ের এই পুলকোচ্ছ্বাসকেই রূপায়িত করতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং এই উপলক্ষ্যে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিচেতনার সহজ মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন — জীবনের এই তিনটি স্তরকেই উন্মোচিত করে দেখিয়েছেন।

পরবর্তীকালে (১৩৪০) 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর হৃদয়ের এই অনির্বচনীয় অনুভূতিকে ঔপনিষদিক তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সে সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ 'পুনর্মিলন' কবিতায় কাব্যবাণী মূলতঃ অনুভূতি রূপেই ব্যক্ত হয়েছে, তত্ত্বরূপে নয়। তাছাড়া কবিতাটির অন্তর্গত রূপকথার প্রসঙ্গটুকুই আমাদের প্রধান বিচার্য বিষয়। সুতরাং রূপকথার বিষয় অবতারণার মূল সূত্ররূপে পূর্বোক্ত অনুভূতির প্রকাশ সম্পর্কে যতটুকু বলা প্রয়োজন ততটুকুই বলব, তার অধিক কিছু নয়। এবার মূল বক্তব্যে অর্থাৎ বালক রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যে রূপকথার রহস্য-অনুভবের কথায় আসা যাক।

শৈশবের নিসর্গ প্রীতির কথা বলতে গিয়ে 'পুনর্মিলন' এর একস্থানে তিনি বলেছেন, তাঁদের পুকুরের —

"পূর্বধারে বৃদ্ধ বট
মাথায় নিবিড় জট
ফেলিয়া প্রকাণ্ড ছায়া দাঁড়ায়ে রহস্যময়।
আঁকড়ি শিকড় মুঠে
প্রাচীর ফেলেছে টুটে,
খোপে খাপে ঝোপে ঝাপে কতনা বিস্ময় ভয়।
বসি শাখে পাখি ডাকে সারাদিন একতান —
চারিদিকে স্তব্ধ হেরি কী যেন করিত প্রাণ।
মৃদু তপ্ত সমীরণ গায়েতে লাগিত এসে,
সেই সমীরণ স্রোতে কত কী আসিত ভেসে।
কোন্ সমুদ্রের কাছে

মায়াময় রাজ্য আছে,
সেথা হতে উড়ে আসে পাখির ঝাঁকের মতো
কত মায়া, কত পরী, রূপকথা কত শত।"

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পুষ্করিণী তীরবর্তী বটগাছটি কুহক জালে মণ্ডিত হয়ে বালক কবিকে আকর্ষণ করত গভীরভাবে; এবং এ কথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে, যদি রবীন্দ্রনাথ শৈশবে রূপকথার সঙ্গে পরিচিত না হতেন তবে ঐ বটগাছ তথা প্রকৃতি তাঁর কাছে এমন রহস্যময় রূপে দেখা দিত না এবং হয়তো তাঁকে এমন গভীরভাবে আকর্ষণও করত না। আবার অন্যভাবে বলা যেতে পারে, প্রকৃতির সঙ্গে যদি এ সময় তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে না উঠত তবে রূপকথা কবির কল্পনায় এমন সত্যরূপে প্রতিভাত হত না বা তাঁর চেতনায় অনুরূপ সাড়া জাগাতে পারত না। বস্তুতঃ শিশু রবীন্দ্রনাথের চেতনায় রূপকথা ও প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং ঐ সময়কার প্রকৃতি প্রীতির চিত্র অঙ্কন কালে রূপকথার অবতারণা স্বাভাবিক; এবং অস্বীকার করবার উপায় নেই, এখানে তার প্রয়োগ সার্থক ও সুসমঞ্জস হয়েছে।

কয়েক বৎসর পরে লেখা 'পুরোনো বট' (১২৯২, ভাদ্র) কবিতায় পুনর্মিলনের সুর শোনা যায়। এখানেও দেখি, ঐ বটগাছকেই উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, —

"নিশি দিশি দাঁড়িয়ে আছ
মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে
ওগো প্রাচীন বট।

....

মনে কি নেই সারাটা দিন
বসিয়ে বাতায়নে,
তোমার পানে রইত চেয়ে
অবাক দুনয়নে?" (পুরোনো বট, শিশু)

আর তারপর, ঐ বৃদ্ধ বটগাছ তার সমস্ত ডালপালা নিয়ে তখনকার সেই বালকের মনে যে ভাবের উদ্রেক করত তারই পরিচয় প্রদান করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

জীবনস্মৃতিতেও এই সময়কার মনোভাবের অনুরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানেও তিনি বলেছেন, —

"জানালার নীচেই একটি ঘাট বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট — দক্ষিণধারে নারিকেল শ্রেণী।

পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলো ঝুরি নামিয়া একটি অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে বিশ্বের একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রম ক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গিয়াছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের

চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কীরকম আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব।"

শুধুমাত্র ঐ বটগাছই নয়, তৎসংলগ্ন পুষ্করিণী, পার্শ্ববর্তী নারিকেল শ্রেণী, অন্দর মহলের অনাদৃত নির্জন বাগান — এ সমস্তই বাল্যে ও কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের মন হরণ করত। এর আগে একথা অনেকবার অনেকভাবে বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এখানে তা পুনরায় উল্লেখ করার কারণ, শেষ জীবনের অনেক কবিতায় কবি তাঁর বাল্য ও কৈশোরের ঐ স্বপলোককে এঁকেছেন বার্ধক্যের মমত্ব দিয়ে; এবং এ সব কবিতাই বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

শৈশবে রবীন্দ্রনাথ 'ক্লাসের কর্তব্য ফেলে কী গভীর আকর্ষণে অন্দরের উপেক্ষিত বাগানে' এসে উপস্থিত হতেন তারই স্মৃতিচিত্র হল 'আকাশ প্রদীপ' গ্রন্থের 'স্কুল পালানো' কবিতাটি (১৪।১০।৩৮)।

কবিতাটির প্রারম্ভে প্রবীণ কবি এক সুগভীর তত্ত্বকে প্রকাশ করতে চাইলেও পরবর্তী অংশে তা করেননি। সেখানে তিনি তাঁর শিশু মনের কল্পনাকেই স্থান দিয়েছেন। মনে রাখা প্রয়োজন শিশু রবীন্দ্রনাথের চেতনায় রূপকথার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলেই ঐ পরবর্তী অংশটুকু আমাদের নিকট খুবই মূল্যবান।

তিনি প্রথমে বলেছেন যে, বাড়ির ভেতরের বাগান তাঁকে আকর্ষণ করত গভীর ভাবে; কারণ ওর মধ্যে তিনি সেই বিরাট আদিম প্রাণের স্পর্শ অনুভব করতেন — যে প্রাণের সত্তা বিশ্ব চরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে এবং 'মানব শিরায় আর তরুর তন্তুতে' একই স্পন্দনের ছন্দ জাগাচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন, 'ঐ সত্তাই তখন তাঁকে প্রকৃতির সঙ্গে সুগভীর আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনে' সহায়তা করেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি একেবারে শিশুর মন নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতির প্রতি তাঁর ঐ শৈশব আকর্ষণের কারণ প্রদর্শন করতে চেয়েছেন। তখন তিনি বলেছেন, ঐ উপেক্ষিত বাগানের সঙ্গে ছিল তাঁর অকপট সুনিবিড় সৌহার্দ্য, এবং প্রতিদিনই তাকে তাঁর নতুন করে ভাল লাগত। কিন্তু কেন লাগত তা তাঁর জানা নেই। কেবল ঐটুকুই মনে আছে, প্রকৃতির এ অনাদৃত সৌন্দর্যের মধ্যে, জীর্ণ পাঁচিলের ফাটলের মধ্যে তিনি রূপকথার রূপলোকের উপমা খুঁজে পেতেন এবং এটাই বোধহয় রূপকথানুরাগী বালক রবীন্দ্রনাথের ঐ বাগানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ।

সুতরাং অস্বীকার করার উপায় নেই কবিতাটির মধ্যে রূপকথার অবতারণা নিতান্ত প্রাসঙ্গিক এবং স্বল্পপরিসর হলেও তা অস্বাভাবিক নয় মোটেই।

এর কয়েক দিন পরে রচিত 'জল' (২৬।১০।৩৮) কবিতায় কবির গভীর মননশীলতা প্রকাশ পেলেও দেখা যায় এর মধ্যেও অনুরূপ রূপকথা বিজড়িত বাল্যস্মৃতির প্রসঙ্গ এসে পড়েছে অনায়াসে।

এ কবিতারও সূচনা একটি তত্ত্ব চিন্তা দিয়ে। তিনি বলেছেন, পৃথিবীর মধ্যে জলেই সর্বপ্রথম চাঞ্চল্যের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল এমনকি ধ্বনিরও। কিন্তু বাল্যে তিনি জলের যে রূপটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তা ছিল পুকুরে আবদ্ধ, আর সেজন্যেই তা গতিহীন,

শব্দহীন। আর নিস্তব্ধ তরঙ্গহীন ঐ জলের সঙ্গে তাঁর তখনকার পরিচয় ছিল দূরের থেকে তখনও তার নিকট সাহচর্য তিনি লাভ করেননি, আর এই অর্ধপরিচয়ের আলো অন্ধকারই তাঁর মনকে নিয়ে যেত এক মায়াময় জগতে, রোমাণ্টিক রহস্যালোকে। —

"উপরের তলা থেকে
চেয়ে দেখে
না-দেখা গভীরে ওর মায়াপুরী এঁকেছিনু মনে।
নাগকন্যা মাণিক দর্পণে
সেথায় গাঁথিছে বেণী,
কুঞ্চিত লহরিকার শ্রেণী
ভেসে যায় বেঁকে বেঁকে
যখন বিকেলে হাওয়া উঠিত থেকে থেকে।
তীরে যত গাছপালা পশুপাখি
তারা আছে অন্যলোকে, এ শুধু একাকী।
তাই সব
যত কিছু অসম্ভব
কল্পনার মিটাইত সাধ,
কোথাও ছিল না তার প্রতিবাদ।"

ঠিক তারপরেই আবার তিনি তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। আগে তাঁর মনে হয়েছিল ঐ পুকুর আর তার 'দূরের দোসর' বাতায়ন কোণবাসী কবি উভয়েই জগতের ভিন্ন কিনারায় বন্দী। কিন্তু পরে যখন দূরত্বের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে দুজনের মধ্যে পরিচয় নিবিড় হয়েছে তখন তিনি এক গভীর সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। সত্যটি হল উভয়ের কেউই বন্দী নয়। কারণ জগতে নানা বন্ধনের মধ্যে দিয়েই মুক্তির আনন্দ উপভোগ করা যায়। তাঁর মনে হয়েছে 'এ পুকুর এও বাতায়ন — এক দিকে সীমা বাঁধা, অন্য দিকে মুক্ত সারাক্ষণ।' অতঃপর তিনি নিজেও প্রতিক্ষণে 'বাধা ঠেলা স্বাধীনতার' আস্বাদ লাভ করেছেন।

তত্ত্বটির এ আলোচনা বর্তমান উপলক্ষ্যেও অপ্রাসঙ্গিক নয়। কারণ এই হার্দিক তত্ত্বানুভবকে প্রকাশ করতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির মধ্যে আবার রূপকথার রহস্যালোককে টেনে এনেছেন।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য 'জল' কবিতাটিতে অভিব্যক্ত রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতির অংশবিশেষের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর আগে রচিত 'ছেলেটা' (২৮ শে শ্রাবণ, ১৩৩৯ অর্থাৎ ১৯৩২) কবিতাটির অংশবিশেষের সঙ্গে ভাবসাদৃশ্য বিদ্যমান। কবিতাদুটির ভাবগত ঐক্য এখানে পরিস্ফুট করে দেখা যেতে পারে।

শেষোক্ত কবিতাটি মূলতঃ অবহেলিত ছেলেটার বহুবিধ দৌরাত্মের ইতিহাস। অজানাকে জানার জন্য তার নানারকম দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা তথা অপচেষ্টাকে, তার অনেক দুর্বুদ্ধি ও চিন্তাভাবনাকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে রূপায়িত করতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে এক

জায়গায় তার রোমান্টিক মানসেরও পরিচয় প্রদান করেছেন। দেখা যায়, পুকুরে জলের ঝিলিমিলি দেখে বহু অপকর্মের নায়ক দুরন্ত ঐ 'ছেলেটা'র মনে সহসা প্রশ্ন জাগে পুকুরের তলদেশেই কি আছে রূপকথার সেই রহস্যলোক যাকে বাইরে থেকে দেখা যায় না বা জানা যায় না, এবং ঐ রূপলোকের পরিচয় লাভের জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। —

"আরো তলায় আছে নাকি নাগকন্যা ?
সোনার কাঁকই দিয়ে আঁচড়ায় লম্বা চুল
আঁকা বাঁকা ছায়া তার জলের ঢেউয়ে।
ছেলেটার খেয়াল গেল ওইখানে ডুব দিতে,
ওই সবুজ স্বচ্ছ জল
সাপের চিকণ দেহের মতো।" (ছেলেটা, পুনশ্চ)

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, 'ছেলেটার' এই চিন্তাধারার পশ্চাতে রয়েছে কবির সেই বাল্যস্মৃতির পরোক্ষ প্রেরণা, পূর্বালোচিত 'জল' কবিতায় যার পরিচয় পাওয়া যায়।

এর প্রায় সমসাময়িক 'আতঙ্ক' (২৩ শে জুলাই, ১৯৩২) কবিতাটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কবিতাটির প্রারম্ভে দেখা যায়, 'বাগানের জীর্ণ পাঁচিলের গায়ের সাদা কালো দাগ-গুলো' বালকের গল্প শোনা মনে এক আতঙ্কের সঞ্চার করে। তার মনে হয় ঐখানেই আছে বুঝি দৈত্যপুরী এবং ডাইনী বুড়ির বাসা। এমনকি সে ওখান থেকে 'হাঁউ-মাউ খাঁউ' এবং ডাইনি বুড়ির 'খিলিখিলি' হাসির শব্দও শুনতে পায় মনে মনে। কবিতাটির এই সূচনাংশটি আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় পরবর্তীকালে রচিত এবং আমাদের পূর্বালোচিত 'স্কুল-পালানে' কবিতার একটি অংশের কথা। —

"পাঁচিল ছ্যাতলা-পড়া
ছেলেমি খেয়ালে যেন রূপকথা গড়া
কালের লেখনি-টানা নানামতো ছবির ইঙ্গিতে,
সবুজে পাটলে আঁকা কালো সাদা রেখার ভঙ্গীতে।"

কিন্তু উভয়ের এই আপাত সাদৃশ্যের অন্তরালে বৈসাদৃশ্যও বড় কম নয়। জীর্ণ পাঁচিলের রেখাগুলো শিশুর মনে রূপকথার রহস্য ঘনীভূত করে তুললেও উভয় কবিতাতে তার আবেদন স্বতন্ত্র। দেখা যায়, একটিতে তা শিশুর মনে আতঙ্কের ভাব জাগিয়েছে, অপরটিতে বালক কবির মনে রোমাঞ্চকর অনুভূতি সঞ্চারিত করেছে।

মনে রাখা দরকার, রূপকথার প্রসঙ্গ দিয়ে আমাদের আলোচ্য কবিতাটির সূত্রপাত, কিন্তু তা কবিতাটির একমাত্র এবং প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠেনি। বরং দেখা যায়, কবি উক্ত বিষয়টিকে অবলম্বন করে এক গভীর ভাবের জগতে অনুপ্রবেশ করেছেন এবং রূপকথা অতঃপর এখানে নিতান্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

তাঁর মনে হয়েছে জীর্ণ পাঁচিলের গায়ের বিচিত্র দাগগুলো রূপকথার বিভিন্ন চরিত্রের রূপ ধরে শিশুর মনে ভয়ের উদ্রেক করলেও পরিণত মনে তা করতে পারে না। অবশ্য তাই বলে পরিণত মনে যে কোন অমূলক আশঙ্কার স্থান নেই তা নয়। জীবনের ওপর

মূঢ় অতীতের নানা মসীলেখা অধিকাংশ সময়ে আমাদের শঙ্কাতুর ও দুর্ব্বল করে তোলে। তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে আরও লক্ষ্য করেছেন, আমাদের দেশে অতীতের নানা বিরূপ বিকৃতি কুসংস্কার অমঙ্গলের নাম করে আমাদের জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত, অকারণ আতঙ্কে জর্জরিত করে তুলেছে। এর সঙ্গে একমাত্র শিশুর মনের পূর্ব কথিত ঐ আতঙ্কেরই তুলনা করা যেতে পারে।

কবির শৈশব স্মৃতি বিজড়িত 'যাত্রাপথ' (৯ই জুন, ১৯৩৭ অর্থাৎ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) কবিতাটিও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যেও শিশু কবির রূপকথা সচেতনতার কথা এসেছে প্রাসঙ্গিক ভাবে, এবং পরিণত মানসিকতা দিয়ে তা অঙ্কিত। এখানে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেমন 'পুনর্মিলন', 'পুরোনো বট' 'স্কুল-পালানে', 'জল' প্রভৃতি কবিতায় কবি তাঁর রূপকথা-রস-নিমগ্নতার প্রধান সহায়ক রূপে প্রকৃতিকেই নির্দেশ করেছেন অথচ এ কবিতায় তা করেননি।

এর মধ্যে তিনি বলেছেন, শৈশবে হাতের কাছে যে বই পেতেন ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে তা পড়তে শুরু করতেন, তার সম্যক্ অর্থ তাঁর বোধগম্য হোক বা না হোক। এরপর অবশ্য তিনি এক সুগভীর তত্ত্বভাবলোকে অনুপ্রবেশ করেছেন; অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সে আলোচনা এখানে পরিহার করা হল। আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, সে সময়ে তাঁর অন্যতম পাঠ্য ছিল 'দিদিমায়ের বালিশ-তলায় চাপা' জরাজীর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণখানা এবং 'মায়ের ঘরের চৌকাঠেতে বারান্দার এককোণে দিন-ফুরানো ক্ষীণ আলোতে' বসে সেখানা পড়তে পড়তে তাঁর মন উদাস হয়ে যেত। যদিও, —

"অনেক কথা হয়নি তখন বোঝা,
যেটুকু তার বুঝেছিলাম মোট কথাটা সোজা—
ভালোমন্দ লড়াই অনিঃশেষ,
প্রকাণ্ড তার ভালোবাসা, প্রচণ্ড তার দ্বেষ।
বিপরীতের মল্লযুদ্ধ ইতিহাসের রূপ
সামনে এল রইনু বসে চুপ।
শুরু হতে এইটে গেল বোঝা,
হয়তো বা এক বাঁধা রাস্তা কোথাও আছে সোজা,
যখন-তখন হঠাৎ সে যায় ঠেকে,
আন্দাজে যায় ঠিকানাটা বিষম এঁকেবেঁকে।
সব-জানা দেশ এ নয় কভু, তাই তো তেপান্তরে
রাজপুত্তুর ছোটায় ঘোড়া না জানা কার তরে।
সদাগরের পুত্র সেও যায় অজানার পার
খোঁজ নিতে কোন্ সাত-রাজা-ধন গোপন মাণিকটার।
কোটাল পুত্র খোঁজে এমন গুহায় থাকা চোর
যাকে ধরলে সকল চুরির কাটবে বাঁধন-ডোর।"

(যাত্রাপথ, আকাশ প্রদীপ)

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণ তথা বই পড়তে পড়তে বালক কবি রূপকথার ভাবনায় ভাবিত হয়ে পড়তেন। আসলে শিশুকাল থেকেই রূপকথা তাঁর চেতনার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, যে কোন উপলক্ষ্যই তাঁর মনকে এ চিন্তায় নিমগ্ন করে তুলত অনায়াসে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে কয়েক বৎসর আগে (১৩৪২) শেষ সপ্তকের একটি কবিতায় কবি 'অনেক খানি সংসারে'র সঙ্গে অপরিচয় বা অর্ধপরিচয়কেই রূপকথার প্রতি তাঁর তখনকার ঐ মোহের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ কঠোর বাস্তব জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা শিশুর মনে মায়াময় কল্পলোক গড়ে তুলতে এবং রূপকথার রোমান্সকে ঘনীভূত করতে সহায়তা করে অনেকটা পরিমাণে। কিন্তু পরবর্তী জীবনে যখন নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বাস্তব সংসারের সঙ্গে পরিচয় হয় নিবিড়, জগৎ ও জীবনের অনেক কিছুই আর অজানা থাকেনা তখন শৈশবের এই কল্পলোক যায় হারিয়ে, রূপকথা আর মনে তেমন সাড়া জাগাতে পারে না। রবীন্দ্রনাথও নিজের সম্পর্কে এ কথাই বলেছেন, —

"এখন অনেক খবর পেয়েছি জগতের,
মনে ঠাওরেছি
সংসারের অনেকটাই মার্কামারা খবরের
মালখানা।
মনের রসনা থেকে
অজানা স্বাদ গেছে মরে,
অনুভবে পাইনে
ভালোবাসায় সম্ভবের মধ্যে
নিয়তই অসম্ভব
জানার মধ্যে অজানা,
কথার মধ্যে রূপকথা।
ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী
যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে।
সেই নারী আছে বুঝি মায়ার ঘুমে,
যার জন্যে খুঁজতে হবে সোনার কাঠি।"

তবে সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে নিজের সম্পর্কে কবির এই উক্তিকে সর্বতোভাবে মেনে নেওয়া যায় না, যদিও কথাটা সাধারণের সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিষয়টি বর্তমান আলোচনা এবং রবীন্দ্র-ব্যক্তি-চেতনার মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ বলেই তাকে বিশদ করা প্রয়োজন মনে করি।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রমানস থেকে যদি তাঁর শৈশবের রূপকথার জগৎ যথার্থই একেবারে অন্তর্হিত হয়ে যেত তবে তাঁর কাব্যে সাহিত্যে রূপকথার রস এমন অজস্র ধারায় ঝরে পড়ত না। এ পর্যন্ত বিচিত্র রূপকথা

রস-সমন্বিত তাঁর অনেক কবিতার কথাই আলোচিত হয়েছে এবং পরে এ জাতীয় আরও কিছু কবিতা সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ আছে।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, বালক কবি শৈশবের অকপট সারল্য নিয়ে রূপকথার জগতের সমস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে যেভাবে আস্বাদ করেছিলেন, পরিণত বয়সে সুকর্ষিত, পরিশীলিত এবং জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ মন নিয়ে ঠিক সেভাবে অনুভব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, জীবনের বিশেষ কোন মুহূর্তে বিশেষ কোন পরিবেশে কবি হঠাৎ প্রত্যাবর্তন করেছেন শৈশবের সেই আনন্দময় সৌন্দর্যলোকে যেখান থেকে রূপকথার রহস্যালোকের দূরত্ব অতি সামান্যই। ছিন্নপত্রের অনেক চিঠিতেই তার সুস্পষ্ট পরিচয় বর্ণিত হয়েছে তাঁর আপন অনুভবের ভাষায়।

রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রূপকথা-ভাবনার প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, শেষসপ্তকের ১৯ সংখ্যক কবিতায় কবি 'মনের রসনা থেকে অজানার স্বাদ গেছে মরে' বলে আক্ষেপ করলেও, রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকমাত্রের কারোরই অজানা নয় যে অজানার প্রতি আকর্ষণ, সুদূরের জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং অনির্দেশ্য রহস্যালোকের জন্য তীব্র আকুতি রবীন্দ্র কবিজীবনের অন্যতম মূলসুর। অস্বীকার করবার উপায় নেই, এর সূচনা অনেকাংশেই রূপকথার অরূপলোকের প্রতি তাঁর আকর্ষণ থেকে। অনেক কবিতাতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ সমসাময়িককালে রচিত 'আশ্বিনে' (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫) কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

এর মধ্যে দেখি সূর্যকরোজ্জ্বল নির্মল আকাশ, শিউলির সৌরভ শেষ বয়সে তাঁর চেতনায় 'মন কেমনের বেদনা বাতাস' লাগিয়ে দিয়েছে। তিনি চলে গেছেন ছেলে বেলাকার সেই ছুটির জগতে—যেখানে রাজপুত্র ছুটে চলত অজানার উদ্দেশ্যে। এমনকি তিনিও এই সময় শুনতে পেয়েছেন সুদূরের আহ্বান এবং ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন অজানার জন্যে। —

"এমনি শরতে ছেলেবেলাকার দেশে
রূপকথাটির নবীন রাজার ছেলে
বাহিরে ছুটিত কী জানি কী উদ্দেশে
এপারের চির পরিচিত ঘর ফেলে।
আজি মোর মনে সে রূপকথার মায়া
ঘনায়ে উঠেছে চাহিয়া আকাশ-পানে;
তেপান্তরের সুদূর আলোক ছায়া
ছড়ায়ে পড়িল ঘর ছাড়া মোর প্রাণে।
মন বলে 'ওগো অজানা বন্ধু, তব
সন্ধানে আমি সমুদ্রে দিব পাড়ি
ব্যথিত হৃদয়ে পরশ রতন লব
চির সঞ্চিত দৈন্যের বোঝা ছাড়ি।
দিন গেছে মোর, বৃথা বয়ে গেছে রাতি,

বসন্ত গেছে দ্বারে দিয়ে মিছে নাড়া;
খুঁজে পাই নাই শূন্য ঘরের সাথী
বকুল গন্ধে দিয়েছিল বুঝি সাড়া।
আজি আশ্বিনে প্রিয়-ইঙ্গিত-সম
নেমে আসে বাণী করুণ কিরণ ঢালা—
চির জীবনের হারানো বন্ধু মম,
এবারে এসেছে তোমারে খোঁজার পালা।' ''
(আশ্বিনে, বীথিকা)

এই সূত্রে 'শেষ সপ্তকে'র ১৯ সংখ্যক কবিতাটির প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক। এর শেষাংশে দেখি 'জানার মধ্যে অজানা'কে 'কথার মধ্যে রূপকথা'কে অনুভব করতে না পারার জন্য কবির তীব্র বেদনাবোধ অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এর কয়েক বৎসর আগে রচিত 'রাজপুত্র' কবিতায় ঠিক তার বিপরীত অনুভূতির প্রকাশ দেখতে পাই, এ কথা আগেই বলেছি। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য, 'আশ্বিনে' কবিতাটিতে রূপকথার উপাদান প্রাসঙ্গিক বিষয় রূপে উপস্থাপিত কিন্তু 'রাজপুত্র' কবিতায় তা নয়—সেখানে রূপকথার ভাববস্তুর প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়।

এবারে রবীন্দ্রনাথের এমন কতকগুলো রোমান্টিক কবিতার পর্যালোচনা করব, যাদের মধ্যে রূপকথার রহস্যলোকের জন্য কবির অন্তহীন ব্যাকুলতা উৎসারিত। আরও উল্লেখযোগ্য, শেষ সপ্তকের ১৯ সংখ্যক কবিতায় কবি নিজের সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার বৈপরীত্যই পরিলক্ষিত হয় এদের মধ্যে।

তাঁর প্রথম জীবনে লেখা 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের অন্তর্গত 'উপকথা' নিয়েই শুরু করা যাক। কবিতাটি সম্ভবতঃ ১৮৮৫/৮৬ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে রচিত।

নিসর্গের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হার্দিক সম্পর্ক ও সেইসঙ্গে বিজড়িত তাঁর রূপকথা-চেতনার কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানেও দেখি বর্ষণমুখর প্রকৃতি তাঁর মানসপটে একে একে উপস্থাপিত করেছে শৈশবে শ্রুত রূপকথা-উপকথার বিভিন্ন কাহিনী। তারপরে এদের অবলম্বন করেই তিনি বিচরণ করেছেন সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়ানো সকল বিধি নিয়মের অতীত এক অসীম সৌন্দর্যলোকে। অবশেষে যখন পদে পদে নিয়ম অধীন কঠোর বাস্তব রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন তখন তাঁর মন বেদনার্ত হয়ে উঠেছে ঐ কল্পলোকের জন্য।

'উৎসর্গে'র ৩৫ সংখ্যক কবিতাটিতেও কবির রূপকথা-রস-নিমগ্নতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। চৈত্র মাসের প্রাকৃতিক পরিবেশই তাঁকে দেশকালের বাঁধন মুক্ত করে নিয়ে গেছে এক অস্পষ্ট কুহেলিকাময় জগতে এবং প্রত্যক্ষ জগতের সমস্ত কাজের কথা ভুলিয়ে দিয়ে তাঁকে কখনও উদাসী, অকারণ বেদনায় বিধুর করে তুলেছে আবার কখনও বা করেছে পুলকিত বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। —

''আজকে নবীন চৈত্রমাসে পুরাতনের বাতাস আসে,
খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।

মিথ্যা আজি কাজের কথা, আজ জেগেছে যে-সব ব্যথা
এই জীবনের নাইকো তাহার হেতু।
গভীর চিত্তে গোপন শালা সেথা ঘুমায় যে রাজবালা
জানি নে সে কোন্ জনমের পাওয়া।
দেখে নিলেম ক্ষণেক তারে, যেমনি আজি মনের দ্বারে
যবনিকা উড়িয়ে দিল হাওয়া।
ফুলের গন্ধ চুপে চুপে আজি সোনার কাঠি রূপে
ভাঙালো তার চিরযুগের ঘুম।
দেখছে লয়ে মুকুর করে আঁকা তাহার ললাট 'পরে
কোন জনমের চন্দন কুঙ্কুম।"

এরপর যখন তিনি আরও বলেন —

"আজকে হৃদয় যাহা কহে সত্য নহে, মিথ্যা নহে,
কেবল তাহা অরূপ অপরূপ।
খুলে গেছে কেমন করে আজি অসম্ভবের ঘরে
মর্চে পড়া পুরানো কুলুপ।"

তখন তার মধ্যে কবির তৎকালীন মানসিক অবস্থার পরিচয় তো পাওয়া যায়ই তদুপরি ঐ সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে দিয়ে রূপকথার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপটি এমনভাবে সুস্পষ্ট ও সুপরিজ্ঞাত হয়ে ওঠে যা একান্তভাবে তুলনা রহিত। অবশ্য পূর্বোক্ত 'উপকথা' কবিতাটির মধ্যেও যে অনুরূপভাবে রূপকথার স্বরূপটি প্রকাশিত হয়েছে তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।

উপরোক্ত কবিতাটির সঙ্গে বেশ কয়েক বৎসর আগে রচিত (২২ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪) ছিন্নপত্রাবলীর একটি পত্রের বেশ কিছুটা ভাবসদৃশ্য লক্ষিত হয়। তবে উক্ত পত্রে দেখা যায় চৈত্রমাস নয়, কোন এক শরৎকালীন প্রভাতের রৌদ্র কবির মনকে উদাস আকুল করে তুলেছে, আর তার কল্পনার অবাধ অভিসার শুরু হয়েছে 'সুদূর বিস্তৃত মায়াময়ী মরীচিকা রাজ্যে'। পত্রটির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করে দেখানোর চেষ্টা করছি রবীন্দ্র রচনায় একযুগের ভাবনা কেমন আর এক যুগের কবিতা হয়ে ধরা পড়েছে তারই কৌতুককর পরিচয় রয়েছে এতে। —

"এই আকাশ-ভরা সোনার রৌদ্রটি আজ আমারও মনের উপর সম্পূর্ণ বিস্তারিত হয়েছে —সেখানে আমার জীবনের সমস্ত সুখস্মৃতির দেশটি শরতের আলোতে এক অপরূপ মায়ারাজ্যর মতো দেখাচ্ছে। যখন ভেবে দেখি এ জীবনে কেবলমাত্র বত্রিশটি শরৎকাল এসেছে এবং গেছে তখন ভারী আশ্চর্য বোধ হয় — অথচ মনে হয় আমার স্মৃতিপথ ক্রমেই অস্পষ্টতর হয়ে কুহেলিকাময় অনাদিকালের দিকে চলে গেছে, এবং এই সমস্ত বৃহৎ মানসরাজ্যের উপর যখন মেঘমুক্ত সুন্দর প্রভাতের রৌদ্রটি এসে পড়ে তখন আমি যেন আমার এক মায়া-অট্টালিকার বাতায়নে বসে এক সুদূর বিস্তৃত মায়াময়ী মরীচিকা রাজ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি, এবং আমার কপালে যে বাতাসটি এসে লাগতে থাকে

সে যেন অতীতের সমস্ত অস্পষ্ট মিশ্রিত মৃদু গন্ধপ্রবাহ বহন করে আনতে থাকে।"

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বিভিন্ন সময়ে সম্পূর্ণ পৃথক পরিবেশে (কবিতাটির রচনা স্থান হাজারিবাগ, চিঠিটি রচিত হয় বোয়ালিয়া পথে) কবির চিত্ত প্রায় একই ধরনের ভাবানুভূতির দ্বারা আন্দোলিত হয়েছে। আসলে এ হল তাঁর রোমাণ্টিক চিন্তাধারার সঙ্গে রূপকথার চেতনার মিলনের ফলশ্রুতি।

এই সূত্রে 'উপকথা' এবং উৎসর্গের '৩৫ সংখ্যক' কবিতার প্রযুক্তি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দু এক কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। এই দুই কবিতার মধ্যে রূপকথার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও কাহিনীগত বা ভাবগত দিক দিয়ে তা প্রাধান্য পায়নি। কবিতা দুটির মৌল ভাববস্তু তথা কবির রোমাণ্টিক চেতনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করেই উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। আরও লক্ষ্যণীয় কেবলমাত্র রূপকথার জগতেই নয়, বৈষ্ণব কবিদের অরূপ সৌন্দর্যলোকে এবং সংস্কৃত কবিদের অনির্বচনীয় স্বপ্নলোকেও কবির অবাধ মানসাভিযাত্রা চলেছে একই সময়ে। শেষোক্ত কবিতাটিতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

'কোকিল' (২৯ শে বৈশাখ, ১৩১৩) কবিতায় কোকিলের ডাক কবির রোমাণ্টিক মনকে নিয়ে গেছে ফুলের গন্ধে আমোদিত কোকিলের ডাকে মুখরিত তিনশ বছর আগেকার পল্লীবাংলায় যেখানে 'কদম শাখার আড়াল থেকে চাঁদ উঠলে' বধূ 'বিনিয়ে খোঁপা চোখে কাজল' আঁকত এবং ঘাটের থেকে শোনা যেত 'নারীর কণ্ঠে হাসির কলতান।' কবি অনুমান করেছেন, ঐ সময় বাংলার পল্লী সম্পদ ও প্রাণ প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ছিল, আর জীবনের আনন্দময় অবকাশ ছিল অফুরন্ত। এমনকি এই অবকাশই যে তখন লোকসাহিত্যের প্রবাহকে সচল করে রেখেছিল এমন আভাসও তিনি দিয়েছেন এখানে।

এ কবিতাতে কবি অনুযোগ করেছেন, আধুনিক নাগরিক জীবনের কর্মব্যস্ততার তাগিদে সেদিনকার সেই অবকাশের সঙ্গে সঙ্গে রূপকথার পরিবেশও প্রায় অবলুপ্ত। তিনশ বছর আগেকার সেই পল্লী আজ ম্রিয়মান ও হতশ্রী। এই সব নানা কারণে যদিও আজও কোকিল তেমনি সুরেই ডেকে যায়, ঐ জীবনের সুর আর শোনা যায় না, এবং রূপকথা মুখরিত জগতও আজ তাই আমাদের অগোচরে বিলীন হয়ে গেছে বললেই হয়। আর এই ভাবনা সূত্রেই তাঁর রোমাণ্টিক বিষাদ ব্যাকুলতা মূর্ত হয়ে উঠেছে এই কবিতাটিতে —

"তিনশো বছর কোথায় গেল,
তবু বুঝি নাকো
আজো কেন ওরে কোকিল
তেমনি সুরেই ডাক।
ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে গেছে,
ফেটেছে সেই ছাদ —
রূপকথা আজ কাহার মুখে
শুনবে সাঁঝের চাঁদ।"

এ প্রসঙ্গে অনেকদিন আগের লেখা 'মানসী' কাব্যের 'বধূ' কবিতার (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮) একটি অংশ বিশেষের কথা স্মরণ করা যেতে পারে, যার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে রূপকথার জন্য সুগভীর আকুতি।—

"কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো!
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁ গো!
উঠিলে নব শশী ছাদের 'পরে বসি
আর কি রূপকথা বলিবি না গো।"

খুব স্পষ্ট ভাবে না হলেও পূর্বোক্ত 'কোকিল' কবিতার অন্তর্গত কবির রোমাণ্টিক বিষাদ ব্যাকুলতার সঙ্গে এর একটি অতি সূক্ষ্ম ভাব সাযুজ্য অনুভূত হয়। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, 'বধূ' কবিতার আকুতি 'কোকিল' কবিতার মত কবির প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফসল নয়। এখানে অভিব্যক্ত হয়েছে নগর জীবনে অনভ্যস্ত এবং বিব্রত এক বালিকা বধূর ফেলে আসা শৈশবের অভ্যস্ত পল্লী জীবনের জন্য সুতীব্র ব্যাকুলতা—যে জীবন পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে তার অন্তরের যোগ। অথচ 'কোকিল' কবিতায় কবি আধুনিক জীবনে রূপকথার অবলুপ্তির জন্য আক্ষেপ করেছেন; এবং বর্তমানে তাঁর সেই আক্ষেপকে মেনে নিয়েই বলতে হয় রবীন্দ্রনাথের সমকালে নগর জীবন থেকে লোকসাহিত্যের প্রভাব প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এলেও গ্রাম জীবন থেকে তা হয়নি। সেখানে তখনও রূপকথার ক্ষীণ ধারণাটি প্রবাহিত ছিল। তাইতো 'বধূ' কবিতার বধূটি পল্লী জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রূপকথার জন্যও অমন ব্যাকুল হয়ে উঠতে পেরেছে।

কবি রবীন্দ্রনাথ অন্তরের অন্তরে ছিলেন সেই ব্যাকুলতার অংশীদার—নগরজাত কবির কল্পলোকে রূপকথার জগত -- লোকজীবন ও লোকসাহিত্যের জগত এমন অক্ষয় অমৃত মূর্তি খুঁজে পেয়েছে।

এবারে রবীন্দ্র কবিতায় রূপকথার রূপাঙ্গিকের প্রভাব প্রসঙ্গে আসা যাক। রূপকথার 'এক যে ছিল রাজা' এই কথাটি বিশেষ ছন্দঃস্পন্দ গুণেই মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। আমাদের মনকে তা দেশকালাতীত রহস্যলোকে নিয়ে যেতে সহায়তা করে সহজেই। এই ছন্দঃস্পন্দই হচ্ছে আপাত ছন্দোরিক্ত গদ্যকবিতার মূল আলম্বন এবং তা মনের গভীরতম তলদেশচারী। 'পুনশ্চ'র কয়েকটি কবিতার কোন কোন পংক্তিতে রূপকথার ছন্দস্পন্দিত এই ভাষারীতি ও কল্পনাভঙ্গী অনুভব করা যায়। যেমন 'খেলনার মুক্তি'র—

"এক আছে মণিদিদি,
আর আছে তার ঘরে জাপানি পুতুল —
নাম হানাসান।"

এই আরম্ভটি অবশ্যই মনে করিয়ে দেয় রূপকথার 'এক যে ছিল রাজা'র কথা। আবার 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটির মধ্যে ব্যবহৃত—

"আর তারপরে?
তারপরে আমার নটেশাকটি মুড়োল
স্বপ্ন আমার ফুরোলো।"

অংশটি নিঃসন্দেহে রূপকথার চিরপ্রচলিত সমাপ্তি ছড়া—'আমার কথাটি ফুরোলো/ নটে গাছটি মুড়োলো'র অনিবার্য প্রভাব।

'সব পেয়েছির দেশ' কবিতার ভাষায়, ছন্দে, শব্দের ব্যবহারে, বাচনভঙ্গীতে রূপকথার ছাপ সুস্পষ্ট। যেমন —

"অশ্বশালায় / অশ্ব কোথায়, /
হস্তিশালায় / হাতি,/
স্ফটিক দীপে/ গন্ধ তৈলে /
জ্বালায় না কেউ/ বাতি।/।।

এছাড়াও কবির অন্যান্য অনেক কবিতার কোন কোন পংক্তির মধ্যে রূপকথা কথকের বিশেষ ভঙ্গীটি পরিলক্ষিত হয়। যেমন —

(১) এক যে ছিল চাঁদের কোণায় /চরকা কাটা বুড়ি।
(২) এক যে ছিল রাজা এবং এক যে ছিল রানী পংক্তি দুটি
(৩) এক যে আছে বুড়ি।
(৪) তারপর প্রহরে প্রহরে ফিরেছি পথে পথে
কত লোকে কত বললে, কত নিলে, কত ফিরিয়ে দিলে
ভোগ করলে দাম দিলে না সেও কত লোক।

চতুর্থ উদাহরণটিতে দেখা যায় ক্রিয়াপদের বারবার ব্যবহার, ক্রিয়াপদের সঙ্গে সঙ্গে গল্প বলার কণ্ঠস্বরে যতি এবং শব্দ দ্বিত্বের প্রয়োগ, এ সমস্তই রূপকথার ভাষারীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আবার দেখি রূপকথার কোন কোন উপকরণ তুলনা উপমা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে কোন কোন কবিতায়। যেমন —

"আমার অবাক চোখে লাগিয়েছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া।
জাগিয়েছে আনন্দরূপ—
তোমার চৈতন্যে।"

অথবা

"কাল রাত্রে
বাদলের দানোয় পাওয়া অন্ধকারে
বর্ষণের রিমঝিম প্রলাপে
চাপা দিয়েছিল
সন্ন্যাসী নিশীথের ধ্যানমন্ত্র।"

কিংবা,

"এমনি করেই মাঝে মাঝে সোনার কাঠি আনে
কভু প্রিয়ার মুগ্ধ চোখে কভু কবির গানে
অলস মনের শিয়রেতে যে অন্তর্যামী
নিবিড় সত্যে জেগে ওঠে সামান্য এই আমি।"

এতদ্ব্যতীত 'আকন্দ' কবিতায় কবি আকন্দফুলকে কাব্যের দুয়োরানী বলে উপমিত করেছেন—

"পল্লবের আবরণ টানি
আছিলে কাব্যের দুয়োরানী
পথ প্রান্তে গোপন আঁধারে।"

রূপকথা যে কত বিচিত্র ভাবে ও রূপে রবীন্দ্রকবিতায় স্থান করে নিয়েছে তারই একটি সুস্পষ্ট পরিচয় এপর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এবার আসা যাক ছড়ার প্রসঙ্গে।

রূপকথার মতই ছড়ার আকর্ষণও রবীন্দ্র-কবিমনে কিছুমাত্র কম নয়। আগেই বলা হয়েছে, এই ছড়া সাহিত্যের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন শৈশবে এবং সে তাঁদের পারিবারিক পরিবেশেই। সে সময় ছড়ার ধ্বনি-ঝঙ্কার ও মিলের মাধুর্য রবীন্দ্রনাথের শিশু চিত্তকে যেভাবে আন্দোলিত করত এবং তার অপরিস্ফুট অর্থ ও ভাব তাঁর কবিমনে যে মায়ালোক গড়ে তুলত তার পরিচয় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে জীবনস্মৃতিতে, ছেলেবেলায় এবং আরও অনেক রচনায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি পূর্ব অধ্যায় সমূহে। পরবর্তী জীবনে কবির অবচেতনালীন নিভৃত মানস অবলম্বন করে ছড়ার প্রতি তাঁর শৈশবের এই অনুরাগ কেমন করে ধরা দিয়েছে সৃষ্টির বাঁধনে — বিশেষতঃ কবিতায় সে কথাই এবার আলোচনা করব।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কবিতার চেয়ে শেষ বয়সের কবিতাতেই ছড়ার প্রভাব অনেক বেশী সুস্পষ্ট; এবং তা ভাবগত, ছন্দগত ও চারিত্রগত সমস্ত দিক দিয়েই। মনে হয়, কবি যেন শেষজীবনে আবার প্রত্যাবর্তন করেছেন তাঁর ছেলেবেলার মোহমুগ্ধতা নিবিড় সেই ছড়ার রাজ্যে। তবে এক্ষেত্রে তাঁর শৈশবের মানসিকতার সঙ্গে পরিণত বয়সের মনন ও চিন্তাশীলতা কতখানি সংযোজিত হয়েছে, বা তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার স্পর্শে ছড়া তার লোকায়ত রূপটি কতটা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে, সে সমস্তই বিশ্লেষণের প্রয়াসী হব পূর্বনির্দিষ্ট পর্যায় বিভাগ অনুসারে।

এই ধারা সূত্রে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় রবীন্দ্রকবিতায় ছড়ার বিষয়বস্তুগত প্রাধান্যের কথা। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখি, যে কোন কারণেই হোক, এ ধরনের কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরল বললেই চলে। একমাত্র শেষ জীবনে রচিত 'প্রহাসিনী' কাব্যের 'রঙ্গ' (১৩৪২, কার্ত্তিক) কবিতাটিকেই উক্ত পর্যায়ভুক্ত করা যায়। একথা সত্য যে বিভিন্ন প্রসঙ্গসূত্রে কবি ছড়ার বিষয়বস্তুকে অনেক কবিতাতেই উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু কেবলমাত্র তাকেই উপজীব্য করে ঐ একটি ব্যতীত আর কোন কবিতাই লেখেননি। অবশ্য খাপছাড়া, ছড়ার ছবি, ছড়া প্রভৃতি কাব্যের কবিতাসমূহকে এই পর্যায়ে ফেলা যায় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। উত্তরে বলা যায়, এদের বিষয়বস্তুতে প্রচলিত কোন ছড়ার সুস্পষ্ট প্রভাব নেই। এ সব কাব্য-কবিতা সম্পূর্ণ রূপেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি যদিও এদের মধ্যে আগাগোড়াই ছড়ার ধর্ম রক্ষিত হয়েছে। পরে যথাসময়ে এ প্রসঙ্গ আবার আসবে। এখন কেবল 'রঙ্গ' কবিতাটিকেই পূর্বোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে

বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

কবি নিজেই কবিতাটি সম্পর্কে বলেছেন, 'এটি 'এতো বড় রঙ্গ' ছড়াটির অনুকরণে লিখিত।'

ঠিক কোন সময়ে এবং কী সূত্রে উক্ত ছড়াটির সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় তা জানা যায় না। তবে তাঁর 'ছেলে ভুলানো ছড়া'(১৩০১) প্রবন্ধে এর উল্লেখ থাকায় আমাদের অনুমান করতে কোন অসুবিধা হয় না যে ১৩০১ বঙ্গাব্দের আগেই তিনি ছড়াটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তা তাঁকে মুগ্ধও করেছিল গভীরভাবে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, উক্ত প্রবন্ধটিতে ঐ ছড়া সম্পর্কে কবির সুচিন্তিত ভাবনার পরিচয় পাওয়া গেলেও ঐ সময়ে বা তার নিকটবর্তী কোন সময়ে এর দ্বারা প্রভাবিত কোন কবিতারই সন্ধান পাওয়া যায় না। অতঃপর একেবারে সুদীর্ঘ একচল্লিশ বছরের ব্যবধানে মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর পূর্বে ঐ ছড়াটিকে আবার তিনি স্মরণ করেছেন এবং তারই অনুকরণে লিখেছেন 'রঙ্গ' কবিতাটি, তবে রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে এর লোকচরিত্র কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। মূল ছড়াটির সঙ্গে আলোচ্য কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করলেই তা প্রতীয়মান হবে। এই প্রসঙ্গে মূল ছড়াটি থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

"জাদু, এতো বড় রঙ্গ জাদু, এতো বড়ো রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।।
কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহাব অধিক কালো কন্যে তোমার মাথার কেশ।।"

এবং এরপরেও প্রশ্নকারিণী ঐ একই ভাবে ও ভঙ্গীতে চার ধলো, চার রাঙা, চার তিতো এবং চার হিমের পরিচয় জানতে চেয়েছে একে একে। বলাই বাহুল্য, এর যথাযথ উত্তরও সে পেয়েছে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রত্যেক শ্লোকের চতুর্থ উত্তরটি তার পক্ষে খুবই সন্তোষজনক হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে উক্ত ছড়াটিই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে। কবি ছড়াটির নিরাভরণ বৈশিষ্ট্য এবং সহজ সরল চিত্রকল্পনাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করলেও এই কবিতটির মধ্যে কিছুটা নাগরিকতা এবং আধুনিকতা এসে গেছে আপনা থেকেই; তার ফলে উভয়ের রসগত তারতম্যও ঘটে গেছে স্বাভাবিক ভাবে। তাঁর রঙ্গ—

"এতো বড় রঙ্গ, জাদু, এতো বড় রঙ্গ—
চার মিঠে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোন-পাপড়ি—
তাহার অধিক মিঠে, কন্যা, কোমল হাতের চাপড়ি।

এতো বড় রঙ্গ, জাদু, এতো বড় রঙ্গ—
চার সাদা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
ক্ষীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি—
তাহার অধিক সাদা তোমার পষ্ট ভাষার দাবড়ি।

এতো বড় রঙ্গ, জাদু, এতো বড় রঙ্গ—
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের সুক্ত—
তাহার অধিক তিতো যাহা বিনি ভাষায় উক্ত।

এতো বড় রঙ্গ, জাদু, এতো বড় রঙ্গ—
চার কঠিন দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা—
তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ী চলা।

এতো বড় রঙ্গ, জাদু, এতো বড় রঙ্গ—
চাব মিথ্যে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ—
মিথ্যে ভেলকি, ভূতেব হাঁচি, মিথ্যে কাঁচেব পান্না—
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুবে কান্না।''

যখন পড়ি তখন তা আমাদের মনে হাস্যরসেরই উদ্রেক করে। মনে হয় কবি যেন রঙ্গ করেই কবিতাটি রচনা করেছেন। কিন্তু প্রচলিত ছড়াটিব মধ্যে একটুখানি সরল কৌতুক থাকলেও তা হাস্যরসের আকর নয়। বরং তাকে মধুব বসাত্মকই বলা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য, অন্যান্য লোকসাহিত্যের মত মূল ছড়াটিতেও দেখি লোক-কবির কল্পনা সুদূর প্রসারী না হযে চির পবিচিত বিষয়েব মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে আছে। যদি তা না হত তবে তার আবেদন লোকসমাজের নিকট যথোচিত হত কিনা সন্দেহ। 'রঙ্গ' কবিতাটি ঐ ছড়াটির অনুকৃতি বলেই সম্ভবতঃ এর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদূরের অভিমুখী দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করে এনে অতি পরিচিত বিযয়ের মধ্যেই রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। এখানেই তাঁর লোক সাহিত্যে প্রিয় শিল্পী-চেতনার কৃতিত্ব। অবশ্য পরিবেশ এবং ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে চিরপরিচিত বিষয়ের আবেদনও যে পৃথক হতে পারে, তার প্রমাণ ঐ কবিতা এবং ছড়াটির আপেক্ষিক তুলনাতেই বোঝা যায়।

এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে তৃতীয় স্তবকের শেষ চবণটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। 'বিনি ভাষায় উক্ত' প্রযুক্তিটির কৌতুকরস নাগরিক পরিশীলন ও বিদগ্ধতার ফসল। তা ছাড়া প্রথম স্তবকের 'চাপড়ি' ও দ্বিতীয় স্তবকের 'দাবড়ি' শব্দের রঙ্গ চেতনার মূলগত বৈদগ্ধ্যও খুব দুর্লক্ষ্য নয়।

এবারে সেইসব রবীন্দ্রকবিতার প্রসঙ্গে আসা যাক, যাদের মধ্যে ছড়ার ভাবগত প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আর এই ধারায় 'শিশু' কাব্যের কয়েকটি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানেই রবীন্দ্র কবিতাতে ছড়ার ভাব প্রথম স্পষ্টতা লাভ করেছে।

'শিশু' কাব্যের অন্তর্গত 'অপযশ' কবিতার প্রারম্ভে কবি যখন বলেন, —

''বাছা রে, তোর চক্ষে কেন জল।
কে তোরে যে কী বলেছে
আমায় খুলে বল্।''

তখন সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনে পড়ে যায় মায়ের বাৎসল্য রস সিঞ্চিত বহু প্রচলিত একটি গ্রাম্য ছড়ার কথা,—

"কে ধরেছে কে⁄মেরেছে কে দিয়েছে গাল
খোকার গুণের বালাই নিয়ে
মরে যেন সে কাল।"

কবিতাটির পরবর্তী অংশে ছড়ার প্রভাব এতটা স্পষ্ট না হলেও তার ব্যঞ্জনা অনুভব করতে পাঠকের কোন কষ্টই হয় না। খোকার জন্য ব্যাকুল যে মাতৃহৃদয়টির পরিচয় পাওয়া যায় ছড়ার মধ্যে, তা যেন এই কবিতায় কবির হাতে পড়ে পরিশীলিত হয়ে নতুন রূপ লাভ করেছে।

এ কাব্যের 'ঘুমচোরা' কবিতাটিও বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত বিভিন্ন ছড়ায় যেমন খোকার ঘুমের জন্য ঘুম-পাড়ানি মাসি পিসিকে আহবান করা হয়ে থাকে নানা ভাবে, এর মধ্যে তা হয়নি। তবে এখানে দেখি খোকার ঘুম যে হরণ করে নিয়ে গেছে তারই সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছে খোকার জননী। শুধু তাই নয়, তাঁর মনে সেজন্যে সম্ভবের সঙ্গে অনেক অসম্ভব কল্পনাও স্থান পেয়েছে অনায়াসে যা একান্ত ভাবেই ছড়ার ভাব-কল্পনার সগোত্র।—

"কে নিল খোকার ঘুম চুরায়ে।
কোনো মতে দেখা তার পাই যদি একবার
লই তবে মোর সাধ পুরায়ে।
দেখি তার বাসা খুঁজি কোথা ঘুম করে পুঁজি
চোরা ধন রাখে কোন্ আড়ালে।
সব লুটি লব তার, ভাবিতে হবে না আর
খোকার চোখের ঘুম হারালে ।
ডানা দুটি বেঁধে তারে নিয়ে যাব নদী পারে,
সেখানে সে ব'সে এক কোণেতে
জলে শরকাঠি ফেলে মিছে মাছ-ধরা খেলে
দিন কাটাইবে কাশ বনেতে।
যখন সাঁঝের বেলা ভাঙিবে হাটের মেলা
ছেলেরা মায়ের কোল ভরিবে,
সারা রাত টিটি পাখি টিটকারি দিবে ডাকি—
'ঘুমচোরা কার ঘুম হরিবে।"

কবিতাংশটি অনায়াসে আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় গ্রাম্য মেয়েলি ছড়ার সেই কুঁদুলে মাসির অনুষঙ্গকে, যে শিশুকে কাঁদিয়ে উত্যক্ত করে তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়, শিশুর মা তাকে গঙ্গাপার করে নিশ্চিন্ত হতে চান। ছড়াটিতে দেখি—

'আদুলে কুঁদুলে মাসি কুলতলাতে বাসা।
পরের ছেলে কাঁদাতে মনে বড় আশা।

হাতে না মেলার্ম ভাতে না মেলার্ম কল্লেম গঙ্গাপার
রেতে না কেঁদো ছেলে দিনে একটিবার।

রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সুন্দর লেখনীতে এই কুঁদুলে মাসিই পরিশীলিত হয়ে ঘুমচোরাতে রূপান্তরিত এবং খোকার জননী তাকে গঙ্গাপার না করে 'ডানা দুটি বেঁধে নদীপারে বসিয়ে' দেন কল্পনায়। কবির নিজস্ব রুচিবোধ ও ভাবনার প্রকাশ এই পরিবর্তনের মূলে থাকলেও ছড়ার ভাবব্যঞ্জনা এখানে স্পষ্ট।

এ কাব্যের 'চাতুরী' কবিতার প্রতি ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত হয়েছে শিশুর আবির্ভাব নিয়ে মাতার অবিরাম কল্পনা বিলাস। কোন একটি বিশেষ ছড়ার ভাবগত ব্যঞ্জনা এর মধ্যে প্রকাশ পায়নি ঠিকই, কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই, এই কল্পনার পশ্চাতে রয়েছে প্রচলিত অনেকগুলো ছড়ার পরোক্ষ প্রেরণা। অবশ্য তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে কবিমনের প্রত্যক্ষ পরিচয় কতটা গভীর ছিল জানা যায় না। (দ্রষ্টব্যঃ— ভবতারণ দত্ত সম্পাদিত বাংলা দেশের ছড়া।)

ছড়ার সহজ, সরল ভাব কল্পনা এবং কবির সুগভীর তত্ত্ব দৃষ্টির সম্মিলিত ফল পরিণাম দেখি এই কাব্যের অন্তর্গত 'খেলা' কবিতাটিতে। আলোচ্য কবিতায় শিশুর নৃত্য এবং দ্বার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা মাতা কর্তৃক সেই দৃশ্য উপভোগের যে চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে তার মধ্যেও বাংলার অনেক প্রচলিত ছড়ার আভাস পাওয়া যায়। (তদেব)

আরও উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশের বহু প্রচলিত অনেক ছড়াতেই দেখা যায়, বাৎসল্য রসের আতিশয্যে ব্রজের রাখাল বালক এবং যশোদার সঙ্গে আমাদের ঘরের শিশু এবং তার জননী একাত্ম হয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর ছেলে ভুলানো ছড়ায় এ সম্পর্কে অলোচনা করেছেন সুন্দর ভাবে। তাঁর এই 'খেলা' কবিতাটিতেও ঐ জাতীয় ছড়ার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তদুপরি এর মধ্যে অভিব্যক্ত মাতৃসকাশে নৃত্যরত শিশুমূর্তিটিও বাংলা ছড়ার রাজ্যে সুপরিচিত।—

"কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি,
দুয়ার পাশে জননী হাসে
হেরিয়া নাচনি।
তাথেই থেই তালির সাথে
কাঁকন বাজে মায়ের হাতে
রাখাল-বেশে ধরেছে হেসে
বেনুর পাঁচনি।
কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি।"

অনেক ছড়ার ভাবই কখনও স্পষ্ট ভাবে বা কখনও অস্পষ্টভাবে এর মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং কোন বিশেষ ছড়ার ভাবে ভাবিত হয়ে তিনি কবিতাটি রচনা করেছেন বলা না গেলেও অনুমান করতে কোন অসুবিধা হয় না যে, অন্তরের সহজ ধর্মেই ছড়া

ভাবনার সঙ্গে কবির মন নিবিড় ভাবে যুক্ত ছিল।

আবার আলোচ্য কবিতারই শেষাংশে দেখি, রবীন্দ্রনাথ 'ঘুম-পাড়ানি মাসিপিসি' জাতীয় বিভিন্ন ছড়া এবং 'আয়রে আয় নিদান বুড়ী নিদের পাড়া যাবি' ছড়াটির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে অঙ্কিত করেছেন 'ঘুমের বুড়ি'র চিত্রটি।—

"ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী,
গায়ের 'পরে কোমল করে
পরশ-বুলানী।
মায়ের প্রাণে তোমারি লাগি
জগৎ মাতা রয়েছে জাগি,
ভুবন-মাঝে নিয়ত বাজে
ভুবন- ভুলানী।
ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি
নয়ন ঢুলানী।"

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সুকুমার সেন মনে করেন রবীন্দ্রনাথের এই ঘুমের বুড়ির পরিকল্পনার পশ্চাতে বাংলা ছড়া ব্যতীত অন্যতর কোন পূর্ব সূত্রের প্রেরণাও রয়েছে অনেকটা পরিমাণে। তাঁর মতে, "ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি নয়ন-ঢুলানী' — রবীন্দ্রনাথের এই কল্পনায় নিদ্রাদেবী - মধ্য বাংলা সাহিত্যের নিদালী বা নিদাটি -- ঘুমপাড়ানি বুড়ি সেজেছে। মনে হয় এর মধ্যে দার্জিলিঙের কাছে ঘুম গুম্ফার ডাইনী-বুড়ির ইঙ্গিতও সুকৌশলে রয়েছে।"

যাই হোক এই কবিতাটিতে বিভিন্ন ছড়ার ভাবকল্পনার ছায়াপাত লক্ষ্য করা গেলেও এবং ছড়ার চিত্রধর্মিতা রক্ষিত হলেও তার সেই সহজ সরল ভঙ্গীটি এর মধ্যে অনুপস্থিত। কারণ এর ওপর কবির সুকর্ষিত মনন চিন্তার প্রলেপ তো পড়েছেই, তদুপরি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি সুগভীর তত্ত্ব। এই তত্ত্বটিকে ব্যক্ত করতে গিয়েই কবি এর মধ্যে শিশুকে বিশ্বলোকের সঙ্গে, তার মাতাকে 'জগৎ মাতার' সঙ্গে এবং তাদের ক্ষুদ্র সংসারকে বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে একাকার করে ফেলেছেন সহজে। বলাই বাহুল্য অসামান্য প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেই তা সম্ভব হয়েছে। এ সম্পর্কে সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর সুচিন্তিত মন্তব্যটি স্মরণীয়। —

'ইহা শুধু কবির দৃষ্টি নহে, কবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি। সেই তত্ত্বরসিক দৃষ্টির জাদুকাঠির স্পর্শে ঘরের কোণের শিশুটি বিশ্বলোকের সগোত্র হইয়া উঠিয়াছে, মায়ের কোলের শিশুটি জগৎ-মাতার কোলে উঠিয়াছে।"

সবশেষে উল্লেখযোগ্য ছড়ার সহজ ভাববস্তুর সঙ্গে কবির গভীর চিন্তাশীলতা ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর সার্থক সমন্বয় হয়েছে বলেই কবিতাটি এমন রসগ্রাহী হয়ে উঠেছে। তা না হলে, এটি হয়তো নিছক ছড়া জাতীয় বা কেবল তত্ত্বমূলক কবিতায় পরিণত হত।

এছাড়া 'জন্মকথা', 'বিচার' ও 'নির্লিপ্ত' এই কবিতাত্রয়ীর প্রাসঙ্গিক উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। যদিও পূর্বোক্ত কবিতাবলীর মত ছড়ার ভাববস্তুর সুস্পষ্ট প্রভাব এদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়না, তা হলেও বাৎসল্য রসে সিক্ত যে সুকুমার স্নিগ্ধতা ছড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তা এদের মধ্যে অনুভূত হয়।

আর 'খোকা' কবিতাটির প্রথমাংশেও খুব সুস্পষ্টভাবে না হলেও ঘুম-পাড়ানি ছড়ার একটুখানি আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রূপকথার প্রভাব। তাছাড়া সমগ্র কবিতাটিতে একটি তত্ত্বকেই কবি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সেজন্যে একে ছড়া প্রভাবিত কবিতা না বলে তত্ত্বমূলক কবিতা বলা যেতে পারে।

বর্তমান আলোচনায় এ কাব্যের 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ'। শৈশবে যে ছড়াটি তাঁকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছিল এটি তারই স্মরণিকা। এর শেষাংশে ঐ ছড়াটি সম্পর্কে কবির সুগভীর ভাবনারও পরিচয় পাওয়া যায়।

'শিশু' কাব্যের কবিতাসমূহের পর বেশ কয়েক বৎসর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের আর কোন কবিতায় ছড়ার ভাবগত অনুরণন ধরা পড়ে না। তারপরে একেবারে 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যের 'বুড়ি' ও 'রাজরানী' কবিতায় আবার তা পরিলক্ষিত হয়। দুটি কবিতাই বর্তমান প্রসঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

অধিকাংশ ছেলেভুলানো ছড়ার মতনই 'বুড়ি' কবিতাটির প্রধান চরিত্র শিশু এবং তাকে কেন্দ্র করেই এর মধ্যে মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য রসের ধারাটি উৎসারিত হয়েছে; যদিও এর রূপ অনেক পরিশীলিত, এবং এর মধ্যে জনপ্রিয় লোককল্পনারও সার্থক সমন্বয় ঘটিয়েছেন কবি।

ছড়ায় সাধারণত দেখা যায় স্নেহের আধিক্যবশতঃ মাতা জগতের অনেক দুর্লভ বস্তুর সঙ্গেই তাঁর শিশুর কোন পার্থক্য অনুভব করতে পারেন না, এবং অনেক অসম্ভবের সঙ্গে তার তুলনাও করে থাকেন অনায়াসে। এখানেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। তাই তো দেখি, মাতার স্নেহের দৃষ্টিতে কবিতাটির কেন্দ্রবিন্দু শিশুকন্যাটি এবং ছড়া ও লোককথায় সুপ্রচলিত 'চাঁদের কোণার চরকা কাটা বুড়ি' এক হয়ে গেছে। তাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই আর অনুভূত হয় না এর মধ্যে। আরও উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশের শিশুরা চিরকালই ছড়ার মধ্যে দিয়ে 'চাঁদের মা বুড়ি'র কথা শুনে এসেছে এবং আনন্দ পেয়েছে। আলোচ্য কবিতাটিতে কিন্তু ঠিক সেভাবে ঐ লোককল্পনাটির অবতারণা করা হয়নি; পরিবর্তে এখানে ঐ শিশুকেই চাঁদের মা বুড়ি রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এবং বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের লেখনী গুণেই এমন অসম্ভবেরও সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে।

'রাজা ও রানী' কবিতাটির সঙ্গে ছড়ার ভাবগত ও সুরগত সামঞ্জস্য অনুভূত হয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এ কবিতার

"এক যে ছিল রাজা
সেদিন আমায় দিল সাজা

এক যে ছিল রানী
আমি তার কথা সব মানি।"

প্রভৃতি অংশ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় জনপ্রিয় একটি ছড়ার কথা—

"এক যে রাজা সে খায় খাজা
তার যে রাণী সে খায় ফেনী।"

একথা ঠিক, ছড়াটির হুবহু অনুকরণ তিনি করেননি, নিজের রুচি অনুযায়ী তাকে বিশেষতঃ বিষয়বস্তুটিকে পরিবর্তিত করে নিয়েছেন। কিন্তু ঐ ছড়ার ভাব ও সুর এর মধ্যে অক্ষুণ্ণ আছে।

এছাড়া কবিতাটি থেকে যখন পড়ি,—

"আমি গিয়েছিলুম ছুটে
দেখতে ডালিম গাছে
পিরভূ কেমন নাচে।"

তখন আমাদের বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে উক্ত অংশটি 'ডালিম গাছে পরভু নাচে/ তাক ধুমাধুম বাদ্দি বাজে' ছড়াটির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে রচিত।

এইসব ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর কোন কবিতাকেই আলোচ্য পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না; যদিও তাঁর জীবনের একেবারে উপান্ত সীমায় রচিত অনেক কাব্য-কবিতাই আশ্চর্য রকম ভাবে ছড়ার রসে মধুর,— তার মধ্যে 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি' এবং 'ছড়া' কাব্যত্রয়ী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নানাদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় এই কাব্য তিনটি সম্পর্কে পৃথক ভাবে পরে আলোচনা করব।

অতএব এবারে পূর্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই রবীন্দ্র কবিতার প্রসঙ্গই আসবে, যেখানে বিষয়বস্তু বা প্রত্যক্ষ ভাব নয়, প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ রূপে ছড়ার ভূমিকা দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় সব কটি কবিতাই তাঁর শেষ জীবনে রচিত, এবং এই সূত্রে প্রথমেই এসে পড়ে যে কবিতাটির কথা তা আমাদের স্বতন্ত্রভাবে আলোচিতব্য কাব্য 'ছড়ার ছবি'র অন্তর্ভুক্ত। কবিতাটির নাম 'পিছুডাকা' (জ্যৈষ্ঠ,১৩৪৪)।

কবিতাটি গভীর ভাবনা-সমৃদ্ধ সন্দেহ নেই, আবার তা রোমান্টিকও বটে। জীবনের শেষ প্রহরে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে কবির মনে হয়েছে, পৃথিবীতে 'অনেক সূর্য ডোবার সঙ্গে' অনেক কীর্তি কাহিনী, মূর্তি-দেবালয়, অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ও শক্তিমানের অনেক পরিচয়বাহী বহু ঘটনা বিস্মৃতির অন্তরালে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের বিলুপ্তি কবির মনকে আর তেমন বেদনার্ত করে তোলে না, তাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণও খুব কম। কিন্তু মর্ত্য সৌন্দর্যের অতি সাধারণ দৃশ্য যাকে তিনি 'ওই যা কিছু' নামে অভিহিত করেছেন, তা তাঁর মনে মোহজাল বিস্তার করে এবং তাঁকে পশ্চাতের দিকে ফিরে তাকানোর জন্য আহ্বান জানায়। এমনকি, 'ওই যা কিছু'র মধ্যে কোনদিনই তাঁর কোন স্থান থাকবে না, একথা অনুভব করে কবি বিষণ্ণ হয়ে ওঠেন। আর ঐ রোমান্টিক বিষাদঘন মুহূর্তে তাঁর মনে পড়ে যায় শৈশবে শ্রুত বহুপ্রচলিত ছড়াগুলির কথা—

"ওই যা কিছুর ছবির ছায়া দুলেছে কোন্‌কালে
শিশুর চিত্ত নাচিয়ে তোলা ছড়াগুলির তালে----
তিরপূর্ণির চরে
বালি ঝুর ঝুর করে
কোন্ মেয়ে সে চিকন্ চিকন চুল দিচ্ছে ঝাড়ি,
পরনে তার ঘুরে পড়া ডুরে একটি শাড়ি।
ওই যা কিছু ছবির আভাস দেখি সাঁঝের মুখে।
মর্ত্যধরার পিছু-ডাকা দোলা লাগায় বুকে।"

লক্ষ্যণীয়, রবীন্দ্রনাথ এখানে শিশু মনোরঞ্জক ছড়াগুলোর মধ্যে 'ওই যা কিছু' ছবির আভাস পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করলেও, বিভিন্ন ছড়ার পৃথক পৃথক চিত্রাংশকে এমনভাবে একসঙ্গে গ্রথিত করেছেন যে তাদের একই ছড়ার অন্তর্বর্তী এক অখণ্ড দৃশ্য বলে মনে হয়। কবিতাটির অন্তঃস্থিত 'তির পূর্ণির' সন্ধান পাওয়া যায় 'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে ' ছড়াটির অন্তর্গত 'হেথায় তো জল নেই 'ত্রিপূর্ণির ঘাট' অংশটির মধ্যে। মূল ছড়াটিতে 'ত্রিপূর্ণির' ঘাটের কথা থাকলেও কবি এখানে 'তিরপূর্ণির চরে'র কথাই বলেছেন। মনে হয় পরিণত বয়সে কবির কল্পনায় 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর'ই ত্রিপূর্ণির ঘাটের সঙ্গে মিলে গিয়ে 'তিরপূর্ণির চরে' পরিণত হয়েছে। আর সেখানে 'বালি ঝুর ঝুর' করার দৃশ্যটিও সম্ভবতঃ গৃহীত হয়েছে 'আয়রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই' ছড়াটির একটি পংক্তির স্মৃতি সূত্রে। পংক্তিটি হল, 'এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুর ঝুর করে।" আর উক্ত কবিতায় যে মেয়েটি ডুরে শাড়ি পরে চুল ঝাড়ছে সে যে 'ওপারে জন্তি গাছটি জন্তি বড়ো ফলে' ছড়ার অন্তর্গত দিগ্‌নগরের মেয়েগুলিরই অন্যতম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।—

"দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে বসেছে।
মোটামোটা চুলগুলি গো পেতে বসেছে।।
চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে।
হাতে তাদের দেব শাঁখা মেঘ লেগেছে।
গলায় তাদের তক্তিমালা রক্ত ছুটেছে।
পরনে তাদের ডুরে শাড়ি ঘুরে পরেছে।।

অতঃপর বিশেষ ভাবে মনে পড়ে 'সেঁজুতি' কাব্যের 'নতুনকাল' (২৫শে মে, ১৯৩৭) কবিতাটির কথা যার আরম্ভ প্রচলিত একটি ছড়ার প্রসঙ্গ দিয়ে। -

" কোন্-সে কালের কণ্ঠ হতে এসেছে এই স্বর—
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর'।"

কিন্তু এইভাবে সূচনা হলেও কবিতাটির কোথাও ছড়াটির বিষয়বস্তু বা ভাব প্রধান হয়ে ওঠেনি। ঐ একটি মাত্র পংক্তিই বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে, সমগ্র ছড়াটি বা তার কোন অংশ এখানে স্থান পায়নি। আসলে কবি বহুকাল পূর্বে শ্রুত এই ছড়াটির প্রসঙ্গ অবলম্বন করে তাঁর সুচিন্তিত ভাবনাকে এ কবিতায় অভিব্যক্ত করেছেন এবং সেইসঙ্গে

এক সুগভীর তত্ত্বকেও প্রকাশ করেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন, সমগ্র কবিতাটিতে তাঁর ঐ ভাবনা এবং তত্ত্বচিন্তাটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। আর এই সূত্রে কবিতাটির শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ ছড়াটির যে শাশ্বত আবেদনের কথা বলেছেন তার মূল্য ও গুরুত্ব সবদিক দিয়েই অপরিমেয়, বর্তমান আলোচনায় তো বটেই। এবার সে কথায় আসা যাক।

সুদূর অতীতকাল থেকে এই ছড়াটি লোকমুখে ধ্বনিত হতে হতে একালে এসে পৌঁছেছে। কবে কার কণ্ঠ থেকে এটি প্রথম নিঃসৃত হয়েছিল তা আজ সকলের অজানা। তবে অস্বীকার করবার উপায় নেই, ছড়াটির সেই একেবারে প্রথম যুগের শ্রোতাদের সঙ্গে এ যুগের শ্রোতাদের প্রভেদ অনেক। কারণ কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত, সমাজ-মানসিকতা, মানুষের প্রকৃতি, তাদের বিশ্বাস অবিশ্বাস, আচার-আচরণ, নানা প্রথা-সংস্কার সমস্তই আজ পরিবর্তিত। শুধু তাই নয়, লোকরুচির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের জগতেও অনেক পরিবর্তন এসেছে এবং বহু যুগের বহু কাব্য কবিতা কালের সীমাকে অতিক্রম করতে না পেরে স্তব্ধ হয়ে গেছে।—

"অনেক বাণীর বদল হল, অনেক বাণী চুপ,
নতুন কালের নটরাজা নিল নতুন রূপ।
তখন যে-সব ছেলেমেয়ে শুনেছে এই ছড়া
তারা ছিল আর এক ছাঁদে গড়া।
প্রদীপ তারা ভাসিয়ে দিত পূজা আনত তীরে,
কী জানি কোন্ চোখে দেখত মকর বাহিনীরে।"

এরপর রবীন্দ্রনাথ সেই প্রথম যুগের জীবন চিত্র ও তার বৈশিষ্ট্যকে সুচারুরূপে অঙ্কিত করেছেন এবং তারপর অনুপ্রবেশ করেছেন মূল তত্ত্বটির মধ্যে। তিনি উপলব্ধি করেছেন, বর্তমানের মধ্যে যেমন অতীত যুগকে খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি ভবিষ্যতের মধ্যেও বর্তমান যুগের কোন চিহ্নকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ জীবন ও সংসার অনিত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে এও সত্য যে, বিশ্বপ্রকৃতি চিরন্তন এবং বিশেষ কাল ও জীবনসংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে অপরিবর্তনীয়। বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্যত্রও এই ভাবনাটির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় নানাভাবে।

সবশেষে কবি যে কথাটি বলতে চেয়েছেন তা হল, সার্থক সাহিত্যের মূল্য চিরন্তন; আর সেজন্যেই তা যুগাতিক্রম করে এসে নতুন কালের মানুষের মনে একই ভাবে রসাবেদন সৃষ্টি করে থাকে। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর' ছড়াটিও এই শাশ্বত মূল্যের অধিকারী বলেই তা নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতের মানুষের নিকটও তার আবেদন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে না।

"তখনো সেই বাজবে কানে কখন যুগান্তর—
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।"

মনে রাখা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লোকসাহিত্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গেও এ অংশটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

'আকাশ প্রদীপ' কাব্যের 'সময়হারা' (১/১/৩৯) কবিতাটিতেও জনপ্রিয় কতকগুলো

ছড়ার বিভিন্ন অংশ প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপিত হয়েছে, এর মধ্যে কোথাও কোথাও ছড়ার উপস্থিতি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ, আবার কোথাও বা তার শুধু আভাস বা ইঙ্গিত মাত্র অনুভূত হয়। এ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে আমাদের মূল বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্যেই কবির সমসাময়িক মানসিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রসঙ্গ একটু অনুধাবন করে দেখা দরকার।

বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়ে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি রচনা করেছেন। তখন তাঁর মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া চলছিল, সে বিষয়ে রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, ''পৌষ উৎসবের প্রায় সপ্তাহব্যাপী আনন্দ কোলাহল, উত্তেজনা ও সভা-সমিতির অন্তে কবির মন আত্মজিজ্ঞাসু হইয়াছে। কবির বয়স হইয়াছে, নূতন ভাবুক দলের সহিত যোগসূত্র জীর্ণ হইয়া আসিতেছে, এ অভিযোগ আজকাল শোনেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে 'আকাশ প্রদীপে'র উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছিলেন,

'তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনিনি।' বোধ হয় মনের এই পরিবেশে লিখিত হয় 'মাল্যতত্ত্ব' (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮) ও 'সময়হারা' (১লা জানুয়ারী, ১৯৩৯)— হাল্কা সুরে লঘুভাবে গভীর কথারই প্রকাশ।''

কিন্তু এ হল তৎকালীন রবীন্দ্রমানসিকতার একটি দিক মাত্র। তাছাড়াও তার অপর একটি দিক এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে আবার নতুন করে শৈশব মাধুর্যে পরিপূর্ণ ছড়ার রাজ্যে অবাধ বিচরণ শুরু করেছেন; ডঃ ক্ষুদিরাম দাশের ভাষায় কবির সে মানসিকতাকে 'বার্ধক্যের বাল্য' নামে অভিহিত করা যায়।

একদিকে পরিবর্তিত নতুন কালের সঙ্গে যোগসূত্র হারানোর অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার বেদনা, অপর দিকে 'বার্ধক্যের বাল্য'— এ দুয়ের সমন্বিত মনোভাবই অনেকটা পরিমাণে রয়েছে 'সময়হারা' কবিতাটি রচনার পশ্চাতে। হাল-আমলের ছাড়পত্রহীন পুতুল-ওলার জবানিতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কবিতাটির শুরুতেই দেখি, যুগের সঙ্গে সঙ্গে লোকের রুচির পরিবর্তনের ফলেই পুতুলওলার ভাগ্যও পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন কাল তাকে গ্রহণ করেনি। তাই তার তৈরী যে সব খেলনার এককালে পসার ছিল প্রচুর আজ তা একেবারে বিনষ্ট হয়েছে। আর এই পসার হারানোর সঙ্গে সঙ্গে সে ধীরে ধীরে বর্তমানের সঙ্গেও সংস্রব হারিয়ে ফেলেছে।

পুতুলওলার অদৃষ্টের এই নিদারুণ পরিহাসের চিত্রকে রূপদান করতে গিয়েই এখানে বারে বারে ছড়ার প্রসঙ্গ এসে পড়েছে; কখনও দেখি পুতুলওলা আপন মনে ছড়া আবৃত্তি করে চলেছে, আবার কখনও বা মানসচক্ষে দেখেছে ছড়ার কল্পজগতকে। মনে হয়, নতুন কাল থেকে দূরে সরে আসার ফলেই তার পক্ষে ছড়ার রাজ্যে অনুপ্রবেশ করা সহজ হয়েছে। কবিতাটি থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিলেই এই বক্তব্যের যাথার্থ্য অনুভূত হবে। যেমন—

"হাল আমালের. ছাড়পত্রহীন
অকিঞ্চনটা লুকিয়ে কাটায়..জোড়তাড়ার দিন।
ভাঙা দেয়াল ঢেকে একটা ছেঁড়া পর্দা টাঙাই,
ইচ্ছে করে, পৌষমাসের হাওয়ার তোড়টা ভাঙাই;
ঘুমোই যখন ফড়ফড়িয়ে বেড়ায় সেটা উড়ে,
নিতান্ত ভূতুড়ে।
আধপেটা খাই শালুক পোড়া; একলা কঠিন ভুঁয়ে
চেটাই পেতে শুয়ে
ঘুম হারিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
আউড়ে চলি আপন মনে—
"উড়কি ধানের মুড়কি দেব, বিন্নে ধানের খই
সরু ধানের চিঁড়ে দেব, কাগমারের দই।"

এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, এখানে পুতুলওলার 'আউড়ে চলা' ছড়াটি স্মরণ করিয়ে দেয়, 'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমাদের বাড়ী যেয়ো' ছড়াটির শেষ অংশের কথা—

"উড়কি ধানের মুড়কি দেব বিন্নি ধানের খই ;
গাছ পাকা রম্ভা দেব হাঁড়ি ভরা দই।।"

কিন্তু 'সময়হারা' কবিতার শেষ পংক্তিটি ঈষৎ পরিবর্তিত, যদিও উভয়ের মধ্যে আরোপিত ভাবের বিশেষ পার্থক্য নেই। মনে হয়, 'খোকোমণি দুধের ফেনি' ছড়াটির একটি অংশ 'সরু ধানের চিঁড়ে' এবং এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ছড়াটির 'কাগমারের দই' এক সঙ্গে মিশিয়েই কবির স্মৃতি সঞ্চারী ভাবাবিষ্ট মন এই নতুন পংক্তিটি রচনা করেছিল।

সে যাই হোক এবার মূল কবিতার প্রসঙ্গে আবার আসা যাক। এখানে আরও দেখা যায়, নতুন যুগে পুতুলওলার তৈরী পুতুল আর চলেনা বলেই তাকে পুতুলও আর গড়তে হয় না। ফলে কর্মহীন মধ্যাহ্নে পারিপার্শ্বিকের সমস্ত শ্রীহীনতা তার মনে ছড়ার কল্প চিত্রের উদ্বোধন ঘটাতে সহায়তা করে।—

"দুপুর বেলায় বেকার থাকি অন্যমনা
... ...
পানাপুকুর, ভাঙনধরা ঘাট,
অফলা এক চালতা গাছের চলে ছায়ার নাট।
চক্ষু বুজে ছবি দেখি — কাৎলা ভেসেছে,
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।"

এটিও যে প্রচলিত একটি ছড়ার অন্তর্গত 'বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে, দুপারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে" অংশটির প্রভাবে রচিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তারপরে আবার যখন পুতুলওলাকে বলতে শুনি, —

"রাতের বেলায় ডোমপাড়াতে কিসের কাজে
তাকধুমাধুম বাদ্যি বাজে।
তখন ভাবি, একলা ব'সে দাওয়ার কোণে
মনে-মনে
ঝড়েতে কাত জারুল গাছের ডালে ডালে
পিরভু নাচে হাওয়ার তালে।"

তখন আমাদের মনে পড়ে যায়, 'ডালিম গাছে' পরভু নাচে/ তাকধুমাধুম বাদ্দি বাজে' ছড়াটির কথা।

সকলের কাছ থেকে দূরে সরে আসা নিঃসঙ্গ জীবনের অখণ্ড অবসরের জন্যই পুতুলওলার পক্ষে ছড়ার জগতকে এমন একান্ত করে অনুভব করা সম্ভব হয়েছে। তার মনে হয়েছে, যদি তার ভাগ্য এমনভাবে বিড়ম্বিত না হত তবে এই কল্প-জগতের সঙ্গে তার পরিচয় এমন নিবিড় হত না। তাহলেও মনে রাখা প্রয়োজন, পুতুলওলা কঠোর বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে বলেই বাস্তবের মধ্যে ছড়ার কল্পনাকে এত সহজে এক সম্পূর্ণ ভিন্নতর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে। আর এই জন্যেই এই ভাবগভীর কথাটা এমন অনায়াসে লঘু সুরে সে বলে গিয়েছে। প্রসঙ্গতঃ পুতুলওলার ব্যক্তিত্বে কবি আপন সমকালীন ভাবনাকে কত নিবিড়ভাবে আরোপ করেছেন সে কথাও ভাববার মত।—

"শহর জুড়ে নামটা ছিল, যেদিন গেল ভাসি
হলুম বনগাঁবাসী।
সময় আমার গেছে বলেই সময় থাকে পড়ে,
পুতুল গড়ার শূন্য বেলা কাটাই খেয়াল গ'ড়ে।
সজনে গাছে হঠাৎ দেখি কমলাপুলির টিয়ে—
গোধুলিতে সূয্যিমামার বিয়ে;
মামি থাকেন, সোনার বরণ ঘোমটাতে মুখ ঢাকা,
আলতা পায়ে আঁকা
এইখানেতে ঘুঘুডাঙার খাঁটি খবর মেলে
কুলতলাতে গেলে।
সময় আমার গেছে ব'লেই জানার সুযোগ হল
কলুদ ফুল কাকে বলে, ঐ যে থোলো থোলো
আগাছা জঙ্গলে
সবুজ অন্ধকারে যেন রোদের টুকরো জ্বলে।"

এই কবিতাংশে 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' ছড়াটির অন্তর্গত 'কমলা পুলির টিয়েটা / সূর্যি মামার বিয়েটা।' বা 'হলুদ বনে কলুদ ফুল' প্রভৃতি পংক্তির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। আরও উল্লেখযোগ্য, এখানে কবির পরিণত মানসিকতার ছাপ সু স্পষ্ট। এছাড়া একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলেই অনুভব করা যায়, আলোচ্য কবিতাটির কতকগুলো

টুকরো টুকরো কথা যেমন 'হলুম বনগাঁবাসী', 'ঘুঘুডাঙার খাঁটি খবর মেলে' এবং 'কুলতলাতে গেলে' প্রভৃতির মধ্যে অন্য কয়েকটি ছড়ার ক্ষীণ আভাস বিদ্যমান।

রবীন্দ্র কবিতায় ছড়ার ভাবানুষঙ্গ সূত্রে আমাদের সর্বশেষ আলোচ্য কবিতা হল 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যের 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' কবিতাটি (২৮/৩/৩৯)

বহুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশে প্রচলিত দুটি ছড়া শুনেছিলেন, 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে / সুন্দরীরে বিয়া দিলেম ডাকাতের মেলে' এবং 'ঠিক দুক্ষুর বেলা ভূতে মারে ঢেলা।' অতঃপর একেবারে জীবনের শেষে সেই দুই ছড়ার স্মৃতিকে স্মরণ করে লিখলেন,—

"পাকুড় তলির মাঠে
বামুন মারা দিঘির ঘাটে
আদি বিশ্ব-ঠাকুরমায়ের আস্‌মানি এক চেলা
ঠিক দুক্ষুর বেলা
বেগ্‌নিসোনা দিক্ আঙিনার কোণে
ব'সে ব'সে ভুঁইজোড়া এক চাটাই বোনে
হলদে রঙের শুকনো ঘাসে।
সেখান থেকে ঝাপসা স্মৃতির কানে আসে।
ঘুম-লাগা রোদ্‌দুরে
ঝিম্ ঝিমিনি সুরে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাত দলের মেলে'।"

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, উক্ত কবিতাটির মধ্যে 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' ছড়াটির গুরুত্বই সর্বাধিক।

সমসাময়িক কালের বেদনাঘন বাস্তব ঘটনা ধারাই আসলে কবিকে সেই অতি পুরাতন ছড়াটির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। কারণ মূল ছড়াটির গভীরেও অতীত ইতিহাসের অনুরূপ ঘটনাই প্রচ্ছন্ন ছিল—আর সে বেদনাঘন সাধারণ ঘটনা হল নারী হরণের কদর্য কাহিনী। আলোচ্য কবিতাটিতেও ঠিক এ জাতীয় এক দুর্ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে দেখতে পাই। এ প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিবেশিত তথ্যও স্মরণযোগ্য ঃ—

"কবিতাটির মধ্যে গভীর একটি বেদনা প্রচ্ছন্ন। আমাদের আলোচ্য পর্ব বাংলা মুসলিম লীগের মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক শাসিত। সেই যুগে নারী হরণ ও নারী উৎপীড়ন ব্যাপারটা দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় অপমানিতা নারীর বেদনা পরিস্ফুট। চারিদিকে এক কাতর ধ্বনি —

"শাস্ত্র মানা অস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে—
'উপায় নাইরে নাই প্রতিকার' বাজে আকাশ জুড়ে।"

সেদিন অসহায়ভাবে বাঙালি মেয়েরা এই অপমান সহ্য করিয়াছিল, সংঘবদ্ধভাবে সমাজ প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হয় নাই।—

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।"

এইসব ঘটনা কবির মনে এমন গভীর রেখাপাত করেছিল যে, পুরনো ছড়াটির ব্যাখ্যার মূল্য সময়ের ব্যবধানে যা স্তিমিত হয়ে এসেছিল তাই আবার তীব্র অনুভবের প্রখর ফলকে পুরাতন ভাবানুষঙ্গকে যেন নবজন্ম দিল। কবি তাই লিখেছেন,

"সেই মরাদিন কোন্ খবরের টানে
পড়ল এসে সজীব বর্তমানে।
তপ্ত হাওয়ার বাজপাখি আজ বারে বারে
ছোঁ মেরে যায় ছড়াটারে,
এলোমেলো ভাবনাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে
টুকরো করে ওড়ায় ধ্বনিটাকে।
জাগা মনের কোন কুয়াশা স্বপ্নেতে যায় ব্যেপে
ধোঁয়াটে এক কম্বলেতে ঘুমকে ধরে চেপে।
রক্তে নাচে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'"

বর্তমান পর্যায়ের আরম্ভে আলোচনার যে পূর্ব পরিকল্পনা করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করলে এবার রবীন্দ্রকবিতায় ছড়ার রূপাঙ্গিকের প্রভাব প্রসঙ্গই আলোচিত হবার কথা। তবু কাব্যের আস্বাদনে অথবা রসসন্ধানে 'জল-অচল' ভাগ রচনা করা সম্ভব নয়। এখানেও সেজন্যে কল্পিত চতুর্থ দফা আলোচনার আগে 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি' এবং 'ছড়া' এই কাব্যত্রয়ী পৃথক এবং স্বতন্ত্র আলোচনার দাবী রাখে। সন্দেহ নেই, ছড়ার রূপাঙ্গিকের প্রভাব এইসব কবিতার মধ্যেও স্পষ্টভাবেই পড়েছে। কিন্তু তা ছাড়াও এদের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের কল্পিত 'চার দফা ওয়ারী' বিশ্লেষণের সীমায় বাঁধা যায় না। তাই আগে এদের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র মূল্য নিরূপণ করে আবার এদের আঙ্গিকধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরে আলোচনা করব যথাস্থানে।

'খাপছাড়া' প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে যে কথাটা উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে, এটিই রবীন্দ্রনাথের সেই প্রথম কাব্য যাকে ছড়ার কাব্য নামে অভিহিত করা যায়। এর অন্তর্গত প্রত্যেকটি কবিতাতে ছড়ার ব্যঞ্জনা সুপরিস্ফুট; তদুপরি এদের মধ্যে এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যার জন্য এসব কবিতাকে কবিতা না বলে 'ছড়া' বলাই সঙ্গত। অবশ্য অস্বীকার করবার উপায় নেই, এরা প্রচলিত কোন লৌকিক ছড়া অবলম্বনে রচিত নয়, সম্পূর্ণ রূপেই রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সৃষ্টি এবং একান্তভাবেই তাঁর সচেতন মনের প্রয়াস। এর আগে তাঁর কোন কোন কাব্যের কিছু কিছু কবিতাতে ছড়ার বিষয়, ভাব বা প্রসঙ্গ মাত্র উপস্থাপিত হয়েছে কিন্তু এই রকম ভাবে নিছক ছড়া বা ছড়ার কাব্যরচনা রবীন্দ্র লেখনীতে এই প্রথম।

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতানুসারে আলোচ্য ছড়াসমূহকে সাহিত্যিক ছড়া আখ্যা দেওয়া যায়। এবং সাহিত্যিক ছড়ার সংজ্ঞার্থ নিরূপণে তিনি যা বলেছেন তাও আমাদের

বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।—

"বৈজ্ঞানিক যুগের আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত, আজকালের কবিগণ ছেলেভুলানো, মেয়েলি বা ঘুমপাড়ানি ছড়ার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া যে সমস্ত ছড়া রচনা করিয়াছেন, তাহাদেরই আমরা সাহিত্যিক ছড়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।................ বিবর্তনের ধারায় সমাজ মানসের নেপথ্য প্রেরণা ও কবিমনের সুনিবিড় সাধনায়, লৌকিক ছড়ার পাশাপাশি সাহিত্যিক ছড়ার প্রবাহ পৃথিবীর সমস্ত দেশেই বর্তমান। ইহারা সচেতন প্রতিভার সৃষ্টি হইলেও জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কার যে উহাদের পিছনে বিশেষ ভাবে সক্রিয় তাহা অস্বীকার করা যায় না, ইহাদের লৌকিক রসাবেদন সর্বত্র অক্ষুণ্ণ না থাকিলেও লৌকিক রঙ যতদূর সম্ভব উজ্জ্বল আছে। ইহারা যেন জাতীয় রস সংস্কারের ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া যুগোপযোগী চিন্তায় নিজেকে পুনর্গঠিত করিয়াছে।"

বক্তব্যের সমর্থনের জন্য 'খাপছাড়া' থেকে তিনি যে উদাহরণ দিয়েছেন তাকে আশ্রয় করেই আমরা এ সম্পর্কে আমাদের মতামতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করব প্রথমে, যেমন—

"বরের বাপের বাড়ি
যেতেছে বৈবাহিক,
সাথে সাথে ভাঁড় হাতে
চলেছে দই-বাহিক।
পণ দেবে কত টাকা
লেখাপড়া হবে পাকা,
দলিলের খাতা নিয়ে
এসেছে সই-বাহিক।

এর মধ্যে অভিব্যক্ত বিবাহের পণ ঠিক করার উদ্দেশ্যে পাত্রের পিতার গৃহাভিমুখে কন্যার পিতার যাত্রার দৃশ্যটি বাংলাদেশের চিরাচরিত ব্যবহারিক জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। ছড়া প্রভৃতি বাংলা লোকসাহিত্যে এই পণ দেওয়া-নেওয়ার চিত্রটি রূপায়িত হয়েছে নানাভাবে। কিন্তু লোক কবির রচনার সঙ্গে এ কবিতাটির রসাবেদনে পার্থক্য অনেক। এই ছড়া কবিতাটি পড়লেই বোঝা যায় এটি আধুনিক সমাজ সচেতন শিল্পী মনের সৃষ্টি এবং কতকগুলো শব্দের ব্যবহারই এই ধারণাকে আরও সুদৃঢ় করে তুলতে সহায়তা করে। যেমন বৈবাহিক শব্দটির প্রয়োগ যদিও বা লোককবির পক্ষে অসম্ভব নাও হয়, তবু পরবর্তী অন্তমিল 'দই-বাহিক', 'সই-বাহিক' শব্দ অবশ্যই আধুনিক কবির পরিশীলিত মনের রচনা। শুধু তাই নয়, এই সব শব্দসমূহের ব্যঞ্জনাও লোকসাধারণের পক্ষে অনুভব করা সম্ভব নয়। আসলে রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে চিরাচরিত বিষয়কে নিজের মত করে পরিশীলিত ও যুগোপযোগী করে নিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আমরা আরও স্মরণ করতে পারি বাইশ সংখ্যক ছড়ার শেষ স্তবকটি।—

"ধরাতল কম্পিত
পশু প্রাণী লম্ফিত,

রাণীরা মূর্ছা যায়
আড়ালেতে পর্দার।"

আবার ঐ কাব্যের চার সংখ্যক কবিতাটি বর্তমান আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে রবীন্দ্রনাথ ছড়া ও রূপকথার চিরপরিচিত রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে এবং তাদের কার্যকলাপকে যেভাবে রূপদান করেছেন এবং সেই সূত্রে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন তা যে কোন লোককবির কল্পনারও অতীত বলেই মনে হয়। আর এই সব কারণে আধুনিক পাঠকের নিকটই এর আবেদন—

"কাঁচড়াপাড়াতে এক
ছিল রাজপুত্তর,
রাজকন্যাকে লিখে
পায় না সে উত্তর।
টিকিটের দাম দিয়ে
রাজ্য বিকাবে কি এ;
রেগেমেগে শেষকালে
বলে ওঠে দুত্তোর!
ডাকবাবুটিকে দিল
মুখে ডাল কুত্তোর।"

এ জাতীয় উদাহরণ আরও যথেষ্ট পাওয়া যায় ঐ সব কাব্যে। অলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় উদ্ধৃতির অধিক ব্যবহার পরিহার করাই সমীচীন বোধ করছি।

বস্তুতঃ বিশেষজ্ঞরা যাকে সাহিত্যিক ছড়া বলেছেন, এরই মধ্যে তার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। কোন কোন সমালোচক আবার এই 'খাপছাড়া'র কবিতাসমূহের সঙ্গে সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' কবিতাবলীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। আসলে 'আবোল তাবোল' জাতীয় ছড়া কবিতাও ছড়ারই এক বিশেষ পর্যায়-- অনেকেই এই অভিমত পোষণ করেন। ইংরেজীতে এ জাতীয় কবিতাকে বলা হয়ে থাকে Nonsense verse; যার বৈশিষ্ট্য হল ভাবে ভাষায় ছন্দে অপ্রত্যাশিতের সমাবেশ; যেখানে যেটি আশা করা যায় তার ব্যতিক্রম ঘটিয়েই ছড়ার শিল্পী এর মধ্যে কৌতুক রসের সৃষ্টি করে থাকেন। সুকুমার রায়ও আসলে তাই করেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ—

"বইখানা (আবোল তাবোল) প্রকাশিত হওয়ার পরে যত কিম্ভূত রসের কবিতা লিখিত হয়েছে, সমস্তই অল্পবিস্তর 'আবোল তাবোল' দ্বারা প্রভাবিত, এমনকি রবীন্দ্রনাথও ব্যতিক্রান্ত নন। 'খাপছাড়া'র অনেক কবিতা যেমন, "ক্ষান্ত বুড়ির দিদি শাশুড়ির / পাঁচবোন থাকে কাল্‌নায়, / শাড়িগুলো তারা উননে বিছায়, /হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়, / আবোল তাবোল এর 'ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজার' কথা মনে পড়িয়ে দেয়। .... এর মূল রস কিম্ভূত রস। নবরসের তালিকায় এর নামটি পাওয়া যায় না। ইংরেজীতে একে নাকি nonsense বলে।"

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, খাপছাড়ার রচনাকাল ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৪৩-৪৪ বঙ্গাব্দ, এবং সুকুমার রায়ের মৃত্যু ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে। তার আগেই বিভিন্ন সময়ে 'সন্দেশ' পত্রিকায় 'আবোল তাবোল' এর কবিতাগুচ্ছ এবং এ জাতীয় আরও অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। সুতরাং এ বিষয়ে অধ্যাপক বিশীর মন্তব্য অবশ্যই মূল্যবহ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায়ের রচনার আপেক্ষিক মূল্য নির্ণয়ের বিষয় আমাদের অনুসন্ধানের প্রসঙ্গ বহির্ভূত। বর্তমান উপলক্ষ্যে খাপছাড়ার সাহিত্যিক ছড়ায় রবীন্দ্রনাথ কিভাবে কিম্ভূত অথবা উদ্ভট রসের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তা আমাদের সবিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়।

খাপছাড়ার অধিকাংশ ছড়া-কবিতাতেই উক্ত কিম্ভূত রসের প্রাধান্য অনুভব করা যায়। যেমন—

"দাড়ীশ্বরকে মানত ক'রে
গোঁপ-গাঁ গেল হাবল—
স্বপ্নে শেয়াল-কাঁটা-পাখি
গালে মারল ছোবল,
দেখতে দেখতে ছাড়ায় দাড়ি
ভদ্রসীমার মাত্রা—
নাপিত খুঁজতে করল হাবল
রাওল-পিণ্ডি যাত্রা।
উরদু ভাষায় হাজাম এসে
বকল আবল তাবল
তিরিশটা খুর একে একে
ভাঙল যখন পটাৎ
কামার টুলি থেকে নাপিত
আনল ডেকে হঠাৎ
যা হাতে পায় খাঁড়া বাটি
কোদাল করাত সাবল।"

কবিতাটির উদ্ভট বিষয়ের অসম্ভাব্যতা মনে কোন সংশয়ের সৃষ্টি করে না, কারণ প্রথম থেকেই উদ্ভট ভাবনার ভাবপরিমণ্ডল সার্থক ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে সংশয় অসংশয়ের পরিবর্তে কৌতুক রসই জমাট বেঁধে ওঠে। এমনকি পরিণত মনেও তা কৌতুক মিশ্রিত আনন্দের অনুভূতিই জাগায়।

যদিও আপাতদৃষ্টিতে এর বিষয়বস্তুতে বা ভাবে কোন লৌকিক ছড়ার প্রলেপ দেখতে পাওয়া যায় না, তবুও অসংগত ঘটনা, অসম্ভব পরিস্থিতি যা লৌকিক ছড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তা এর মধ্যে স্পষ্টরূপেই বিদ্যমান।

আবার অন্য একটি ছড়ায় দেখি বাস্তব এবং অবাস্তব ঘটনার একত্র সমাবেশ ঘটেছে, তাও আবার অসংলগ্নভাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা রসগ্রাহী মনকে আঘাত করে না।

নাম তার সন্তোষ
জঠরে অগ্নিদোষ
হাওয়া খেতে গেল সে পচম্বা।

নাকছাবি দিয়ে নাকে
বাঘনা পাড়ায় থাকে
বউ তার বেঁটে জগদম্বা।

ডাক্তার গ্রেগসন
দিল ইনজেকশন।
দেহ হল সাতফুট লম্বা।
এত বাড়াবাড়ি দেখে
সন্তোষ কহে হেঁকে,
অপমান সহিব কথম্‌বা।
শুন ডাক্তার ভায়া।
উঁচু কর মোর পায়া,
স্ত্রীর কাছে কেন রব কমবা।
খড়ম জোড়ায় ঘষে
ওষুধ লাগাও কষে
শুনে ডাক্তার হতভম্বা।''

এখানে সন্তোষের পচম্বায় হাওয়া খেতে যাওয়ার ঘটনা আমাদের ততটা বিস্মিত করে না যতটা করে ডাক্তার গ্রেগসনের ইনজেকশনের গুণে অর বউ বেঁটে জগদম্বার দেহ সাতফূট লম্বা হওয়ার ঘটনাটি। লক্ষ্যণীয়, এই দুটি ঘটনার মধ্যে এখানে কোনও পারম্পর্যও রক্ষিত হয়নি। এরা আপনা থেকেই ছড়াটির মধ্যে পর পর স্থান করে নিয়েছে। এই ঘটনা দুটি ও তার পরবর্তী অংশরূপে বর্ণিত খড়মে ওষুধ ঘষে সন্তোষের লম্বা হওয়ার প্রচেষ্টার কাহিনী অদ্ভুত মনে হলেও বিসদৃশ মনে হয় না। বরং তা আমাদের মনে হাস্যরসেরই উদ্রেক করে। শিশুর নিকটও এর আবেদন অসামান্য।

এছাড়া 'পচম্বা'র সঙ্গে 'জগদম্বা', 'লম্বা', 'কথম্‌বা', 'কমবা' 'হতভম্বা' প্রভৃতি মিলকেও অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। এ ধরনের মিল ঘটানোও রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেই সম্ভব। একদিকে তাঁর লোকসাহিত্যের সংস্কার এবং অন্যদিকে পরিশীলিত মন — এ দুয়ের সমাবেশেই তা সম্ভবপর হয়েছে।

ছড়ার অপর একটি বৈশিষ্ট্য চিত্রধর্মিতা, এবং রবীন্দ্রনাথের মতে এইসব ছবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'স্বপ্নে'র মতই অদ্ভুত এবং 'স্বপ্নে'র মতই সত্যবৎ।

সাহিত্যিক ছড়ার মধ্যেও অনেক সময়ই অনুরূপ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় এবং তার নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের খাপছাড়াতেই মেলে। যেমন —

"হাজারিবাগের ঝোপে হাজারটা হাই
তুলেছিল হাজারটা বাঘে,
ময়মনসিংহের মাসতুতো ভাই
গর্জি উঠল তাই রাগে।
খেঁকশেয়ালের দল শেয়ালদহর
হাঁচি শুনে হেসে মরে অষ্টপ্রহর,
হাতি বাগানের হাতি ছাড়িয়া শহর
ভাগলপুরের দিকে ভাগে—
গিরিডির গিরিগিটি মস্ত বহর
পথ দেখাইয়া চলে আগে।
মহিশূরে মহিষটা খায় অড়হর
খামকাই তেড়ে গিয়ে লাগে।"

এই যে ছবিটি, একে আমরা কিছুতেই আজগুবি বলে উপেক্ষা করে যেতে পারি না। আরও অনেক কবিতাতেই এমন অদ্ভুত অথচ অকারণ আনন্দ রসের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে ছড়ার আর এক শ্রেণীর ছবির উল্লেখ করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে ছড়ার আর এক শ্রেণীর ছবি আছে যা বর্ণনীয় বিষয় অবলম্বন করে একটা সমগ্র ব্যাপার আমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত করে দেয়। হয়তো একটা তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখে সমস্ত বঙ্গগৃহ বঙ্গসমাজ জীবন্ত হয়ে উঠে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

দীর্ঘদিন পরে তিনি যখন নিজে ছড়া রচনা করেছেন, তখনও তিনি তার মধ্যে এ জাতীয় চিত্রকে অঙ্কিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন : তবে তার মধ্যে হয়তো সমাজের প্রতি একটু সূক্ষ্ম বিদ্রূপও অভিব্যক্ত হয়েছে কখনও কখনও। যেমন—

"কনের পণের আশে
চাকরি সে তেজেছে।
বারবার আয়নাতে
মুখখানি মেজেছে।
হেনকালে বিনা কোনো কসুরে
যম এসে ঘা দিয়েছে শ্বশুরে'।
কনেও বাঁকালো মুখ—
বুকে তাই বেজেছে
বরবেশ ছেড়ে হীরু
দরবেশ সেজেছে।"

এর মধ্যে বাংলাদেশের সমাজচিত্রের একটি বিশেষ দিকের সামগ্রিক রূপটি কৌতুকের ভাষায় সুপরিস্ফুট।

তাঁর আরও অনেক কবিতায় এমন অনেক তির্যক ইঙ্গিত রয়েছে যা শিশুর পক্ষে উপলব্ধি করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও উদ্ভট রসের প্রাচুর্যে এই সকৌতুক কবিতাগুলোর আবেদন সকলের নিকটই অসামান্য। যথা —

"গুপ্তিপাড়ায় জন্ম তাহার;
নিন্দাবাদের দংশনে
অভিমানে মরতে গেল
মোগল সরাই জংসনে;
কাছা কোঁচা ঘুচিয়ে গুপি
ধরল ইজের, পড়ল টুপি,
দুহাত দিয়ে লেগে গেল
কোফ্‌তা কাবাব দংশনে
গুরু পুত্র সঙ্গে ছিল—
বললে তারে 'অংশ নে।"

বস্তুতঃ কবির সূক্ষ্ম মননশীল ব্যক্তিত্বই তাঁর এ জাতীয় ছড়া রচনার প্রেরণা বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এর মধ্যে লঘুতা ও কৌতুকাতিরিক্ত সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের ঝাঁজ সুস্পষ্ট। আরও লক্ষ্যণীয়, এক্ষেত্রে অনেক সময়ই তাঁর লেখনীতে ছড়া তার লোকায়ত রূপটি সর্বতোভাবে বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি। যেমন—

"টেরিটি বাজারে তার
সন্ধান পেনু—
গোরা বোষ্টম বাবা
নাম নিল বেনু।
শুদ্ধ নিয়মমতে
মুরগির পালিয়া,
গঙ্গা জলের যোগে
রাঁধে তার কালিয়া—
মুখে জল আসে তার
চরে যাবে ধেনু।
বড়ি করে কৌটায়
বেচে পদরেণু।"

অপর একটি ব্যঙ্গাত্মক ছড়াও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কবি সুকৌশলে এর মধ্যে অসঙ্গতির রসটি উৎসারিত করেছেন।—

"ঘাসে আছে ভিটামিন, গোরু ভেড়া অশ্ব
ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে, আঁখি মেলে পশ্য।

অনুকূলবাবু বলে, 'ঘাস খাওয়া ধরা চাই।

কিছুদিন জঠরেতে অভ্যেস করা চাই—
বৃথাই খরচ ক'রে চাষ করা শস্য।

গৃহিনী দোহাই পাড়ে মাঠে যবে চরে সে,
ঠেলা মেরে চলে যায় পায়ে যবে ধরে সে—
মানব হিতের ঝোঁকে কথা শোনে কস্য।

দুদিন না যেতে যেতে মারা গেল লোকটা,
বিজ্ঞানে বিঁধে আছে এই মহা শোকটা,
বাঁচলে প্রমাণ শেষ হ'ত যে অবশ্য।"

যদিও এর বিষয়বস্তু এবং 'পশ্য', 'কস্য' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগের মধ্যে কবির মৌলিকতা, আধুনিকতা এবং সুকর্ষিত মনোভাবের ছাপ সুস্পষ্ট, তবুও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্যে একে ছড়া বলে চিনতে কারো ভুল হবে না। আবার নিতান্ত কৌতুকের বশেই কবি যখন লেখেন—

"মেছুয়া বাজার থেকে
পালোয়ান চারজন
পরের ঘরেতে করে
জঞ্জাল-মার্জন।
ডালায় লাগিয়ে চাপ
বাক্সো করেছে সাফ,
হঠাৎ লাগালো গুঁতো
পুলিসের সার্জন।

কেঁদে বলে 'আমাদের
নেই কোনো গার্জন,
ভেবেছিনু হেথা হয়
নৈশ বিদ্যালয়—
নিখরচা জীবিকার
বিদ্যা উপার্জন।' "

তখন তা সর্ব বয়সের পাঠকের মনেই হাস্যরসের খোরাক জোগায়। কিন্তু বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, এর ঘটনাধারার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই, অসাধারণত্বও নেই। নিতান্তই সাধারণ ঘটনাগুলো পারম্পর্য রক্ষা করে একে একে উপস্থিত হয়েছে কবিতাটির মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপস্থাপনার কৌশলে একে ছড়ারই সগোত্র বলে মনে হয়। আরও উল্লেখযোগ্য এর মধ্যে যে ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা চিরাচরিত ছড়ার অনুরূপ নয়, বরং তা সাহিত্যিক ছড়ারই অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য অনেক ছড়াতেই এ

ধরনের ব্যবহার প্রচুর লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কখনও কখনও দেখি কবি সাধারণ ছড়ার বিষয়ের অনুরূপ বিষয়বস্তু অবলম্বন করে 'সাহিত্যিক ছড়া' রচনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাদের আকৃতিতে ছড়ার ধর্ম কিছুটা রক্ষিতও হয়েছে। অথচ প্রকৃতিতে ছড়ার ধর্ম রক্ষা করা অনেক সময়ই কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি।—

"বিড়ালে মাছেতে হল সখ্য।
বিড়াল কহিল, 'ভাই ভক্ষ্য,
বিধাতা স্বয়ং জেনো সর্বদা কন তোরে—
ঢোকো গিয়ে বন্ধুর রসময় অন্তরে,
সেখানে নিজেরে তুমি সযতনে রক্ষ।
ঐ দেখো পুকুরের ধারে আছে ঢালু ডাঙা,
ঐখানে শয়তান বসে থাকে মাছরাঙা,
কেন মিছে হবে ওর চক্ষুর লক্ষ্য।' "

এর মধ্যে ছড়ার সরল কৌতুকটি অনুভব করা গেলেও তার হালকা চাল এবং লঘু সুরটা প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে এবং এর অধিকাংশই শিশু বা কিশোরের পক্ষে অনুধাবন করা কঠিন। এ প্রসঙ্গে এ কাব্যের আর একটি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে, যা কিশোর বা শিশুমনের পক্ষে রসগ্রহণের অনুকূল নয়।—

"ধীরু কহে শূন্যেতে মজো রে,
নিরাধার সত্যেরে ভজো রে।
এত বলি যত চায় শূন্যেতে ওড়াটা
কিছুতে কিছু না পানে পৌঁছেনা ঘোড়াটা,
চাবুক লাগায় তারে সজোরে।
ছুটে মরে সারারাত, ছুটে মরে সারাদিন--
হয়রান হয়ে তবু আমিহীন ঘোড়াহীন
আপনারে নাহি পড়ে নজরে।"

এখানে কবি সহজ সুরে সহজ কথা না বলে সহজ সুরে গভীর কথাই শোনাতে চেয়েছেন পাঠককে। আর সেই কারণে এর মধ্যে লোক-জীবনরসও অনুপস্থিত।

শিশু বা কিশোর মনের নিকট 'শূন্যেতে মজো রে', 'নিরাধার সত্যেরে ভজো রে', বা 'আমিহীন ঘোড়াহীন আপনারে নাহি পড়ে নজরে' প্রভৃতি কথার কোন বিশেষ রসাবেদন আছে বলে মনে হয় না; উপরন্তু কেবলমাত্র বিদগ্ধ মানস ব্যতীত আর কারও পক্ষে এর প্রকৃত রস আস্বাদন করা কঠিন বলেই মনে হয়।

এবার এ কাব্যের আর একটি কবিতার কথা অলোচনা করব যার মধ্যে কবি সংলাপ সৃষ্টি করে বৈচিত্র্য সম্পাদন করতে চেয়েছেন। অতএব কবিতাটি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আমাদের দেশে প্রচলিত লৌকিক ছড়াগুলোর মধ্যে সংলাপধর্মিতা বা কথোপকথনের ভঙ্গিটি কিন্তু একেবারে অপরিচিত নয়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিখ্যাত ছড়াটির কথা—

"আমার কথাটি ফুরোল / নটেগাছটি মুড়োল / ...." প্রভৃতি। এর সঙ্গে সকলেরই অল্প বিস্তর পরিচয় আছে বলেই সম্পূর্ণ ছড়াটি আর উদ্ধৃত করা হল না। এছাড়া 'বিড়াল ও কুকুর' 'ব্যাঙ ও হাতি' প্রভৃতির সরস বাক্যালাপকে অবলম্বন করেও অনেক ছড়াই রচিত হয়েছে। এদের মধ্যে ছড়ার অন্তরঙ্গ রূপটি খুবই স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ ভৃত্য তিনকড়ি ও কর্তার পারস্পরিক উক্তি - প্রত্যুক্তিকে নিয়ে ছড়া কবিতাটি রচনার সময় এ জাতীয় সংলাপধর্মী ছড়ার দ্বারা কতটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলা যায় না, তবে একেবারে যে হননি এমন কথাও কি বলা যায়? মনে রাখা প্রয়োজন, কবি সচেতন ভাবেই এর মধ্যে সংলাপ সৃষ্টি করেছেন; আর সেজন্যেই কবিতাটির বহিরঙ্গে সংলাপধর্মী ছড়ার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হলেও অন্তর ধর্মে এটি পুরোপুরি ছড়া হয়ে উঠতে পারেনি। তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, কবিতাটির অনাবিল সহজ কৌতুকরসের ছটা আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের মনেই আনন্দ সঞ্চারিত করে।

'খাপছাড়া'য় আর এক শ্রেণীর কবিতা দেখা যায় যা প্রকৃতিতে তো নয়ই, আকৃতিতেও পুরোপুরি ছড়া হয়ে উঠতে পারেনি। যদিও এ কাব্যে ছড়াসৃষ্টিই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল। উদাহরণ স্বরূপ পঞ্চদশ সংখ্যক কবিতাটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে, যাকে ছড়া কবিতা না বলে রোমাণ্টিক কবিতা বললেও ভুল হবে না।

"স্বপ্নে দেখি নৌকা আমার
নদীর ঘাটে বাঁধা;
নদী কিম্বা আকাশ সেটা
লাগল মনে ধাঁধাঁ।
এমন সময় হঠাৎ দেখি,
দিক্ সীমানায় গেছে ঠেকি
একটুখানি ভেসে-ওঠা
ত্রয়োদশীর চাঁদা।
'নৌকোতে তোর পার করে দে'
এই ব'লে তার কাঁদা।
আমি বলি, ভাবনা কী তায়,
আকাশ পারে নেব মিতায়—
কিন্তু আমি ঘুমিয়ে আছি
এই যে বিষম বাধা,
দেখছ আমার চতুর্দিকটা
স্বপ্ন জালে ফাঁদা।"

খাপছাড়ার ঠিক পরের বছরই ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় 'ছড়ার ছবি'। কাব্যটির নামকরণ থেকেই অনুমান করা যায়, কবি এর মধ্যে ছড়াই সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এবং এ ধারণা আরও দৃঢ়তর হয় কাব্যের ভূমিকা থেকে। সেখানে তিনি এর অন্তর্গত রচনা সমূহকে 'ছড়া' নামেই অভিহিত করে বলেছেন "এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্য লেখা।

সবগুলো মাথায় এক নয়; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয়নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।"

এখন এই রচনাসমূহ প্রকৃত পক্ষে কতখানি ছড়ার গুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পেরেছে এবং কতখানি শিশুদের উপযোগী হয়ে উঠেছে, সেটাই আমাদের প্রধান অনুসন্ধানের বিষয়। সুতরাং লৌকিক ছড়ার সঙ্গে এদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কতটা সে সম্পর্কেও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

সাধারণভাবে আমরা ছড়া বলতে যা বুঝি, এ কবিতাগুলো ঠিক সে জাতের নয়, এদের জাত আলাদা। প্রথমতঃ এদের অধিকাংশেরই আয়তন খুব দীর্ঘ। প্রচলিত ছড়ার মধ্যে আয়তনের এমন দীর্ঘতা দুর্লভ বললেই চলে। দ্বিতীয়তঃ এ কাব্যের অনেক কবিতার (রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে ছড়া) মধ্যেই কাহিনীর রস বেশ জমে উঠেছে। যেমন পিস্‌নি, যোগীন্‌দা, বুধু, কাশী, দেশান্তরী, অচলাবুড়ি, মাধো প্রভৃতি। যথার্থ ছড়ার মধ্যে এ ধরনের কাহিনী থাকে না বললেই চলে। বরং বলা যেতে পারে সেখানে কাহিনীর আভাস পাওয়া যায় মাত্র। তার থেকে শ্রোতাকে কাহিনী কল্পনা করে নিতে হয় নিজের মত করে। প্রসঙ্গতঃ 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' ছড়াটি উল্লেখযোগ্য। আবার কখনও দেখা যায় একই ছড়ার মধ্যে বিভিন্ন কাহিনীর টুকরো টুকরো অংশ বা চিত্র অসংহত বা অসংলগ্ন ভাবে ইতস্ততঃ ছড়ানো থাকে; অবশ্য তার জন্যে পাঠক বা শ্রোতার কারও পক্ষেই ছড়ার রস আস্বাদনে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু এ কাব্যের কবিতাগুলির কাহিনী সবই প্রায় সুসংহত এবং সুসংলগ্ন। এবং সেজন্যে তা অনেক ক্ষেত্রেই ছড়ার বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। তৃতীয়তঃ, ভাবের জটিলতাও কোন কোন ক্ষেত্রে আলোচ্য রচনাগুলোকে ছড়ার সীমানা উত্তীর্ণ করিয়ে কবিতায় রূপান্তরিত করেছে।

এছাড়া সাহিত্যিক ছড়ার যে অংশটিকে 'আবোল-তাবোল' জাতীয় ছড়া বলা হয় এবং খাপছাড়া কাব্যে যার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, তার সঙ্গেও এ কাব্যের রচনাসমূহের প্রভেদ অনেক। একমাত্র ছন্দ ব্যতীত ভাব বিষয়বস্তু বা অন্য কোন দিক দিয়েই এ দুই কাব্যের কবিতাসমূহের মধ্যে কোন ঐক্যই নেই। যদিও উভয়ের রচনাকালীন ব্যবধান মাত্র এক বৎসর। মনে হয় এ রচনাগুলোকে যদি ছড়া নামে অভিহিত করার কোন সার্থকতা থাকে তবে তা প্রধানতঃ ছন্দের জন্যই। সে প্রসঙ্গ পরে আসবে।

তাহলেও ছড়ার অপর বৈশিষ্ট্য হল এই, তা বহুলাংশে শিশুদের উপভোগ্য; এবং 'ছড়ার ছবি' কাব্যটিও মূলতঃ শিশুদের জন্যই লেখা। সুতরাং সঙ্গত কারণেই মনে হওয়া স্বাভাবিক, ছড়ার এই বৈশিষ্ট্যটি অন্ততঃ ঐ কাব্যটির মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, অধিকাংশ ছড়া শিশুদের জন্য রচিত হলেও সব শিশু কবিতাই ছড়া নয়। উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথেরই শিশু কাব্যটির উল্লেখ করা যেতে পারে। যে আলমোড়ায় বসে তিনি ছেলেদের জন্যে লেখেন 'ছড়ার ছবি'র ছড়াগুলি সেখানে বসেই চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে একই উদ্দেশ্যে রচনা করছিলেন 'শিশু'র অধিকাংশ কবিতা। উভয়

কাব্যের মধ্যে কালের দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও রচনার উদ্দেশ্যের মধ্যে নৈকট্য খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অস্বীকার করার উপায় নেই 'শিশু'র কবিতাগুচ্ছ একান্তভাবে 'শিশু' কবিতাই, এদের কোন ক্রমেই ছড়া বলা যাবে না। বিশেষজ্ঞের ভাষায় এদের 'শুদ্ধ সংস্কৃতির মননজাত কাব্য-চৈতন্যের শিশু সংস্করণ' বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিজে 'ছড়ার ছবি'র রচনাগুলোকে ছড়া নামেই অভিহিত করেছেন এবং বলাই বাহুল্য তা সাহিত্যিক ছড়া। এখন এ কাব্যটির ছড়ার রাজ্যে অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে শিশু কবিতা ও ছড়ার পার্থক্য নির্দেশক শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি অনুসরণ করে দেখা যাক। তিনি বলেছেন,

"সকল শিশু কবিতাই ছড়া নহে।............ছড়া এই শব্দটি শ্রবণ মাত্র একটি বিশেষ কাব্য বৈশিষ্ট্য আমাদের মনে ভাসিয়া উঠে, একটি সংস্কার অন্তরে সক্রিয় হইয়া উঠে। ইহারা শুধুমাত্র তাহাদের ছন্দপ্রকরণেই অন্যতর তাহাই নহে — ইহাদের বক্তব্যের মধ্যেও একটি স্বাতন্ত্র্য আছে, এই শ্রেণীর কবিতায় উদ্ভট বিষয় কখনও পরিপাটিভাবে শেষের দিকে অগ্রসর হয় না। কিন্তু শিশু কবিতার ছন্দ সাধারণতঃ পয়ার আশ্রয়। অধিকন্তু তাহাতে অসম্ভব বিষয়ের বর্ণনা থাকিলেও কখনো উদ্ভট অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। একটা সুষ্ঠু পরিণতি সেখানে সম্ভাব্য।"

অস্বীকার করবার উপায় নেই, ছন্দের দিক থেকে ছড়ার ছবির রচনাগুচ্ছ নিঃসন্দেহ ছড়ার পর্যায়ভুক্ত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু বক্তব্যের অসম্পূর্ণতা চিত্রের অসমীচীনতা এদের মধ্যে নেই বললেই চলে। অসম্ভব বিষয় যে এর কোন কোন কবিতায় একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু তারাও একটা সুষ্ঠু পরিণতির দিকেই অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং এদিক দিয়ে তাদের ছড়া নামে অভিহিত করতে সংশয় জাগাই স্বাভাবিক। তবে তা সত্ত্বেও এ কাব্যকে সাহিত্যিক ছড়া হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে যৌক্তিকতা হল এই, এর মধ্যে কবি প্রাকৃত বাংলাকে ব্যবহার করে ছড়ার চারিত্র্যকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। প্রাকৃত বাংলা শব্দই হচ্ছে ছড়ার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের নিয়ামক। তদুপরি উল্লেখযোগ্য, ছড়ার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থ প্রাধান্য পায় না—তার মধ্যে ধ্বনি এবং সুরই প্রধান। এ কাব্যেও তাই দেখা যায়, কবি স্বয়ং এ কাব্যের ভূমিকাতে যা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।—

"............এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছুটা দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।"

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য, এ কাব্যের অনেক কবিতাই নন্দলাল বসুর আঁকা স্কেচকে কেন্দ্র করে। আর সে কারণেই বোধ হয় এ কাব্যের চিত্রধর্মিতা খুব স্পষ্ট এবং অস্বীকার করার উপায় নেই, চিত্রধর্মিতা প্রচলিত ছড়ারও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আগেই বলেছি, প্রচলিত ছড়ার সঙ্গে এ কাব্যের প্রভেদ অনেক। আসলে এখানে রবীন্দ্রনাথ একদিকে মননশীল প্রবীণ কবি, অন্যদিকে লোকজীবন-রস-শিল্পী। তাই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় অবলম্বন করে তিনি কবিতা রচনা করতে চাইলেও তাঁর পরিশীলিত ব্যক্তিত্বই এদের পুরোপুরি লোকসাহিত্য হয়ে ওঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সূত্রে প্রথমেই ধরা যেতে পারে 'জলযাত্রা' কবিতাটির কথা। এর মধ্যে যে চিত্রটি প্রতিফলিত হয়েছে, তা লোকজীবনেরই প্রতিচ্ছবি। সহজ সুর ও ধ্বনির মাধুর্যে তা শিশুমনের উপযোগী হয়ে উঠেছে ঠিকই — তা সত্ত্বেও পরিণত মনকেও তা স্পর্শ করে গভীরভাবে। এবং কবিতাটির শেষ দুই পংক্তিতে অভিব্যক্ত যে ছবি,

"ভেঙে-পড়া ডিঙির মতো হেলে-পড়া দিন
তারা ভাসা আঁধার-তলায় কোথায় হবে লীন।"

তার রসে মনকে সিক্ত করতে যে সংবেদনশীলতার দরকার, তা পরিণত তথা সুকর্ষিত মনেরই সামগ্রী।

'ঝড়' বা 'ঘরের খেয়া' কবিতার মধ্যেও চিত্রধর্মিতা আছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে এর মধ্যে যে ভাবের গভীরতাও অনুভব করা যায় তা শিশু মনের উপযোগী নয়, লোকমানসেরও নয়।

কিন্তু 'ভজহরি', 'যোগীনদা' এবং 'কাশী' কবিতা তিনটি একেবারেই শিশুমনের সামগ্রী। উক্ত কবিতাত্রয়ী সাধারণ ছড়ার চেয়ে আকারে অনেক দীর্ঘ এবং কাহিনীযুক্ত। আর এর যে রস তাকে উদ্ভট-রসই বলা যেতে পারে অনেকটা পরিমাণে। এদের অন্তর্গত আজগুবি কাহিনী থেকে শিশুরা আনন্দ পায়, কৌতুক অনুভব করে এবং হাস্য রসের খোরাক পায়। এসব ঘটনাকে একেবারে অসম্ভব বলে তারা উড়িয়ে দিতে পারে না। সম্ভব এবং অসম্ভব এখানে পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একের প্রয়োজনে অন্যটি এসেছে। অর্থাৎ অবাস্তব হলেও এদের সুষ্ঠু পরিণতি দেখা যায়। তা সত্ত্বেও ছন্দ, ধ্বনি, ভাষা এবং সুরের জন্য এদের ছড়া বলে চিনতে ভুল হয় না।

পিসনি, খাটুলি, বুধু, দেশান্তরী, অচলাবুড়ি, সুধিয়া মাধো প্রভৃতি কবিতাও কাহিনীমূলক। কিন্তু বিষয়বস্তু বা ভাবের গভীরতায় এদের কিছুতেই ছড়া বলা যায় না, এবং এরা পরিণত মনে যতটা গভীর রেখাপাত করে, শিশুদের মনে ততটা করে না। আসলে এই কবিতাগুলিকে ছড়ার ছন্দে রচিত কবিতা নামে অভিহিত করা যতটা সহজ, নিছক ছড়া হিসেবে দেখা ততটা সহজ নয়।

এতদ্ব্যতীত এ কাব্যের 'রিক্ত','বাসাবাড়ি', 'আকাশ', 'খেলা', 'ছবি-আঁকিয়ে', 'পাথর পিণ্ড' এবং আরও অনেকগুলো কবিতার মধ্যে ছড়ার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না, বরং তারা কবিতার ভাব-গভীরতায় উজ্জ্বল বলেই মনে হয়।

'খাপছাড়া' এবং 'ছড়ার ছবি'র পরে একেবারে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে লেখা হয় 'ছড়া' কাব্যের বিভিন্ন কবিতা। রবীন্দ্রনাথের একেবারে জীবন সায়াহ্নে ছড়ার এই অনিবার্য কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,

"জীবনের ভার যখন গুরু, দেহ যখন জরাগ্রস্ত, মন যখন প্রকাশ-অনুকূলতার অভাবে ক্ষণে ক্ষণে স্তব্ধ হয়, তখন কবিচিত্ত আপামর অন্তর্বেদনাকে শমিত করার চেষ্টা করে হাস্য-উপহাসে। গাণিতিক নিয়মে curve এর মতন যেন ইহার গতিরেখা — কঠোর মননজাত কবিতা বা আত্মানুভূত রস-উদ্বেলিত গানের ধারার পরে এই বক্ররেখা গতিপথে হাসির পাথেয় খুঁজিয়া পায়। তাই জীবনের রস আজ মজ্জায় রসপ্রলাপ জাগায় ক্ষণে-

ক্ষণে। সে রসপ্রলাপ কখনো প্রহাসিনীর কৌতুকহাস্যে, কখনো ছড়ার প্রলাপে ব্যক্ত। এই সব ছড়া হালকা ভাবের মুক্ত শৃঙ্খলে কল্পনার পূর্ণ, দায়িত্ব জ্ঞানহীন আনন্দ কোলাহলে মুখর। শব্দের যোজনায়, বাক্যের বুননে, ছন্দের রণনে বিচিত্র, অদ্ভুত রূপসৃষ্টিতে মন বল্গা হারা। কবির এই ছড়ার সূত্রপাত হয় খাপছাড়া ও ' সে'র মধ্যে। তারপর 'ছড়ার ছবি' 'প্রহাসিনী'র মধ্য দিয়ে চলে হাসি ও গল্পের কবি প্রলাপ, গল্প-সল্পে তার শেষ। 'ছড়া' কাব্য খণ্ডের কবিতাগুলি লেখেন ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে। কালিম্পঙে শেষ অসুস্থতার পরেও লেখেন দুইটি।''

এখন 'ছড়া' কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ কাব্যের কবিতা সমূহকেও 'খাপছাড়া'র কবিতা গুচ্ছের মতই অনায়াসে সাহিত্যিক ছড়া বা 'আবোল-তাবোল' জাতীয় ছড়ার পর্যায়ভুক্ত করা যায়। যদিও প্রচলিত ছড়া এমনকি 'খাপছাড়া' র ছড়ার চেয়ে এদের আয়তন অনেক বেশী দীর্ঘ।

ভাবের অসম্পূর্ণতা, চিত্রের অসংলগ্নতা, কাহিনীর অবাস্তবতা প্রভৃতি ছড়ার প্রধান প্রধান বিশেষত্বগুলি সবই এই কবিতা গুচ্ছের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের মধ্যেও এ সবের অতিরিক্ত এমন কিছু আছে যা এদের লৌকিক রসকে বজায় রেখেও লোকায়ত রূপের অতীত একটি রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, শেষ জীবনে কবি ছড়া রচনা করলেও এখানে তিনি কেবলমাত্র ছড়া রচয়িতা নন, বিদগ্ধ কবিও । তাঁর কবি চেতনার এই দুটি দিকই আসলে তাঁকে সাহিত্যিক ছড়ার এমন সুস্পষ্ট রূপায়ণে সহায়তা করেছে।

অনেকবারই বলা হয়েছে, শৈশবেই কবির ছড়ার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল গভীরভাবে। দীর্ঘদিন পরে বয়স্ক কবি যেন এখানে তাঁর দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁর চেতনায় হারানো শৈশব আবার ফিরে এসেছে; আর তাই তাঁর চেতন ও অচেতন ভাবনা একাকার হয়ে গেছে বলেই এ ধরনের ছড়া সৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য, অবচেতন বা মনের অজ্ঞাত গহন থেকেই অসংলগ্ন ছড়া কবিতার জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ কাব্য রচনার সমসাময়িক কালে বলেছেন, ''অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। কেউ কিছু বুঝতে যদি না পারেন তাহলেই আশাজনক হবে।'' (অবচেতনার অবদান, শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬)

কিন্তু এসব ছড়া কবিতাসমূহ অবচেতন মনের সৃষ্টি হলেও এদের মধ্যে এমন অনেক আধুনিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, যা পরিণত দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচায়ক। সেই সঙ্গে আছে তাঁর পরিশীলিত মনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ যা আপাতদৃষ্টিতে হাস্যরসেরই প্রকাশ ঘটায়।

যেমন এ কাব্যের প্রথম কবিতাটিতে দেখা যায় অবাস্তব কাহিনী, অসংলগ্ন ভাব কৌতুকরস উৎপন্ন করেছে এবং তার আবেদন সকলের নিকটেই সমান। কিন্তু তারপরেই বিদগ্ধ কবি এর মধ্যে দেশীয় সমসাময়িক রাজনীতির প্রতি যে তির্যক ইঙ্গিতটি করেছেন তার গভীরে প্রবেশ করা শিশু ও লোকমানসের পক্ষে দুঃসাধ্য। এর থেকে কিছু অংশ

উদ্ধৃত করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।—

"লোকে বলে, কলঙ্কদল সূর্যলোকের আলো
দখল ক'রে জ্যোতির্লোকের নাম করেছে কালো।
তাই তো সবই উলট-পালট উপর নামল নীচে —
ভয়ে ভয়ে নিচু মাথায় সমুখটা যায় পিছে।
হাঁচির ধাক্কা এতখানি, এটা গুজব মিথ্যে—
এই নিয়ে সব কলেজ পড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে
অল্প কিছু লাগল ধোঁকা; রাগল অপর পক্ষে—
বললে পড়াশুনায় কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে,
অন্য দেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্তে কর্ সে।
এর পরে দুই দলে মিলে ইঁট পাটকেল ছোঁড়া—
চক্ষে দেখায় সর্ষের ফুল, কেউ বা হল খোঁড়া।
পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই,
সমুদ্দুরের এ পারেতে একেই বলে লড়াই।
সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি,
বাংলাদেশের তেঁতুল বনে চৌকিদারের হাঁচি।
সত্য হোক বা মিথ্যে হোক তা, আদম দিঘির পাড়ে
বাঁদর চড়ে বসে আছে রামছাগলের ঘাড়ে।
রামছাগলের দাড়ি নড়ে, বাজেরে ডুগডুগি—
কাৎলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগবুগি।"

'ছড়া' কাব্যের পাঁচ ও ছয় সংখ্যক কবিতা দুটিও বর্তমান আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ এদের মধ্যে সাহিত্যিক ছড়ার বৈশিষ্ট্যগুলি তো রয়েছেই, তদুপরি মাঝে মাঝে প্রচলিত ছড়াও এসে এখানে নিজের মত স্থান করে নিয়েছে অনায়াসে। অবশ্য বলাই বাহুল্য, তার জন্যে রসের কোন হানি ঘটেনি।

প্রথমে পাঁচ সংখ্যক কবিতাটির প্রসঙ্গে আসা যাক। এই সুদীর্ঘ ছড়া কবিতাটির মধ্যে একের পর এক বিভিন্ন ঘটনা বা চিত্র কোন ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে এসে উপস্থিত হয়েছে, এবং তারই মধ্যে একস্থানে প্রচলিত ছড়ার একটি অসংলগ্ন চিত্রও স্থান পেয়েছে প্রায় অপরিবর্তিত রূপে। যেমন—

"লখা চলে ছাতা মাথায়,
গৌরীকনের বর
ড্যাংড্যাঙাড্যাং বাদ্যি বাজে,
চড়ক ডাঙায় ঘর।"

এর সঙ্গে তুলসীর লৌকিক ছড়াটি হল এই—

"গৌরী বেটি কনে।
নকা ব্যাটা বর
ঢ্যাম কুড় কুড় বাদ্যি বাজে
চড়ক ডাঙায় ঘর।"

ছয় সংখ্যক ছড়া কবিতাটিতে কবি কৌতুক ছলে আমাদের দেশের গতানুগতিক জীবনধারা, অন্ধ সংস্কারের জড়তা ও মূঢ় মানসিকতাকে যেমন কটাক্ষ করেছেন তেমনি করেছেন সমগ্র ইউরোপ জুড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মারণযজ্ঞের আয়োজনকে। কবিতাটির একটি অংশে আবার কতকগুলো লৌকিক ছড়ার বিভিন্ন পংক্তিকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশব্যাপী যে অন্ধ তামসিকতা আমাদের শুভবুদ্ধিকে, মনের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকেই ব্যঞ্জিত করতে চেয়েছেন। এদিক থেকে প্রাসঙ্গিক কবিতাংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত করার প্রয়োজন অনুভব করছি।—

"দিন চলে যায় গুনগুনিয়ে ঘুম পাড়ানির ছড়া,
শান বাঁধানো ঘাটের ধারে নামছে কাঁখের ঘড়া।
আতাগাছের তোতাপাখি, ডালিম গাছে মৌ,
হীরেদাদার মড়মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বউ।
পুকুরপাড়ে জলের ঢেউয়ে দুলছে ঝোপের কেয়া,
পাটনি চালায় ভাঙা ঘাটে তালের ডোঙার খেয়া।
খোকা গেছে মোষ চরাতে, খেতে গেছে ভুলে,
কোথায় গেল গমের রুটি শিকের 'পরে তুলে।
আমার ছড়া চলেছে আজ রূপকথাটা ঘেঁষে,
কলম আমার বেরিয়ে এল বহুরূপীর বেশে।
আমরা আছি হাজার বছর ঘুমের ঘোরের গাঁয়ে
আমরা ভেসে বেড়াই স্রোতের শেওলা-ঘেরা নায়ে।
কচিকুমড়োর ঝোল রাঁধা হয়, জোড় পুতুলের বিয়ে,
বাঁধা বুলি ফুকরে ওঠে কমলাপুলির টিয়ে।
ছাইয়ের গাদায় ঘুমিয়ে থাকে পাড়ার খেঁকি কুকুর,
পান্তিহাটে বেতো ঘোড়া চলে টুকুর-টুকুর।
তালগাছেতে হুতোম থুমো পাকিয়ে আছে ভুরু,
তক্তিমালা হড়ম বিবির গলাতে সাত পুরু।
আধেক জাগায় আধেক ঘুমে ঘুলিয়ে আছে হাওয়া,
দিনের রাতের সীমানাটা পেঁচোয় দানোয়-পাওয়া।
ভাগ্যলিখন ঝাপসা কালির, নয় সে পরিষ্কার—
দুঃখসুখের ভাঙা বেড়ায় সমান যে দুই ধার।
কামারহাটার কাঁকুড়গাছির ইতিহাসের টুকরো,

ভেসে চলে ভাঁটার জলে উইয়ে-ঘুনে-ফুকরো।
অঘটন তো নিত্য ঘটে রাস্তাঘাটে চলতে,
লোকে বলে, সত্যি নাকি! —ঘুমোয় বলতে বলতে।

যে যে ছড়া বা তার অংশ উক্ত কবিতাংশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থান পেয়েছে সেগুলি হল—

১। আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মৌ।
২। হীরে দাদার মড়মড়ে থান ঠাকুরদাদার বৌ।
৩। আলতা নুড়ি, গাছের গুঁড়ি জোড় পুতুলের বিয়ে।
৪। খোকা যাবে মোষ চরাতে, খেয়ে যাবে কি।
আমার শিকের উপর গমের রুটি, তবলা ভরা ঘি।
৫। তালগাছেতে হুতোম থুমো
৬। হড়ম বিবি খড়ম পায়
৭। কমলা পুলির টিয়ে এবং কচিকুমড়োর ঝোল

এবং এ সমস্তই রবীন্দ্র সংগৃহীত 'ছেলেভুলানো ছড়ায়' সংকলিত যথাক্রমে ৫৫, ৩১ ৭০, ২১, ৬২ সংখ্যক ছড়ার অংশ বিশেষ। এখানে নির্দেশিত শেষ দুটি ছড়াংশ আগডুম বাগডুম ছড়াটি থেকে নেওয়া।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য সমসাময়িক কালে শান্তিনিকেতনে মাঘোৎসবে প্রদত্ত ভাষণের একটি অংশেও প্রায় অনুরূপ মনোভাবের একটুখানি আভাস পাওয়া যায়। তবে সেখানে তার প্রকাশ সম্পূর্ণ অন্যভাবে। তিনি সেখানে বলেছেন, "কেবল ভারতবর্ষে আমাদের রক্তের মধ্যে এমন একটা মুগ্ধতা আছে যে শিক্ষা সত্ত্বেও প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে নিয়মের অমোঘতার প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখতে পারিনে, অন্ধসংস্কার আমাদের বুদ্ধিকে পরিহাস করতে থাকে জাদুর প্রলোভন দেখিয়ে, তাকেই সনাতন ধর্মবিধান বলে মনে করি, জানিনে এই হল তমসাচ্ছন্ন নাস্তিকতা।" (পূর্ণের সাধনা, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৯৯)

এ কাব্যের 'কদমাগঞ্জ উজাড় করে/আসছিল মাল মালদহে/ বা 'গলদাচিংড়ি' তিংড়ি মিংড়ি' কিম্বা 'মাঝরাতে ঘুম এল, লাউ কেটে দিতে' প্রভৃতি কবিতা নিঃসন্দেহে আবোলতাবোল শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত।

'কদমাগঞ্জ উজাড় করে/ আসছিল মাল মালদহে' কবিতাটি যেদিন লেখেন সেদিনই তিনি বলেছেন, "আজ আমায় পাগলামিতে পেয়েছে। যা রোদ উঠেছে, কবির মাথায় মিলগুলোকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে মিলের স্কন্ধে চেপে।" আলোচ্য কবিতাটির মধ্যেও তাঁর এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

মনে রাখা প্রয়োজন, এই পাগলামির বশবর্তী হয়ে শুধু এই কবিতাটিই নয়, এজাতীয় অন্যান্য কবিতাও রচনা করেছেন, এবং সেই কারণেই এদের মধ্যে অসংলগ্ন প্রলাপ, অর্থহীন ভাব, সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব কাহিনী ও ঘটনা একই সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছে ও কৌতুক এবং হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

'ছড়া' কাব্যের কবিতাসমূহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সবশেষে বলা যায় যে, এর মধ্যে যা

বলা হয়েছে 'তা কিছু নাবালকের, কিছু সাবালকের; এবং তাতে খুশির প্রকাশ অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের।' অবশ্য একথা তাঁর শেষ জীবনের 'ছড়া কাব্যত্রয়ী' সম্পর্কেই সমভাবে প্রযোজ্য। এবং আরও উল্লেখযোগ্য, একথা রবীন্দ্রনাথ 'ছড়ার ছবি' কাব্যটির প্রসঙ্গেই বলেছিলেন।

এবার আমাদের আলোচনার চতুর্থ পর্যায় রবীন্দ্র কবিতায় ছড়ার আঙ্গিক বা গঠনশৈলীর প্রসঙ্গে আসা যাক। এ প্রসঙ্গে ছড়ার ছন্দই যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলা দেশের লোকসাহিত্য দীর্ঘদিন ধরেই ছড়ার ছন্দে রচিত হয়ে এসেছে, ভদ্রসাহিত্যের দরবারে তার স্থান হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বলেছেন, "ছড়ার ছন্দ প্রাকৃতভাষার ঘরাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্র সমাজে সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই।"

লক্ষ্যণীয়, রবীন্দ্রনাথ নিজে আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েও এই ছন্দটির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যে এর গুরুত্ব সম্পর্কেও সচেতন হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এই সুন্দর ছন্দই হল খাঁটি বাংলা ছন্দ এবং এর সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যের অন্তরের যোগ। আর এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি এই খাঁটি বাংলা ছন্দটিকে বহুকালের তুচ্ছতা ও অবজ্ঞা থেকে উদ্ধার করে তাকে নিঃসংকোচে সর্বপ্রকার রসসাহিত্যের বাহন হবার উপযুক্ত মর্যাদা দান করেছেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের হাতে ছড়ার ছন্দের আদিম প্রাকৃত রূপটি সুসংস্কৃত, সুগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

এই ছন্দে কবিতা রচনার প্রথম প্রয়াস দেখতে পাই ১২৮৭ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'ম্যাকবেথ' নাটকের ডাকিনী অংশের বাংলা অনুবাদে। বালক কবির ম্যাকবেথ অনুবাদ দেখে প্রীত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উপদেশ দেন যে নাটকের অন্যান্য অংশের চেয়ে ডাকিনীর উক্তি গুলির ভাষা ও ছন্দে কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত। বোধহয় সেই উপদেশ অনুসারে তিনি সেই অংশ নতুন করে ছড়ার ছন্দে লেখেন। সেই অনুবাদের আর সব অংশই হারিয়ে গিয়েছিল, কেবল ডাকিনীদের অংশটা অনেকদিন পরে ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
ঝড় বাদলে/আবার কখন/

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১
মিলব মোরা/তিনজনে।/

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১
ঝগড়া ঝাঁটি/থামবে যখন/

২ ১ ১ ২ ১ ১১
হার জিত সব /মিটবে রণে।/

এই ছন্দে বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ রীতি সম্পূর্ণ অব্যাহত আছে; যদিও

তিনজনে এবং মিটবে রণে এই দুটি পর্বের মধ্যে সঠিক সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি।

এরপরে প্রভাত সংগীত কাব্যের উৎসর্গ পত্রে এই ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
"আমায় দেখে/আসিস ছুটে/

১ ১ ১ ১ ১ ১
আমায় বাসিস/ ভালো/

.১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
কোথা হতে/পড়লি প্রাণে

১ ১ ১ ১ ১ ১
তুই রে উষার/ আলো/।"

এর থেকে অনুমিত হয় এই ছন্দোরীতির শক্তি ও সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে ঔৎসুক্য ও আস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এর অল্পকাল পরেই (১২৯০) শ্রাবণ সংখ্যা ভারতীতে 'সিন্ধুদূত' নামক কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন, "ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকে স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়।" এরপরে বলেছেন যে রামপ্রসাদী ছন্দ বাংলার স্বাভাবিক ছন্দ এবং যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদী ছন্দের অনুযায়ী হবে।

এই মানসিকতার বশবর্তী হয়েই সমসাময়িক কালে প্রথম রামপ্রসাদী ছন্দের উচ্চারণ তত্ত্বটিকে সচেতন ভাবে কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। যথা,—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
"ঘুমের মতো/মেয়েগুলি/

১ ১ ১ ১ ১১ ১১
চোখের কাছে/দুলি দুলি/

১ ১ ১১ ১ ১ ১১ ১১
বেড়ায় শুধু/নূপুর রণ/রনি।/

১ ১ ১১ ১ ১ ১ ১
আধেক মুদি/আঁখির পাতা/

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
কার সাথে যে/কচ্ছে কথা/

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
শুন্‌ছে কাহার/মৃদু মধুর/ধ্বনি।/

এখানে রামপ্রসাদী ছন্দের রীতি অনুসারে স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণের ধ্বনিগুলোকে

সম্পূর্ণ রূপেই কাজে লাগানো হয়েছে।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যেও এ ছন্দের প্রয়োগ আছে। ছড়া জাতীয় কবিতা ছাড়া উচ্চ ভাবের রচনায় এ ছন্দ চলবে কিনা এ বিষয়ে কবির মনে কতকটা সন্দেহ রয়ে গিয়েছিল বলে বোধ হয়। এরপর মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালি প্রভৃতি কাব্যে এ ছন্দে একটিও কবিতা রচনা করেননি। অবশেষে একেবারে দীর্ঘ বারো বছর পরে (১৮৯৭) আবার এ ছন্দের প্রতি মনোযোগী হন। এই লৌকিক ছন্দে রচিত একটি মাত্র কবিতা কল্পনা কাব্যে স্থান পেয়েছে। যেমন —

'কিসের তরে/ অশ্রু ঝরে/
কিসের লাগি/ দীর্ঘশ্বাস/
হাস্য মুখে/ অদৃষ্টেরে
করব মোরা/পরিহাস/''

এ কবিতা রচনার আরও দুবছর পরে তিনি এই লৌকিক ছন্দকে আশ্রয় করে আরও তিনটি কবিতা রচনা করেছিলেন। কবিতা তিনটি 'কথা' কাব্যের অন্তর্গত। কবির হাতে এই প্রাকৃত বাংলা ছন্দ ক্রমশঃ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত হয়ে সাহিত্যের সব প্রকার ভাব প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। যেমন—

''জলস্পর্শ/ করব না আর/
চিতোর রাণার পণ,/
বুঁদির কেল্লা/মাটির পরে/
থাকবে যত/ক্ষণ/।
কী প্রতিজ্ঞা!/হায় মহারাজ/
মানুষের যা/অসাধ্য কাজ/
কেমন করে/সাধবে তা আজ/
কহেন মন্ত্রি/ গণ/।
কহেন রাজা /সাধ্য না হয়/
সাধব আমার/পণ/।''

অতএব ছড়ার ছন্দ এখন আর কেবলমাত্র ছড়া জাতীয় বা লঘুসুরের কবিতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নেই। তা যে কোন প্রকার ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে; — রবীন্দ্রনাথ তার প্রমাণ দিলেন নানা ভাবের কবিতা রচনায় এই ছন্দ ব্যবহার করে। কাহিনীমূলক কবিতা রচনায়ও এ ছন্দ যে কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ পূর্বোক্ত কবিতাটি। তাছাড়া ঐ 'কথা' কাব্যেরই 'হোরি খেলা' এবং 'বিবাহ' কবিতা দুটি বর্তমান প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর 'ক্ষণিকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিলেন এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা ছড়ার ছন্দে লিখে। ছন্দ প্রয়োগ সম্পর্কে এখন তিনি নিঃসন্দেহ এবং দৃঢ় হস্ত। ক্ষণিকার ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে তিনি প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন,

''ওর ভাষা ছন্দ প্রভৃতি এতটা নতুন হয়েছে যে, যারা স্বাধীন রসগ্রাহী লোক নয়

তারা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেনা এটা তাদের ভালোলাগা উচিত কিনা—সুতরাং পনেরো আনা পাঠক ইতস্ততঃ করছে— আর যদি অধিককাল তাদের এই দ্বিধার মধ্যে ফেলে রাখা যায় তাহলে তারা চটেমটে বইটাকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করবে—একটা সমালোচনা পেলে তারা আশ্রয় পেয়ে বাঁচবে।"

ক্ষণিকার ছন্দ ও রীতির বৈশিষ্ট্য বাংলায় নতুন। এর আগে কয়েকটি কবিতায় অনুরূপ ছন্দ রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন ঠিকই, কিন্তু এই প্রথম তিনি ধারাবাহিক ভাবে প্রাকৃত বাংলা ভাষা ও প্রাকৃত বাংলা ছন্দ ব্যবহার করলেন। কবি নিজেই বলেছেন যে ক্ষণিকা কাব্য রচনার সময় প্রাকৃত ভাষার বেগ ও সৌন্দর্য তিনি প্রথম অনুভব করেন। তিনি অনুভব করলেন যে এ ভাষা ও ছন্দ কেবল মাত্র গ্রাম্য ভাবের বাহন নয়, এর গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির চেয়ে অনেক বেশী।

এ কাব্যে কবি গভীর কথাই শোনাতে চেয়েছেন। কিন্তু গভীর সুরে গভীর কথা শোনাবার আগ্রহ অনুভব করেননি বলেই প্রাকৃত ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন, "এই ছড়ায় গভীর কথা হালকা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাম্ভীর্যের গুমোর রাখেনা।"

বস্তুতঃ 'ক্ষণিকা' কাব্যে কবি ছড়ার ছন্দের আঙ্গিক নিয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কতরকম ভাবে এ ছন্দ যে কাব্যরচনার বাহন হতে পারে তা তিনি দেখিয়েছেন। যেমন—

"সে কহিল, ভাই,
নাই, নাই, নাইগো আমার
কারেও কাজ নাই।"

'না ই না ই' এই পর্বে দুটি ধ্বনি আছে, কিন্তু ধ্বনি দুটি সম্প্রসারিত হয়ে তিন মাত্রায় স্থান করে নিয়েছে। বলা বাহুল্য এরকম দৃষ্টান্ত বিরল। ধ্বনি সম্প্রসারণের মত ধ্বনি সংকোচনের দৃষ্টান্তও আছে। যেমন—

"শেষ বসন্তের সন্ধ্যা-হাওয়া
শস্যশূন্য মাঠে
উঠল হাহা করি।"

সাধারণ হিসেবে 'শেষ বসন্তে' সাতমাত্রা পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে একটু দ্রুত আবৃত্তি করে অন্যান্য যান্মাত্রিক পর্বগুলির সঙ্গে সামাঞ্জস্য বজায় রাখা হয়। সুতরাং এ সব পর্বে একমাত্রা পরিমাণ ধ্বনির সংকোচ ঘটে। তবে এ জাতীয় মাত্রা সংকোচ রবীন্দ্ররচনায় বিরল।

যৌগিক রীতিতে অর্থাৎ মিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতে যতরকম ছন্দোবদ্ধ রচনা করা যায়, প্রাকৃত ছন্দের রীতিতে অর্থাৎ স্বরবৃত্তেও যে তা সম্ভব, কবি তা প্রমাণিত করতে চেয়েছেন এই কাব্যে। যৌগিক রীতির দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধকেই তিনি চমৎকারভাবে রূপায়িত করেছেন। যেমন লঘু দ্বিপদীর উদাহরণ—

"আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে,
দৈবে হতেম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে,।"

এবং লঘু চৌপদীর উদাহরণ—

"দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশে
ছায়ার মতন চরণ দেশে
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে
আর বসে না রইব।"

আবার রবীন্দ্রনাথ এই ছড়ার ছন্দে চলতি শব্দের পরিবর্তে সাধু শব্দ প্রয়োগ করেছেন, এমনকি সাধু ও চলিত শব্দ পাশাপাশি ব্যবহার করে এ ছন্দকে অভিনবত্ব দান করেছেন। যেমন—

"ইচ্ছা করে নীরব হয়ে
রহিব তোর কাছে,
সাহস নাহি পাই।"

ছড়ার ছন্দের প্রয়োগ 'পলাতকা'তে কিছু কিছু পাওয়া যায়। এছাড়া শেষজীবনে তিনি এই ছন্দকে আশ্রয় করে নিজেই ছড়া রচনা করতে শুরু করলেন। 'খাপছাড়া,' 'ছড়ার ছবি', 'ছড়া' এই কাব্যত্রয়ী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ কাব্য তিনটি সম্পর্কে আগেই স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেখানে প্রসঙ্গক্রমে ছড়ার আঙ্গিকের কথাও এসে পড়েছে।

ছড়া রচনা করতে গিয়ে তিনি এই প্রাকৃত ছন্দ ও ভাষা সম্পর্কে যা বলেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।—

"অথচ এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল, যেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই সবচেয়ে কম সহজ।"

ছড়ার ছন্দকে রূপ দিয়েছে প্রাকৃত বাংলা শব্দের চেহারা। একথা অনুমান করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কাব্য তিনটিতে বাংলা শব্দের ব্যবহার করেছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি নিজেও অনেক নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন ছন্দের প্রয়োজনে। এ ছাড়া ছড়ার ছন্দ গঠনে তিনি অনেক ইংরেজী শব্দও প্রয়োগ করেছেন।

ছড়ার আঙ্গিক সম্পর্কে আর একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে অর্থের সংগতির প্রতি একটুও দৃষ্টি দেওয়া হয়না। যুক্তি-বাঁধন-ছেঁড়া ছবিগুলো 'ছন্দের ঢেউয়ের উপর টগবগ করে ভেসে উঠছে, ভেসে যাচ্ছে।' স্বপ্নের মত একটা আকস্মিক ছবি আর একটা ছবিকে জুটিয়ে আনছে। একটা শব্দের অনুপ্রাসে হোক বা আর কোন নির্দিষ্ট কারণে হোক, আর একটা রবাহূত শব্দ এসে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ছড়া রচনা কালে ছড়ার আঙ্গিকের এই বিশেষত্বটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন—

"আদর ক'রে মেয়ের নাম
রেখেছে ক্যালিফর্ণিয়া

গরম হল বিয়ের হাট
ঐ মেয়েরই দর নিয়া।
মহেশদাদা খুঁজিয়া গ্রামে গ্রামে
পেয়েছে ছেলে ম্যাসাচুসেটস নামে,
শাশুড়ি বুড়ি ভীষণ খুশি
নামজাদা সে বর নিয়া—
ভাটের দল চেঁচিয়ে মরে
নামের গুণ বর্ণিয়া।"

এখানে ক্যালিফর্ণিয়ার সঙ্গে 'দর নিয়া', 'বর্ণিয়া'র অপ্রত্যাশিত এবং অসংগত মিল দেখা যায়, তবে অন্ত্যানুপ্রাসের জন্যই মিলটি সংঘটিত হয়েছে।

আলোচনার শেষে এই কথাটি বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রারম্ভে আদিকবির কবিতা রূপে দেখা দিয়েছিল, 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এবং 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ছিল তাঁর শৈশবের মেঘদূত। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে জীবনসায়াহ্নে নিজের সৃষ্ট ছড়ার জগতে ফিরে এসে অন্তত একটি কথার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন যে, লোকসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর শিল্পী মনের বিরোধ কখনও ঘটেনি, লোকসাহিত্য তাঁকে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে।

এবার রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনায় ওতপ্রোত হয়ে আছে যে বাউল-স্বভাবটি সে প্রসঙ্গে আসা যাক। এ বিষয়টিও রূপকথা বা ছড়া প্রভাবিত রবীন্দ্রকাব্যের মতই আমাদের বর্তমান আলোচনায় একান্ত অপরিহার্য। কারণ আগেই বলেছি যে কবির নিজের মতানুসারে বাউলদের সুর ও বাণী তাঁর মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। তাঁর সৃষ্টিতে-সঙ্গীতে, সাহিত্যে তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, সাহিত্যই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয়, সঙ্গীত নয়। সুতরাং আমাদের পূর্বকৃত পর্যায় বিভাগ অনুসারে এখন বিশ্লেষিত হবে বাউলধর্মী রবীন্দ্রকবিতা এবং পরে যথাস্থানে সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় বাউল ধর্মের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে।

কবির এই 'মরমী' স্বরূপটির পূর্ণপরিচয় লাভ করতে হলে তাঁর আত্মোপলব্ধি তথা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন। কবির অনুভবে পরম সামঞ্জস্যে মিলিত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় ঔপনিষদিক চিন্তাধারা, মধ্যযুগের সাধক সন্তদের বিশ্বাস ও উপলব্ধি, বাংলার বাউলদের 'মনের মানুষ' এর জন্য অন্তহীন ব্যাকুলতা, বৈষ্ণব সাধকদের আত্মনিবেদনের ভাব এবং 'সুফী' প্রেম সাধনার ধারাটি। বলাই বাহুল্য, তাঁর কাব্যে কবির আপন সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এই সব ধর্মচেতনার মূলগত ঐক্যের সম্মিলিত প্রকাশই লক্ষিত হয়। অস্বীকার করবার উপায় নেই, রবীন্দ্রনাথ যদি কেবলমাত্র বাউল ভাবনারই সংস্পর্শে আসতেন, অন্যান্য ধর্মসাধনার অন্তর্নিহিত পরম সত্যটির সঙ্গে পরিচিত না হতেন এবং বিশেষভাবে তাঁর চেতনায় যদি ঔপনিষদিক পটভূমিটি না থাকত তা হলে হয়তো বাউল ভাব ও বাণী তাঁর প্রাণে এমন সাড়া জাগাতে পারত না, কিংবা তাঁর সৃষ্টিতে তা এমন পরিশীলিত শুদ্ধতার সঙ্গে অভিব্যক্ত হত না। এখন রবীন্দ্র

কাব্যে বাউল গানের এই অভিব্যক্তির ধারাটিরই পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হব।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আলোচনার শুরুতে আরও যে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায় বিভাগ অনুসারে রবীন্দ্র সাহিত্যের ওপর লোকসাহিত্যের প্রভাব বিশ্লেষণের পরিকল্পনা ছিল, বর্তমান ক্ষেত্রে সেই 'জল-অচল' বিভাগটি রক্ষা করা সম্ভব নয়। অনেক সময়ই দেখা যায় বাউলের ভাব ও বিষয় একই সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। সুতরাং এদের পৃথকভাবে আলোচনা না করাই ভাল।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতায় আমরা যে 'জীবনদেবতা'র সাক্ষাৎ পাই, তার মধ্যে বাউলদের 'মনের মানুষ'ও প্রচ্ছন্ন রয়েছেন বলে মনে হয়, অবশ্যই তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উপনিষদের সেই 'অন্তরতর হৃদয়াত্মা'র অনুভূতি। এই পরম মানবটি হলেন লীলাময়, ইনি মানুষকে তারই অন্তরে বসে চালনা করেন নানা দুঃখ-সুখের মধ্য দিয়ে। অথচ মানুষ সেই পরম সত্তাকে আপন হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করতে না পেরে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কবির অনুভবেও দেখা যায়, এই দেবতাটিই তাঁর 'অন্তর মাঝে বসি অহরহ' 'দুঃখসুখের লক্ষ্য ধারা'র মধ্যে দিয়ে কবিকে চালিত করে নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কবি এই পরম মানবের স্বরূপটি পূর্ণ উপলব্ধি করতে না পেরে ব্যাকুল হয়ে বলছেন,

"কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে
আমি মরিতেছি খুঁজি।

....

কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে
আমি যে তোমারে খুঁজি।"

(অন্তর্যামী চিত্রা)

ঠিক এমনি করেই বাউল কবিও মনের মানুষকে খুঁজে ফেরেন,—

"আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।"

এখন কবির এই 'জীবনদেবতা' ও বাউলের 'মনের মানুষ' এর পরিকল্পনার মধ্যে যে ভাবসাযুজ্য, যে একাত্মতা অনুভূত হয় সে সম্পর্কে কবির নিজের মন্তব্য অনুসরণ করলেই আমাদের এ অনুমান আর অসংগত বলে মনে হবে না। তিনি বলেছেন—

"...আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলি আমি; আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে যা-কিছু, যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধন-জন-মান, এই যা কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনাচিন্তা। কিন্তু পরমপুরুষ আছেন সেই সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে, নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে। সত্তার এই দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারিনে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুখে দুঃখে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকে না, তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখি নে। কোনো এক সময়ে

সহসা দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন। যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কাব্যে।

ওগো অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।

আমি যে পরিমাণ পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভূমীন সেই পরিমাণে আপন করেছি তাঁকে, ঐক্য হয়েছে তাঁর সঙ্গে। সেই কথা মনে করে বলেছিলুম "তুমি কি খুশি হয়েছ আমার মধ্যে তোমার লীলার প্রকাশ দেখে।"

বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহ চন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান সকল অনুভূতি, সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্ব মানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি 'Religion of Man' বক্তৃতাগুলিতে। সেগুলিকে দর্শনের কোঠায় ফেললে ভুল হবে। তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েছে, কিন্তু বস্তুত সে কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা। এই আন্তরিক অভিজ্ঞতা অনেককাল থেকে ভিতরে ভিতরে আমার মধ্যে প্রবাহিত।"

(মানবসত্য, মানুষের ধর্ম)

চিত্রা কাব্যেই কবির এই আত্যন্তিক আন্তরিক অনুভূতির প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখা যায়। 'অন্তর্যামী', 'জীবনদেবতা' এবং 'সিন্ধুপারে' কবিতাটির শেষ অংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'গীতাঞ্জলি' পর্বে পৌঁছে কবির এই 'মরমিয়া' বোধ আরও স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তখন সীমার মধ্যে অসীমকে, রূপের মধ্যে অরূপকে, নিজের অন্তরের মধ্যেই অনন্ত স্বরূপকে অনুভব করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন,—

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি;
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি।
যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভা মাঝে।

চিরদিনের সুরটি বেঁধে
শেষ গানে তার কান্না কেঁদে,
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে
নীরব বীণা দিব ধরি।"

(৪৭ নং কবিতা, গীতাঞ্জলি)

এই রকমই রূপসাগরে ডুব দিয়ে 'পরম রসিক' লীলাময়কে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় লালন ফকিরের গানে। গানটি হল 'যে জন ডুবে আছে সেই রূপ সাগরে,/ রূপের বাতি দিবস রাতি জ্বলছে তার অন্তরে।/" কারণ বাউল সাধক অনুভব করেছেন, 'স্বরূপ সাগরে যে জন ডুবিতে পারে/ অপরূপ সে রূপ নেহারে।/"

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল বাউলদের ভাবনায় ভাবিত হয়েই উপরিলিখিত কবিতাটি রচনা করেছিলেন এমন নয়। বেদেও এই স্বরূপের মধ্যে পরম মানুষের বিরাট রূপকে অন্বেষণের প্রার্থনা আছে — "অবিরাবির্ম এধি" অর্থাৎ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক। বেদমন্ত্র রসিক কবি বেদের এই অন্বেষণের ধারার সঙ্গে বাউল সাধকদের স্বরূপ সাগরের মধ্যে অরূপানুভূতিকে মিলিয়ে দেখেছিলেন, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর মানুষের ধর্ম গ্রন্থে।

আবার অন্যত্রও দেখি এই পরম পুরুষকে অন্তরের মধ্যে অনুভব করার জন্য কবির সুতীব্র আকুতি।—

"অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবে না।
এবার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বোসো,
কেউ জানবে না, কেউ বলবে না।
বিশ্বে তোমার লুকোচুরি,
দেশ-বিদেশে কতই ঘুরি',
এবার বলো, আমার মনের কোণে
দেবে ধরা, ছলবে না।
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবে না।"

(২৩ সংখ্যক কবিতা গীতাঞ্জলি)

কারণ অন্তরের মধ্যে তাঁকে অনুভব করতে পারলেই সকলের মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়। এই কথাটিই আছে উপনিষদে— 'যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি'। বাউলদের গানেও এই কথাই ধ্বনিত হয়েছে সহজ সুরে সরল ভাষায়—

"মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ
একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবে সব ঠাঁই।"

আবার এই পরম পুরুষকে হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করার কথাও রূপায়িত হয়েছে বাউল গানে 'অচিন পাখি'র রূপকের মধ্যে দিয়ে, সাধক কবি বলেছেন যে, এই অচিন

পাখির আসা যাওয়ার রহস্যটি জানতে পারলেই পাখির পায়ে তাঁর 'মনোবেড়ী' পরিয়ে দেওয়া সহজ হত।

সাধক জানেন এই পরম মানুষটির রহস্যকে জানতে হলে, তাঁকে অন্তরের মধ্যে লাভ করতে হলে তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে। এই যে তাঁকে অন্বেষণ করা, তাঁকে জানা এ বাইরে থেকে জানা নয় বা বাইরে থেকে পাওয়া নয়। অন্তরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তাঁকে জানতে হবে, পেতে হবে। কিন্তু মানুষ এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে না। তাই সর্বত্র তাঁরই অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়, নানা উপচারের মধ্যে দিয়ে, নানা উপকরণের মধ্যে দিয়ে তাঁকে লাভ করতে পারবে বলে মনে করে। কিন্তু সহজ সাধক যিনি তিনি হঠাৎ একদিন অনুভব করেন, বাহ্য লোকাচার বা শাস্ত্রাচারের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তিনি আমাদের 'অন্তরের ঠাকুর' মনের মধ্যেই তাঁর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ এই উপলব্ধিকেই রূপ দিয়েছেন একটি কবিতায়—

"সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।
বড়ো কঠিন সাধনা, যার
বড়ো সহজ সুর।
পরের দ্বারে ফিরে, শেষে
আসে পথিক আপন দেশে—
বাহির ভুবন ঘুরে মেলে
অন্তরের ঠাকুর।
"এই যে তুমি" এই কথাটি
বলব আমি ব'লে
কত দিকেই চোখ ফেরালাম
কত পথেই চ'লে।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
"আছ-আছ"র স্রোত বহে যায়
"কই তুমি কই" এই কাঁদনের
নয়ন-জলে গ'লে।"

(১৪ নং কবিতা গীতিমাল্য)

সহজ সাধক আরও বলেন, এই পরম পুরুষের অর্থাৎ প্রাণের ঠাকুরের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে আগে নিজেকেই জানতে হবে। আমাদের প্রাচীন ঋষি কবির কণ্ঠেও এই একই কথা ধ্বনিত হয়েছিল বহুদিন আগে—'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ নিজেকে জান। কিন্তু নিজেকে অর্থাৎ যে 'আমি' কে জানার কথা সাধকেরা বলেন সে 'আমি' সঙ্কীর্ণ 'অহং' নয়। তা বিশ্বগত আমি যা ব্যক্তিগত আমিকে ব্যাপ্ত করে আছে। যে আমি সকলের সেই আমিই আমারও এটা সত্য, কিন্তু এই সত্যকে আপন করাই মানুষের সাধনা; এবং এই সাধনাই পরম পুরুষকে জানার পথ সুগম করে দেয়। তাই তো বাউল

কবি বলেন,—

"আপনারে আপনি চেনা যদি যায়।
তবে তারে চিনতে পারি সেই পরিচয়।।
উপরআলা সদর বারি
আত্মরূপে অবতারি
মনের ঘোরে চিনতে পারি
কিসে কি হয়।"

এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর বিশুদ্ধ মননজাত ভঙ্গীতে, সুকর্ষিত, পরিশীলিত ভাষায়—

"আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।
কত জনম মরণেতে
তোমারি ঐ চরণেতে
আপনাকে যে দেব তবু
বাড়বে দেনা।
আমারে যে নামতে হবে
ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের
প্রাণের হাটে।
ব্যবসা মোর তোমার সাথে
চলবে বেড়ে দিনে রাতে
আপনা নিয়ে করব যতই
বেচা কেনা।"

(৮৪ নং কবিতা, গীতিমাল্য)

এতো হল সাধক মনের বিশেষ উপলব্ধির কথা। কিন্তু সবসময় মানুষের পক্ষে এই বিশ্ব-আমির মধ্যে বিশ্বদেবতার লীলাকে অনুভব করা সম্ভব হয় না। সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সঙ্কীর্ণ অহং এর অহঙ্কার— যে সঙ্কীর্ণ আত্মবোধ মনকে মোহঘুমে আচ্ছন্ন করে। এই অজ্ঞানের অহঙ্কার থেকে মুক্ত হতে পারলেই মনের মধ্যে মনের মানুষের নিত্য আসা যাওয়ার লীলাটি অনুভব করা সম্ভব হয়।

তাই দেখা যায়, মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন মনকে উদ্দেশ করে অভিব্যক্ত হয়েছে 'মরমী' রবীন্দ্রনাথের সুতীব্র আর্তি—গীতালির 'ও আমার মন যখন জাগলি নারে মনের মানুষ এল দ্বারে' গানটিতে। তিনি বলেছেন, জীবনের কোন এক চরম মুহূর্তেই এই পরমপুরুষকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু যথার্থ মুহূর্তে এই পরম উপলব্ধিকে মোহনিদ্রায়

আচ্ছন্ন মন যদি গ্রহণ করতে না পারে তবে তার ব্যর্থতা হয় সীমাহীন। আর তখনই শুরু হয় এই 'পরম পুরুষে'র জন্য, 'অন্তরের ঠাকুরে'র জন্য অশেষ প্রতীক্ষা —

"মাটির পরে আঁচল পাতি'
একলা কাটে নিশীথ রাতি,
তার বাঁশি বাজে আঁধার মাঝে
দেখি না যে চক্ষে তারে।
ওরে তুই যাহারে দিলি ফাঁকি
খুঁজে তারে পায় কি আঁখি?
এখন পথে ফিরে পাবি কি রে
ঘরের বাহির করলি যারে।"

(২৭ নং কবিতা, গীতালি)

এর সঙ্গে তুলনীয় গীতাঞ্জলির ৬১ সংখ্যক কবিতাটি —

"সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী।"

বাউল কবিও তাঁর সহজ সরল ভাষায় উচ্চারণ করেন এই একই ধরনের সতর্ক বাণী—

"সর্বদাই চেতনে থাকরে মন
ও মন অচেতনে ঘুমাইলে হারা হবি পিতৃধন।"

আবার 'গীতালি'র 'মনকে হোথায় বসিয়ে রাখিসনে' কবিতাটির মধ্যেও বাউলের ভাব ও ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট। মনকে সঙ্কীর্ণ সীমার 'অহং' এর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলেই মনের অজ্ঞান তিমির দূর হয়ে যায়, আর তখনই যথার্থ সত্যোপলব্ধি ঘটে।

মানুষের এই 'অহং' এর আবরণ উন্মোচিত হয়ে গেলে, 'অবিদ্যা'র মোহ কেটে গেলে হৃদয়-কমল পূর্ণ বিকশিত হয় বলেই এই সব সহজ সাধক 'মরমী' বাউলেরা মনে করেন। আর হৃদ-কমলের বিকাশ হলেই মানুষের অন্তরে সেই পরম সত্তার জাগরণ ঘটে। বাউলেরা তাঁদের সহজ অনুভূতি দিয়েই একথা উপলব্ধি করেছেন, এবং তাই যুগ যুগ ধরে হৃদয়-কমলের বিকাশের সাধনার মধ্যে দিয়ে বাঁধা পড়েছেন তাঁদের প্রাণের ঠাকুরের সঙ্গে । তাঁদের এই সহজ উপলব্ধির প্রকাশ হয়েছে তাঁদের গানে— "হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি,/ তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা উপায় কি করি।/"

রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও এই ভাবের আভাস পাওয়া যায়। দেখা যায়, কবির সুপরিমার্জিত লেখনী স্পর্শে বাউলদের এই মরমী উপলব্ধিই একটি সুসংহত এবং স্বকীয় রূপ পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার অন্তর্নিহিত সহজ সুরটি একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি, কবির 'পরম রসের রসিক' বাউল মনটিকেও আমাদের চিনে নিতে কোনই অসুবিধা হয়

না। কবিতাটি উদ্ধৃত করলেই তা স্পষ্ট হবে। —

"ওদের কথায় ধাঁধা লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
এই তো সবি সোজাসুজি।
হৃদয়-কুসুম আপনি ফোটে,
জীবন আমার ভরে ওঠে,
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি
হাতের কাছে সকল পুঁজি।
সকাল সাঁঝে সুর যে বাজে
ভুবন জোড়া তোমার নাটে,
আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার
তরী আসে আমার ঘাটে।
শুনব কী আর বুঝব কী বা,
এই তো দেখি রাত্রি দিবা
ঘরেই তোমার আনাগোনা,
পথে কি আর তোমায় খুঁজি?"

(৭৩নং কবিতা, গীতিমাল্য)

আরও উল্লেখযোগ্য, অবিদ্যার অহঙ্কার দূর করে হৃদয় কমলকে বিকশিত করতে এবং অন্তরের সেই পরমদেবতাটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত হতে হলে দরকার সহজ সাধনার। বাউলদের মতে সহজ পথই হল প্রকৃত পথ। কারণ এর মধ্যেই রয়েছে স্বাভাবিকতা এবং চিরন্তনতা। যা কিছু জটিল ও কৃত্রিম তার মধ্যে পূর্ণতা নেই, তা ক্ষণিকের। আর এই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ আমিকে অনুভব করতে হলে চাই পূর্ণের সাধনা। ক্ষণিকের মধ্য দিয়ে সে সাধনা সম্ভব নয়। তাই সাধকের নিকট চিরন্তন সহজ পথই একমাত্র অবলম্বনীয়।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর পরিশীলিত অনুভবের অভিনব পারিভাষিক অর্থে এই সহজের কথাই বলেছেন তাঁর বিভিন্ন কাব্যে বিচিত্রভাবে। —

"সহজ হবি সহজ হবি
ওরে মন, সহজ হবি।
কাছের জিনিস দূরে রাখে
তার থেকে তুই দূরে রবি।"

(৫২ নং কবিতা, গীতালি)

তিনি অন্যত্র আরও বলেছেন 'অসহজ' হলেই জীবনে বেসুর বাজে। আর তখনই মানুষ নিজের থেকে দূরে সরে আসে, এবং সবচেয়ে যা কিছু সহজ তখন তাকেই সবচেয়ে দুর্লভ বলে মনে হয় তার, তাই 'আপন মাঝে বিদেশ'বাসী হয়েই 'সে আপনাকে

খুঁজে বেড়ায় নিত্য আপনহারা'।

আপন আত্মিক প্রেরণাবশে কবি রবীন্দ্রনাথ নিজেও ঐ বিশেষার্থে সহজ রসের রসিক। তিনি কিভাবে বাউলদের মত অন্তরের মধ্যে অরূপের লীলাকে — আত্মোপলব্ধির মধ্যে বিশ্ব আমিকে এবং পরমসত্তাকে অনুভব করেছেন সে পরিচয় আমরা এ পর্যন্ত উদ্ধার করে এসেছি। উত্তর কালের কোন কোন কবিতায় কবি নিজেও তাঁর এই সহজ অনুভবের, তাঁর জীবন সাধনার এই চরম ফলের কথা ব্যক্ত করেছেন। —

"আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।"

(১৫ নং কবিতা, পত্রপুট)

আপনার অন্তরতম আনন্দে আপন মনের মানুষের সঙ্গে আকাশের জ্যোতির্ময় পুরুষের একত্ব অনুভবই হল তাঁর ভগবদ্-উপলব্ধির মূল কথা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য কবি বাউল সাধকদের সঙ্গে নিজের একটা যোগ অনুভব করেছেন বলেই নিজেকে এ কবিতায় ব্রাত্য বলে অভিহিত করেছেন।

কবি সারাজীবন ধরে যে অসীমকে, যে বিশ্ব-আমিকে খুঁজেছেন আপন অন্তরের মধ্যে, এবং বারবার যাকে পেয়েছেনও আপন অনুভবে তারই উদঘাটিত লীলার পরিচয়টি ব্যক্ত করেছেন জীবনসায়াহ্নে লিখিত কবিতায়, —

"একে বোলো না তত্ত্ব;
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব-আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ।"

('আমি' শ্যামলী)

এতো গেল কবির কাব্যচেতনায় বাউলের অন্তরতম ভাবানুভবের প্রভাব। কিন্তু অনেক কবিতাতেই যখন তিনি প্রসঙ্গক্রমে লোকজীবনের চিত্রকে রূপায়িত করেছেন তখনই তাঁর মনে পড়েছে একতারা হাতে বাউল বৈরাগীর মূর্তি, যে গাইছে তাঁর (কবির) বহুদিন আগে শোনা 'খাঁচার মাঝে অচিন পাখি' গানটি। অবশ্য এই লোকজীবনের চিত্র অঙ্কন করতে করতেই বাউলের এই গানের ধারা অনুসরণ করে কবি পৌছান সেই অপরূপ রসলোকে। (দ্রষ্টব্য ১৩ নং কবিতা, শেষ সপ্তক, ৫ নং কবিতা পত্রপুট)

আবার দেখি এক জায়গায় তিনি উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন লোকজীবনকে।—

"আমাকে এনে দিল এই বুনো চারাগাছটি।

....

ও আছে বিশ্বের অসীম অপরিচিতের মহলে
যেখানে আছে আকাশের নামহারা তারা।

....

বাগানের নিমন্ত্রণে এসেছে ডালিয়া, এসেছে ফ্যুশিয়া
এসেছে ম্যারিগোল্ড
ও আছে অনাদরের অচিহ্নিত স্বাধীনতায়,
জাতে বাঁধা পড়েনি
ও বাউল, ও অসামাজিক।"
(৮ নং কবিতা, তদেব)

আবার অন্যত্রও দেখি বাউলের উপমা —

"ঘরছাড়া মোর ভাবনা-বাউল বেড়ায় ঘুরে।"
(দোসর, পূরবী)

বাউলের মতই কীর্তনের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল গভীর। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের ধারাটি একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় কাব্যের চেয়ে তাঁর সঙ্গীতের বাণী এবং সুরেই কীর্তনের প্রভাব সমধিক। তাঁর প্রথম দিককার কয়েকটি কবিতা ছাড়া কাব্যে আর কোথাওই তার পরিচয় পাওয়া যায় না তেমন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, বৈষ্ণব পদাবলীর লোকায়ত দিকটি'ই আমাদের আলোচ্য বিষয়, আর যে সমৃদ্ধ অংশটি পদাবলী কীর্তন নামে পরিচিত সেই দিকটি নয়। সোনার তরীর বৈষ্ণব কবিতাতেও কবি বৈষ্ণবপদের জীবনসম্ভব বাস্তবিকতার ওপরে জোর দিয়েছেন।

তাহলেও স্বীকার করতেই হয়, লোকায়ত কীর্তনের এবং বৈষ্ণব পদাবলীর এমন কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, যাদের জন্য অনেক সময়ই উভয়কে অভেদাত্মক বলে মনে হতেই পারে। অবশ্য একথা ঠিক যে অভিজাত সমাজের পরিত্যক্ত চিন্তাধারাই অনেক সময়ে লোকসমাজে গৃহীত হয়ে থাকে, এবং এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলী ও কীর্তনের এই অভেদাত্মক স্বরূপটির দ্বারা— বিশেষভাবে লৌকিক কীর্তন রসানুভবে প্রভাবিত রবীন্দ্র কবিতা আমাদের আলোচনায় স্থান পাবে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় 'কড়ি ও কোমলে'র 'মথুরায়' কবিতাটির মধ্যে কীর্তনের ছায়াপাত সুস্পষ্ট। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাঁশি যে সুরে বাজত, মথুরায় ঠিক সেই সুর বাজছে না। তাই কৃষ্ণের হৃদয় যে অব্যক্ত বেদনায় আকুল হয়ে উঠেছে, তার কথাই বলা হয়েছে এখানে।

আবার 'বাঁশি' কবিতাটিতে অভিব্যক্ত মনপ্রাণ আকুল করা বাঁশির সুরের প্রসঙ্গ এবং 'বিরহ' কবিতার বিরহ বেদনার কথাও আমাদের অনুরূপভাবে মনে পড়িয়ে দেয় কীর্তনের শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এবং রাধিকার চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতার কথা।

কিন্তু আলোচ্য কবিতাগুলোর সঙ্গে কীর্তনের ভাবগত সাদৃশ্য থাকলেও এগুলো কীর্তন নয়। কবি লৌকিক সাহিত্য থেকে দেশীয় ভাবকে গ্রহণ করে তাকে রূপদান করেছেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করে।

তাঁর 'গান' কবিতার মধ্যে অভিব্যক্ত বাঁশির মনপ্রাণ আকুল করা ধ্বনির বিরহ

ব্যাকুলতা জাগিয়ে তোলার যে ব্যঞ্জনা তার পশ্চাতেও আছে কীর্তনের ভাবচিত্রের পরোক্ষ প্রেরণা।

কিন্তু কবি যে কেবল কীর্তনের ভাবকেই নতুন করে রূপ দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিতে তা নয়। কখনও কখনও তিনি এর বিষয় বা ভাবকে অবলম্বন করে রোমান্টিক রহস্যালোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন।—

"আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।

সেদিনও এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া—
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি।
তড়িত চকিত দৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমনীর হিয়া।"

(একাল ও সেকাল, মানসী)

আর তারপরেই প্রসঙ্গান্তরের মধ্য দিয়ে কবি আবার প্রবেশ করেন বৈষ্ণব কবিদের জগতে, আর তখনই এ সম্পর্কে তাঁর অনুভবকে ব্যক্ত করেন এমন ভাষায় যা সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুতঃ তা শুধু বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে নয়, সমস্ত সাহিত্যের চিরন্তন মূল্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য। —

"আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে
এখনো প্রেমের খেলা
সারানিশি, সারা বেলা —
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটিরে।"

(তদেব)

এবার লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয়গুলোর প্রসঙ্গে আসা যাক। দেখা যায় লোকজীবনের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়েই কবি অনেক সময় আমাদের দেশের কথকতা শোনার দৃশ্যটিকে উপস্থাপিত করেছেন তাঁর কবিতায়। যেমন —

"সন্ধ্যাবেলায় ছাদের পরে
দখিন হাওয়া বহে
তারার আলোয় কারা বসে
পুরাণ-কথা কহে।"

(কোকিল, খেয়া)

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, রূপকথার আলোচনায়ও এ কবিতাটি স্থান পেয়েছে। কারণ সেদিক দিয়েও কবিতাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আবার 'সারি' গানের প্রসঙ্গও এসেছে বিভিন্ন কবিতায় লোকজীবনকে চিত্রিত করার সূত্র ধরেই। যেমন —

"কত জেলেরা ফেলিছে জাল,
কত মাঝিরা ধরেছে হাল
সুখে সারি গান গায় দাঁড়ি
কত খেয়া তরী দেয় পাড়ি।"

(নদী)

এবার কবির শৈশবে শোনা একটি গান এবং তাঁর কবিচেতনায় তার প্রভাবের কথা বলে লোকসাহিত্য প্রভাবিত রবীন্দ্রকাব্যের প্রসঙ্গ শেষ করব।

শৈশবে যে গানটি শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, সে গানটি হল, "তোমায় বিদেশিনী কে সাজিয়ে দিলে"। জীবনস্মৃতিতে কবি তার উল্লেখ করে বলেছেন যে "সেই গানের ওই একটি মাত্র পদ মনে এমন এক অপরূপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল যে আজও ওই লাইনটা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়। একদিন ওই গানের ওই পদটার মোহে আমিও একটা গান লিখিতে বসিয়াছিলাম। সুর গুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইনটা লিখিয়াছিলাম 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে বিদেশিনী'—সঙ্গে যদি সুরটুকু না থাকিত তবে এ গানের কী ভাব দাঁড়াইত বলিতে পারি না। কিন্তু ওই সুরের মন্ত্রগুণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্তি আমার মনে জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল, আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন বিদেশিনী আনাগোনা করে, কোন রহস্য সিন্ধুর পরপারে তাহার বাড়ি, তাহাকেই শারদ প্রাতে মাধবী রাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই, হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি।"

সোনার তরীর বিদেশিনী সুন্দরীর পরিকল্পনায়ও ঐ একইভাবের পরোক্ষ প্রেরণা রয়েছে কিনা কে বলবে? আবার রবীন্দ্র কবিতা ও রূপকথার প্রসঙ্গেও এই বিদেশিনী সুন্দরীর যথোচিত পরিচয় পূর্বে ব্যক্ত হয়েছে।

নাটক

রবীন্দ্রকাব্যের পর স্বভাবতঃই এসে পড়ে রবীন্দ্রনাটকের প্রসঙ্গ। শিল্পনৈপুণ্যে, উপস্থাপনা কৌশলে, ভাবের গভীরতায়, ভাষার ব্যবহারে এ সব নাটক একান্তভাবেই কবির বিদগ্ধ রুচিবোধ তথা পরিশীলিত এবং সুকর্ষিত চিন্তাধারার পরিচায়ক। কিন্তু এ সবেরও বাইরে রবীন্দ্র নাট্যসৃষ্টির মূলে যে তাঁর লোকসাহিত্য চেতনাও অনেকটা পরিমাণে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। একটু গভীরভাবে তাঁর লেখা নাটকগুলো পর্যালোচনা করলেই একথা সহজেই প্রতীয়মান হয়। রবীন্দ্রনাট্যধারার এই লোকায়ত দিকটিই আমাদের বিচার্য বিষয়।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় লোকনাট্য তথা যাত্রার কথা। বর্তমানে আমরা যাত্রার যে রূপটির সঙ্গে পরিচিত অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় তা হল 'যাত্রাভাঙা আধুনিক থিয়েটার যাত্রা'। এর মধ্যে থিয়েটার এবং পাশ্চাত্য অপেরার মিশেল রয়েছে অনেকটাই; আর তাই চিরাচরিত মূল যাত্রার সঙ্গে এর পার্থক্যও প্রচুর। এ বিষয়ে শিল্পীর সামগ্রিক মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

''যাত্রা এক জিনিস, থিয়েটার আর এক জিনিস, আবার 'যাত্রাভাঙা আধুনিক থিয়েটার যাত্রা' আর-এক জিনিস। প্রথমটা হল খাঁটি ঘরাও মাল, দ্বিতীয়টা হল খাঁটি পরস্ব দ্রব্য, আর থিয়েটার যাত্রাটা হল তথাকথিত স্বদেশী সিগারেটের মতো নামমাত্র খাঁটি মাল। অবশ্য খাঁটি যাত্রা দুর্লভ হয়েছে, থিয়েটার যাত্রাই চলছে এখন; সেই কারণে খাঁটি যাত্রার ঠিক রূপটা পাওয়া মুশকিল এবং তার পুরো চর্চাও অসম্ভব।''

রবীন্দ্রনাথের যখন আবির্ভাবকাল তখন নগর বাংলায় খাঁটি যাত্রা ক্রমবিলীয়মান বললেই চলে। সেখানে সে সময়ে তার স্থান অধিকার করেছে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটক বা থিয়েটার। অবশ্য তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যাত্রার সেই লৌকিক রূপটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং ঠাকুরবাড়ীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই তাঁর সে পরিচয় সংঘটিত হয়েছিল। কবির ছেলেবেলা গ্রন্থেই তার সাক্ষ্য মেলে।

আর পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে কবি যখন নিজে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তখন অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ওপর শৈশবে দেখা এই সব যাত্রার প্রভাব পড়েছে। অবশ্য সব সময়ে যে এই সব প্রভাব খুব সুস্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তো কেবলমাত্র তার আভাস বা ইঙ্গিতই পরিলক্ষিত হয়। আরও মনে রাখা প্রয়োজন, লোকসাহিত্য তথা লোকনাট্যের কোনরকম স্থূলতা কবির সুমার্জিত মনকে আকর্ষণ করতে পারেনি কখনও, তাই তাঁর রচনায় কোনওরকম স্থূলতার বা অপরিমার্জিত রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে যাত্রার যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁকে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করেছিল সে সবই তাঁর লেখনী স্পর্শে এক অনন্যসুন্দর অভিনব রূপ লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাটকের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল এর মধ্যে সঙ্গীতের প্রাচুর্য। সম্ভবতঃ তার উৎস মূলেও নিহিত রয়েছে আমাদের দেশের যাত্রারই প্রেরণা। আগে প্রথম অধ্যায়ে যাত্রার রূপাঙ্গিক প্রসঙ্গে বলেছি যে আমাদের

যাত্রা আগাগোড়া 'গানের সুরেই ঢালা' এবং শৈশবে রবীন্দ্রনাথকে তার সঙ্গীত বাহুল্যই মুগ্ধ করেছিল সবচেয়ে বেশী।

তবে একথা ঠিক, যাত্রার গান তাঁকে নাটকের মধ্যে সঙ্গীত সংযোজনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রেরণা দিলেও তাঁর নাটককে আঙ্গিক বিচারে কোনমতেই যাত্রা বলা যায় না এবং তিনি যাত্রার গানের রীতিকেও অনুবর্তন করেননি অন্ধভাবে। বস্তুতঃ তিনি সম্পূর্ণ নিজের মত করে গানের ব্যবহার করেছেন তাঁর নাটকে এবং এসব গান যে সব সময়েই লোকসঙ্গীতের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাও নয়। যাত্রার গানের ও রবীন্দ্রনাটকের গানের প্রকৃতি ও প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য অনেক।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণীয় 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১২৮৭) নাটিকাটি, কবি যাকে 'গানের সূত্রে নাট্যের মালা' বলে অভিহিত করেছেন। এর উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, হার্বার্ট স্পেনসরের 'The Origin and function of Music' প্রবন্ধটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি এই সুরের নাটকটি রচনা করেছেন; এবং সঙ্গীতকে এইভাবে নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয়নি বলেই তাঁর মনে হয়েছে। কিন্তু এ সবেরও গভীরে কবির অবচেতনায় আমাদের দেশের যাত্রাগানের পরোক্ষ প্রেরণা যে একেবারেই ছিল না এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় কি? যদিও রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব।

এতদ্ব্যতীত কবি এ নাটকের গানের মধ্যে 'দেশী ও বিলাতি' উভয় সুরের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে আরও বলেছেন, 'য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি প্রতিভা তাহা নহে—ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্য বিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র— স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।'' (জীবনস্মৃতি)

বস্তুতঃ প্রচলিত অপেরার মধ্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত কথার মূল্য ছিল গৌণ, সুরের স্ফূর্তিটাই সেখানে প্রাধান্য পেত। সুতরাং অপেরার প্রচলিত ভঙ্গী থেকে এ নাটকের বিন্যাসভঙ্গী স্বতন্ত্র সন্দেহ নেই।

সবশেষে নাটিকাটি সম্পর্কে এ কথাই বলা যেতে পারে যে, বাল্মীকি-প্রতিভা ইউরোপীয় অপেরাও নয়, দেশীয় যাত্রাও নয় আবার 'যাত্রাভাঙ্গা আধুনিক থিয়েটার যাত্রাও' নয়। তবে হয়তো এটি রচনার অন্যতম আদর্শ ছিল এ দুয়ের (যাত্রা ও অপেরা) গঠনভঙ্গী বা ধরন, এবং ঠাকুরবাড়ীর পরিবেশে তা থাকা একেবারে অসম্ভাব্য ব্যাপার নয়।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ আদর্শে রচনা করলেন 'কালমৃগয়া' (১২৮৯); এবং তার অনেককাল পরে ১২৯৫ বঙ্গাব্দে আবার নাটকে গানে সম্পৃক্ত করে লিখলেন অপর একটি গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'। কিন্তু এটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর, এ হল 'নাট্যের সূত্রে গানের মালা'। কিন্তু সে যাই হোক মনে রাখা প্রয়োজন, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রসঙ্গে লোকসাহিত্যের সাযুজ্যের যে সব কথা এ পর্যন্ত অনুভব করা হয়েছে প্রায় সে সমস্তই 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা' সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তবে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'য় 'মায়ার খেলা'কে অপেরা বলেই নির্দেশ করেছেন।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেখা যায়, উপরোক্ত

গীতি নাট্যগুলো ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সব নাটকেই প্রায় গানের বহুলতা।

রবীন্দ্রনাথের সমকাল পর্যন্ত বাংলায় যে সমস্ত নাটক রচিত হচ্ছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মধ্যে গানের প্রয়োগ ছিল অনেকটা যাত্রারীতিরই অনুসারী। এ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের নাটকে গানের প্রযুক্তির কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে; এবং লক্ষ্যণীয়, কবিরও প্রাথমিক নাটক চর্চায় গানের ব্যবহার স্বকীয় প্রবর্তনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি, সেখানে সঙ্গীত এসেছে অনেকটা পূর্ব প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করে — শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এবং প্রাকৃতিক পটভূমির সৌন্দর্যরস ও গভীর অনির্বচনীয় সত্যের আভাস ফুটিয়ে তোলার জন্যে।

যাত্রায় নাট্যঘটনার বিভিন্ন অংশ গানের মধ্য দিয়ে সংযোজিত করা হয়। শুধু তাই নয়, অনেক সময়ই গূঢ় অধ্যাত্ম তত্ত্ব বা ভাবতত্ত্ব বোঝানোরও চেষ্টা করা হয়ে থাকে সঙ্গীতেরই সাহায্যে। রবীন্দ্রনাটকেও যাত্রার এই বৈশিষ্ট্যটিই লক্ষিত হয় অনেক পরিশীলিত ভাবে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র ''হেদে গো নন্দরাণী' গানটি। নির্বিশেষের সন্ধানী বৈরাগী সন্ন্যাসী যখন রাজপথে এসে সম্মুখের চলমান জীবন প্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করেছেন এবং জীবনের সমস্ত আয়োজনকে তাঁর নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়েছে, তখনই নাটকীয় বৈপরীত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং একটি গভীর ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে উপস্থাপিত হয়েছে কৃষকদের মুখে ঐ গানটি। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ সম্পর্কে বলেছেন, ''হেদে গো নন্দরাণী' গানটি একটি ছবি, যার রস নাট্যরস। রাখাল বালকেরা নন্দরাণীর কাছে এসেছে আবদার করতে, তারা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাবে এই তাদের পণ। এই গানটি প্রকৃতির প্রতিশোধে ভুক্ত করেছি। এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিক বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানারূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে। শেষ কথাটা এই দাঁড়ালো, শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।''

রবীন্দ্রনাথের গভীর মননশীলতার দ্বার ঋদ্ধ এই যাত্রা স্বভাবটি ছাড়াও অন্যদিক দিয়েও গানটির লোকায়ত মূল্য নিতান্ত কম নয়। প্রথমতঃ গানটি যারা গেয়েছে তারা অর্থাৎ কৃষকেরা তো এই অর্থে,—রবীন্দ্রভাবিত অর্থে লোকসমাজেরই প্রতিভূ। আর সবচেয়ে বড় কথা, এ গানটির যে বিষয় তা আমাদের লোকসঙ্গীত তথা লোকসাহিত্যেরই অঙ্গীভূত। বস্তুতঃ রাধাকৃষ্ণের বিষয়কে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে আমাদের লোকসাহিত্যের এক সুবৃহৎ এবং সমৃদ্ধ অংশ। রাখাল বালকরূপে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার বর্ণনা তো কীর্তন সঙ্গীতেরই অন্যতম বিষয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে 'গ্রাম্যছড়া' বলে যে জাতীয় ছড়ার উল্লেখ করেছেন, রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ছড়াগুচ্ছও তার অন্তর্ভুক্ত। মনে রাখা প্রয়োজন, 'বাঙালী ছড়া-রচয়িতা ও শ্রোতাদের মানসরাজ্য

সেই অপরূপ রাখালের রাজ্যের'ই প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই এই গানটির মধ্যে। এখানে বলে রাখা ভাল, গানের সুর এবং সাঙ্গীতিক মূল্য বিচার আমাদের আলোচনার বিষয় বহির্ভূত, কেবল গানের সাহিত্যিক দিকটিই আমাদের আলোচনার লক্ষ্য। সুতরাং সেই প্রসঙ্গে সঙ্গীত সম্পর্কে যতটুকু বলা প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই এ আলোচনায় স্থান পেয়েছে, এবং পরেও তাই পাবে। আবার দেখি, এ নাটকের 'কথা কোস নে লো রাই' এবং 'মরি লো মরি/' আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে' গান দুটিও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কীর্তন এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ছড়ার কথা।

এখানে কীর্তনের নাট্যগুণ সম্পর্কে রবীন্দ্রভাবনার কথাটিও বিশেষভাবে মনে পড়ে;— "কীর্তন সঙ্গীত আমি অনেক কাল থেকেই ভালবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানিনে।" (সংগীত-চিন্তা) কীর্তনের সুরে নাটকের ভঙ্গী জাগিয়ে তোলার প্রয়াস আলোচ্য গান গুলোতে সুস্পষ্ট। এতদ্ব্যতীত আরও উল্লেখযোগ্য, উপরোক্ত প্রথম গানটির মতই এ নাটকে এই দুটি গান ও অন্যান্য গানের প্রযুক্তি সম্পর্কেও বলা যেতে পারে যে, তা হল যাত্রায় ব্যবহার্য লৌকিক রীতি ও নাট্য ঐতিহ্যের অভিজাত চর্চারই সমন্বিত ফলশ্রুতি।

'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জনে'র গানের প্রবর্তনার মধ্যেও যাত্রা তথা যাত্রানুসারী বাংলা নাটকের দূর ছায়া প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়। কখনও বা নাটকের গূঢ় ভাবতত্ত্ব প্রকাশের জন্য আবার কখনও বা কোন বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করার জন্যই পাত্রপাত্রীর সংলাপে সঙ্গীত সংযোজিত হয়েছে। যেমন এ বিষয়ে সব দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য 'রাজা ও রাণী' নাটকের ইলার সঙ্গীত— 'এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর' এবং 'বিসর্জনে'র অপর্ণার গাওয়া 'ওগো পরবাসী' ও জয়সিংহের গাওয়া 'আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই আপনারে' গান দুটি। ঐ একই প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন সূত্রসঙ্গীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অপর্ণার অপর একটি গান — 'আমি একলা চলেছি এ ভবে/ আমায় পথের সন্ধান কে কবে'। তাছাড়া 'রাজা ও রাণী'তে কাঠুরিয়ার গান 'বঁধূ তোমায় করব রাজা তরুতলে' ঘটনাংশ পূরণ ও নাটকের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশের জন্য উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর দেখা যায়, 'শারদোৎসব' নাটকে (১৩১৫) সঙ্গীত সংযোজনা আরও ব্যাপক এবং সার্থক হয়ে উঠেছে; এবং এ নাটকে গানের প্রবর্তনার মধ্যে যে যাত্রাস্বভাবটি রয়েছে তা বিশেষভাবে কবির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা মণ্ডিত। শুধু তাই নয়, এ প্রসঙ্গে নাটকটির বিন্যাসের কথাও এসে পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই। কারণ, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, 'শারদোৎসব' রচনাকালে তাঁর চেতনার অনেক খানিকটা জুড়ে ছিল যাত্রার গঠনভঙ্গী। কয়েক বৎসর আগে (১৩০৯) রচিত 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধটি থেকে তাঁর নাটকের বিন্যাস সম্পর্কিত চিন্তাধারার পরিচয় কিছুটা পাওয়া যায়। সুতরাং প্রসঙ্গতঃ এখানে সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রেতর বাংলা নাটকের সঙ্গে যাত্রার ছিল প্রতিযোগিতার সম্পর্ক। তাই গিরিশচন্দ্র প্রমুখ নাট্যকারেরা গান প্রভৃতি যাত্রার কিছু কিছু গঠনশৈলীকে গ্রহণ করেছিলেন আত্মরক্ষার তাগিদে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাত্রার আঙ্গিককে গ্রহণ করলেন অনেকটা মুক্তিপন্থা হিসেবে।

তবে বলাই বাহুল্য, যাত্রার এই সব রীতিকে তিনি ব্যবহার করেছেন পরিশীলিত শুদ্ধতার সঙ্গে এবং তাকে উন্নীত করে নিয়েছেন স্বতন্ত্র এক নিজস্ব রীতিতে। যাই হোক, 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধটি পাঠ করলে জানা যায়, কবি প্রচলিত বিলাতী থিয়েটারের মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্যপটের মধ্যে প্রথাবদ্ধ কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা অনুভব করেছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে। আর সেই কারণেই তার থেকে বাংলা নাটককে মুক্তিদানের অভিপ্রায়ে যাত্রাকে অন্যতম অনুকূল আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার কথাই ভেবেছিলেন। কারণ, তাঁর মতে যাত্রার মধ্যে কৃত্রিমতার সুযোগ অনেক কম। এর অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান থাকে না। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করে কাজটা বেশ সহৃদয়তার সঙ্গেই সম্পন্ন হয়। এ সম্পর্কে তিনি আরও যা ভেবেছিলেন তা হল এই, দর্শকের মনের মধ্যে যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সেখানে দৃশ্যপট আপনি রচিত হতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই দৃশ্যপটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কোন কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হতে পারে না। মনে হয়, এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি উৎসাহী হয়েছেন শারদোৎসব ও পরবর্তী অন্যান্য নাট্য রচনায়। বহু পরবর্তীকালে পূর্বোল্লিখিত 'রাজা ও রাণী'র পরিবর্তিত সংস্করণ 'তপতী'র (১৩৩৬) ভূমিকাতেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানেও তিনি বলেছেন,—

"আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রব রূপে প্রবেশ করেছে। ...অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ় স্থানু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন করে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।"

এবং বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, মঞ্চ ও দৃশ্যের পরিকল্পনায় যাত্রার সমীপবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ একই অভিপ্রায় তাঁর নাটকে বয়ে আনে গানের প্রবাহ। শারদোৎসবে তো গানে আর নাটকে মিলে গেছে। কিন্তু আগে অনেকবার বলেছি এবং এখনও আবার বলছি, 'শারদোৎসব' তথা রবীন্দ্রনাথের কোন নাটককেই যাত্রার পর্যায়ভুক্ত করা যায় না কোনমতে। যদিও ১৩২৯ সালের শারদোৎসব অভিনয়ের সময় কবি এর যে একটা ভূমিকা রচনা করেন, তার মধ্যে তিনি এই নাটকটিকে 'যাত্রাপালা' বলেই উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ তিনি নাটকের দেশীয় গড়নটিকেই আধুনিকতায় বিন্যস্ত করে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এও ঠিক যে এই ভঙ্গীটিই আবার স্পর্শ করে আছে প্রতীচ্যের আধুনিক নাটকের পর্ব।

অন্যপক্ষে আরও অনেক দিক দিয়েই এ নাটকটি লোকজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। সে প্রসঙ্গ পরে আসবে। তবে এখানে কেবল এ বিষয়ে নাটকটির একটি বৈশিষ্ট্যের

কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হল নাটকটির ঠাকুরদাদা চরিত্র— যে গ্রীক নাটকের কোরাস, সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার, যাত্রার বিবেক প্রভৃতির কাজ করেও অধিকতর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে; রবীন্দ্রনাথ এর মধ্যে তাঁর আপনমনের মাধুরী মেশানো মরমী বাউলকেই রূপায়িত করতে চেয়েছেন, এবং দেখা যায় শারদোৎসব থেকেই এর সূত্রপাত। পরবর্তী বিভিন্ন নাটকের প্রায় সর্বত্রই এ চরিত্রটি আত্মপ্রকাশ করেছে বিভিন্ন নামে।

'শারদোৎসব' থেকে অন্তকাল পর্যন্ত রচিত বিভিন্ন রবীন্দ্রনাটক যেমন একদিক থেকে নিজস্ব ধরন আয়ত্ত করে নিয়েছে প্রথানুগত্যের সমস্ত দায় এড়িয়ে, অন্যদিকে তেমনি একই সঙ্গে তা লোকজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পৃক্ত। 'শারদোৎসবে'র যাত্রা স্বভাব এবং গানের প্রবাহ সম্পর্কে যে সব কথা বলা হয়েছে, তার প্রায় সবই রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক অর্থাৎ রাজা, অচলায়তন, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। তবে বলে রাখা ভাল, অন্যদিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলেও 'ডাকঘরে' একটিও গান নেই।

বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শারদোৎসবের প্রায় সগোত্রীয় 'ফাল্গুনী' নাটকটির কথা। এ নাটকের সূচনায় গানের প্রয়োগ সম্পর্কে কবিশেখরের মুখ দিয়ে যে কথা বলিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তার মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাটকে গানের প্রয়োগ ভাবনার বৈশিষ্ট্যটি সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কবিশেখরের উক্তির সেই অংশটুকু এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে। —

> "কবি, তা হলে প্রস্তুত হও গে।
> না মহারাজ, আমি অপ্রস্তুত হয়েই কাজ করতে চাই। বেশি বানাতে গেলেই সত্য ছাইচাপা পড়ে।
> চিত্রপট—
> চিত্রপটে প্রয়োজন নেই - আমার দরকার চিত্তপট — সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।
> এ নাটকে গান আছে নাকি!
> হ্যাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এক একটি অঙ্কের
> দরজা খোলা হবে।"

এই গানের চাবি দিয়ে এক একটি অঙ্কের দরজা খোলার বৈশিষ্ট্যটির মধ্যে নিহিত রয়েছে যাত্রা স্বভাব। বস্তুতঃ খাঁটি যাত্রা দৃশ্যপটের ধার দিয়েও যায় না, তা একান্তভাবেই নির্ভর করে থাকে চিত্তপটের ওপর। অবনীন্দ্রনাথ এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন তাঁর আশ্চর্য সুন্দর ভাষায়। তিনি বলেছেন,

"নজর করে দেখি, জুরি দোহার এই কজন ছিল যাত্রাওয়ালাদের সিন কনসার্ট এবং নানা তোড়জোড় দেবার সহায়। ধর, কালিদাসের 'শকুন্তলা' আরম্ভ হ'ল — হরিণ শিকারে চলেছেন রাজা রথ চালিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে। থিয়েটারওয়ালা এখানে ঠেকবে, এটা নিশ্চয়। গতিবেগ নেই রথের, হরিণের কিছুরই, — স্থির দৃশ্যপট, স্থির কাঠ-কাগজে - কাদায় - মাটিতে গড়া রথ ঘোড়া সবই — তার উপরে খাড়া সচলাচল রাজা — স্টেজের উপরে রাজার মৃগয়া যাত্রার বৈরূপ্য ঘটন ছাড়া আর কিছুই

সম্ভব হয় না। কাজেই থিয়েটারের স্টেজে এ অংশ সুযোগ্য লোকে বাদ দিয়ে যান। যাত্রাওয়ালা এখানে নির্ভয় — সে গানের পর গান জুড়ির গান বর্ণনা জুড়ে দর্শকের মনোরথ তেজে নিয়ে ফেলে আশ্রমের কাছে। গীতছন্দে স্যন্দন চল্লো, হরিণ দৌড়লো নানা বর্ণের মধ্যে দিয়ে দৃশ্য পরম্পরা ছাড়িয়ে, চলে গেল মন অতি সহজ উপায়ে যাত্রাতে — সচল মনোরথ স্বচ্ছন্দ গতি পেলে সুর ও ছন্দের সাহায্যে — এই ছিল যাত্রার বিশেষত্ব। থিয়েটারে যেটা ঘটানো অসম্ভব, সেটা সুসম্ভব হল যাত্রার অধিকারীর কাছে — দিলে সে হাঁকিয়ে রথের জুড়ি ঘোড়া আসরের মধ্যে নির্ভয়ে — ধূলো লাগল না দর্শকের গায়ে, বালি পড়ল না কারও চোখে, দুয়ো দিলে না কেউ।" (যাত্রা ও থিয়েটার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রবীন্দ্রনাথের নাটকে এই জুড়ি দোহার কনসার্ট ইত্যাদি নেই, কিন্তু তার পরিবর্তে সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে গান, নাটকের বিভিন্ন চরিত্রই এখানে গানের সুরের সাহায্যে ঘটনা প্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে গেছে দৃশ্যের পর দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে। বলা যেতে পারে রবীন্দ্ররচনার মধ্যে বাংলা যাত্রা স্বভাব এবং গভীর মননধর্মী নাট্যরীতির অভিনব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। অবশ্য নাটকের গীতি-ভূমিকার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যটি 'ফাল্গুনী' নাটক সম্পর্কেই সর্বাধিক প্রযোজ্য এবং অন্যান্য ঋতু নাটক 'বসন্ত', 'শেষবর্ষণ', 'শ্রাবণগাথা' প্রভৃতি সম্বন্ধেও। এতদ্ব্যতীত 'শারদোৎসব', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'রাজা', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন' ও 'মুক্তধারা' নাটকে উপস্থাপিত ঠাকুরদাদা তথা 'ধনঞ্জয় বৈরাগী' চরিত্রটি যাত্রার জুড়ি বা বিবেকের সঙ্গে অনেকটা একাত্ম হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাটকে সঙ্গীতের প্রযুক্তিতে আরও যে সমস্ত যাত্রা স্বভাব প্রচ্ছন্ন রয়েছে সে বিষয়েও সংক্ষেপে একটু আলোচনা করে নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি। বস্তুতঃ দর্শকদের মনোরঞ্জনই যাত্রার সঙ্গীত বহুলতার অন্যতম কারণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে গীতি সংযোজনা করেছেন অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে জন প্রমোদের ভাবনারও বশবর্তী হয়েই। ১৩২২ বঙ্গাব্দে ফাল্গুনী অভিনয়ের অব্যবহিত পূর্বে শান্তিনিকেতন থেকে গগনেন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করলে আমাদের এ অনুমান অসংগত বলে বোধ হয় না। —

"চেষ্টা করছি আমাদের শিশু গাইয়ের দল বাড়িয়ে তুলতে। ...দু একটি বড়ো মেয়ের গলাও পাবার চেষ্টা করছি ... চোখ এবং কান দুয়েরই পেট ভরিয়ে তুলতে হবে। তারপরে মানে বুঝতে না পারে না-ই পারলে — বুঝিয়ে দেওয়ার চাইতে মজিয়ে দেওয়াটাই দরকার।"

'ফাল্গুনী'র মতই তাঁর অপরাপর নাটকেও অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে দর্শকদের এই মজিয়ে দেওয়ার সচেতন আকাঙ্ক্ষাও বয়ে আনে গানের ধারা।

আবার যাত্রার মতই রবীন্দ্রনাথও তাঁর নাটকে বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার জন্যই পাত্রপাত্রীর সংলাপে নিয়ে আসেন সঙ্গীত ; এবং অবশ্যই তা স্বকীয় ভঙ্গীতে। যেমন 'রাজা' নাটকের সুরঙ্গমার গান 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায়রে হায়' বা 'ভোর হল বিভাবরী পথ অবসান', 'অচলায়তনে'র পঞ্চকের গান 'দূরে কোথায় যায় দূরে দূরে' কিংবা

শোনপাংশুর 'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন' অথবা পুনরায় পঞ্চকের সঙ্গীত 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে', 'রক্তকরবী'তে বিশুর গাওয়া গান 'তোমায় গান শোনাব' বা 'আমার কাজের মাঝে মাঝে' প্রভৃতি। এজাতীয় আরও অনেক উদাহরণ উল্লিখিত নাটকসমূহে তো পাওয়া যায়ই, তাছাড়া অন্যান্য নাটকেও পাওয়া যায়।

যাত্রার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল, এর মধ্যে গানের সাহায্যে গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব বা ভাবতত্ত্ব প্রকাশ করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিভিন্ন নাটকে গানের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন গূঢ় ভাবতত্ত্ব, অতীন্দ্রিয় সত্যের আভাস। 'অরূপরতন' নাটকের 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ' বা 'ঋণশোধে'র 'দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে নেওয়া' গানগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অনুরূপ বিষয়ক আরও অনেক উদাহরণ তাঁর অন্য অনেক নাটকেই আছে।

এই যাত্রাধর্মিতা ছাড়াও রবীন্দ্রনাটকে সঙ্গীতের উপস্থাপনার মধ্যে রয়েছে বাংলার লোকসঙ্গীত ও লোকজীবনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ। তাই তো দেখি 'শারদোৎসবে'র 'আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরির খেলা' গানটি এবং 'শেষরক্ষা'র 'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে' গান দুটি বাউলের সুরে রচিত।

সুরের প্রসঙ্গ আমাদের সবিশেষ আলোচ্য নয়। কিন্তু 'রাজা', 'ফাল্গুনী' এবং 'মুক্তধারা'য় আমরা মূল বাউলকেই পাই, যাঁরা নাটকের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং গানে ও কথায় নাটককে সবিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। তবে বলে রাখা ভাল, 'আপনমনের মাধুরী' মিশিয়ে বাউলের যে স্বরূপটি তিনি কল্পনা করে নিয়েছিলেন তাকেই রূপায়িত করেছেন এই সব নাটকে। আর সেজন্যেই বাংলার ভদ্রসমাজের প্রত্যন্তবর্তী মরমী সাধকদের সঙ্গে এই সব নাটকের বাউল চরিত্রের ভাবে-ভঙ্গীতে, গানের কথায় ও সুরে আপাত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও এঁরা (নাটকের চরিত্রেরা) অনেক বেশী সফিস্টিকেটেড (sophisticated) তথা পরিশীলিত মনের অধিকারী। তাছাড়া তাঁর বিভিন্ন নাটকের ঠাকুর্দা বা ধনঞ্জয় বৈরাগীকে প্রচ্ছন্ন বাউল বলে চিনে নিতে আমাদের কোন অসুবিধে হয় না। কিন্তু সে প্রসঙ্গে আসার আগে 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের দুএকটি গানের অবতারণা সম্পর্কে একটু আলোচনার অবকাশ আছে বলে মনে করি।

এই নাটকের প্রধান চরিত্র যতীন একটি মাত্র গান গেয়েছেন এবং গানটি বাউলের। তাঁর জীবনের নিঃসীম শূন্যতাই যেন তাঁকে এই গানটি গাইবার প্রেরণা দিয়েছে আর সেই কারণেই বোধ'হয় তা এমন সকরুণ ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গানটি হল 'ওরে মন যখন জাগলি না রে/ তখন মনের মানুষ এল দ্বারে।'

রঙ্গমঞ্চে অভিনয়যোগ্য নাটকটির সংযোজিত অংশে একটি বোষ্টমী চরিত্রেরও অবতারণা করা হয় এবং সেও হিমির দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে দুটি গান গেয়েছে, - 'মন রে ওরে মন' এবং 'সে যে মনের মানুষ কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়ন দ্বারে'। অবশ্য এ গান দুটি যে কীর্তন জাতীয় সঙ্গীত নয় একথাও বলা হয়েছে নাটকটির মধ্যে। বরং উক্ত গানদুটির মধ্যে বাউল ভাবের আভাস সুস্পষ্ট।

লৌকিক বাংলাদেশ যে রবীন্দ্রনাটকের অন্যতম আশ্রিত বিষয় তা প্রমাণিত হয় এই সব বাউল ও বোষ্টমী চরিত্রের অবতারণায় এবং তাদের গানের উপস্থাপনায়, তদুপরি

ধনঞ্জয় বৈরাগী বা ঠাকুরদাদা প্রমুখ মরমী চরিত্র সৃষ্টিতে। এবার এই ঠাকুরদাদা জাতীয় চরিত্রের প্রসঙ্গ আলোচনা করব।

আগেই বলেছি, 'শারদোৎসব' নাটক থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী অনেক নাটকেই একটি মরমী পাগল চরিত্রের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। প্রধানতঃ সাংকেতিক নাটকগুলিতেই এই চরিত্রের আবির্ভাব ও পূর্ণতা। আমাদের দেশের যাত্রাগানে বিবেক, নিয়তি বা জুড়ির দল নাট্য ঘটনার রহস্যকে বা মানবচরিত্রের নিগূঢ় সত্যকে দর্শকের সামনে পরিস্ফুট করে তুলত। যাত্রাদলের জুড়ির বা বিবেকের এই কর্তব্যের সঙ্গে ঠাকুরদাদা তথা ধনঞ্জয় বৈরাগী এবং সেই সঙ্গে ঠাকুরদাদার গায়ক চেলাদের নাটকীয় ভূমিকার মিল দেখতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার এবং গ্রীক নাটকের কোঁরাসের সঙ্গেও মিল দেখা যায় ঠাকুরদাদা ও তাঁর গানের দলটির। এ বিষয়ে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "শিল্পোৎকর্ষের বিচার ছেড়ে দিয়ে যাত্রা পালার জুড়ি, গ্রীক নাটকের কোরাস ও রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা ও গানেব দলের প্রকৃতি বিচারে বসলে দেখা যাবে যে মূল কর্তব্যে এদের মধ্যে অমিল নেই, এরা তিনজনেই Ideal spector বা আদর্শ দর্শক। ঘটনাস্রোত নাটকের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে, সেইসব ঘটনাকে কোন দৃষ্টিতে দেখা উচিত, কীভাবে গ্রহণ করা উচিত, সেই সব ঘটনা মনের মধ্যে কোন তারে ঝঙ্কার তুললে, কোন রসের উৎস খুলে দিলে তবে যথার্থ হয়, সাধারণ দর্শকদের জানবার কথা নয়, এমনকি নাটকের পাত্রপাত্রীদেরও সকলের না জানা সম্ভব হতে পারে। আদর্শ দর্শকরূপে যাত্রাদলের জুড়ি, গ্রীক নাটকের কোরাস এবং রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা সেই দেখাটি দেখছে, সেইভাবে গ্রহণ করছে, মনের মধ্যে সেই তারের অনুরণন এবং সেই রসের আস্বাদ অনুভব করছে। একদিকে নাট্যকারের মনে আদর্শ জগৎ, অন্যদিকে দর্শকগণের মনে শিক্ষা ও রুচিভেদে এক বিচিত্র বাস্তব জগৎ, মাঝখানে রঙ্গমঞ্চের উপরে আদর্শে বাস্তবে মেশানো সম্পূর্ণ অন্য এক জগৎ — এই তিন জগতের মধ্যে অনায়াস যার গতি, এই তিন জগতের ভাষায় যার অধিকার সেই ত্রিচর ও ত্রিভাষী জুড়ি ঠাকুর্দা কোরাস একেবারে রসের পরমহংস। কোন ব্যক্তি বিশেষের দিকে সে টানে না বিশ্বসকলের দিকেই সমান টানে তাই সে নির্বিশেষ।" (প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ)

অন্যপক্ষে 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয় বৈরাগী তো আসলে বাউল বৈরাগীই। 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'ডাকঘর' ও 'অচলায়তনে'র ঠাকুরদাদা বা দাদা ঠাকুর প্রত্যক্ষতঃ বাউল বৈরাগী নয় ঠিকই, কিন্তু বাংলার বাউল বৈরাগীর চিরন্তন মূর্তিরূপে তাঁকে চিনে নিতে আমাদের কোন অসুবিধেই হয় না।

'ডাকঘরে' তিনি দেখাও দেন ছদ্ম ফকিরের বেশে। তবে সেই সঙ্গে গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ ঋষিকেও অনুভব করা যায় এই দেশীয় লোকচরিত্রটির মধ্যে। এর কারণ সম্ভবতঃ এই মরমী চরিত্রটির মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম উপলব্ধির স্বরূপটি অভিব্যক্ত হয়েছে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের ধর্মোপলব্ধি স্বকীয় উপলব্ধি, তাই এর মধ্যে যেমন মরমী বাউল সাধকের অরূপানুভূতির মিল দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় প্রাচীন ভারতীয় বৈদান্তিক, ঔপনিষদিক উপলব্ধির ও বিভিন্ন সময়ের বহু সাধকের চিন্তা ধারার। অবশ্য একথাও

ঠিক রবীন্দ্রনাথ কখনও কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মসংস্থার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন নি। সর্ব ধর্মের সমন্বিত রূপই তাঁর অধ্যাত্ম আদর্শে একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু সে যাই হোক, ঠাকুরদা ও ধনঞ্জয় বৈরাগীর মধ্যে বাউলের স্বরূপ ও তার মর্মবাণী অনুভব করতে কোন বাধা থাকে না।

বাউলদের মতই ঠাকুরদাদা মোহমুক্ত, সত্যসন্ধানী, সহজ মানুষ। জগতের কোন বন্ধনকে তিনি স্বীকার করেন না, কারও সঙ্গে তিনি আত্মীয়তা সূত্রে জড়িত নন, তাই সকলের সঙ্গেই তাঁর যোগ। 'শারদোৎসবে' এই আনন্দময় পুরুষটি ছেলের দলকে নিয়ে শরৎ প্রকৃতির সঙ্গে নিজের অন্তরের আনন্দ যোগ করে উৎসবে মেতে উঠেছেন, এবং শরৎ প্রকৃতির মধ্য দিয়েই অরূপকে বিশ্বের আনন্দময় সত্তাকে উপলব্ধি করে গেয়েছেন বিখ্যাত গানটি 'আমার নয়ন ভুলানো এলে।'

'রাজা' নাটকে এই ঠাকুরদাদা আরও অনেক বেশী পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন। এখানে তাঁর 'সহজ রসের রসিক' মরমী স্বরূপটিকে কবিকেশরী ব্যক্ত করেছেন একটি গানে—

"যেখানে রূপের প্রভা নয়ন লোভা
সেখানে তোমার মত ভোলা কে — ঠাকুরদাদা।
যেখানে রসিক সভা পরম শোভা
সেখানে এমন রসের ঝোলা কে — ঠাকুরদাদা।"

ঠাকুরদাদা নিজে রবীন্দ্রনাটকে 'রাজা' রূপে কল্পিত 'অরূপ'কে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই উদার সুরে গাইতে পেরেছেন, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে/নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে' গানটি এবং নিজেকে রাজার বন্ধু বলে পরিচয়ও দিয়েছেন।

এর মধ্যে বাউল বৈরাগীদের 'মনের মানুষে'র উপলব্ধির আভাস পাওয়া যায় অনেক সুপরিশীলিত সুপরিমার্জিত রূপে। শুধু তাই নয়, তিনি এ নাটকে তো বটেই অন্যান্য নাটকেও অন্যদেরও অরূপানুভূতিতে সহায়তা করেছেন।

'ডাকঘরে' তিনি এসেছেন 'ফকিরের বেশে এবং এখানে তাঁর সহজ লোকায়ত স্বরূপটি পূর্বোক্ত নাটক দুটির চেয়ে অনেক বেশী সুস্পষ্ট। অমল ও ঠাকুরদার কথোপকথনের মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।—

"অমল। আচ্ছা ফকির, যাঁর ডাকঘর তুমি সেই রাজাকে জান?
ঠাকুরদা। জানি বইকি। আমি যে রোজ তার কাছে ভিক্ষা নিতে যাই।"

'অচলায়তনে' ইনিই রূপান্তরিত হয়েছেন 'দাদাঠাকুর'এ। বাউলদের মতই দাদাঠাকুর এখানে নিজেকে ভাবতে পেরেছেন 'বাতুল' বা পাগল বলে। আবার তাদের মতই তিনি শাস্ত্রভার মুক্ত, কোন লোকাচার মানেন না তাই তাঁকে কখনও দেখতে পাওয়া যায় নীচ দর্ভক দলের সঙ্গে, কখনও শোন পাংশুদের সঙ্গে; এবং নানাবিধ সংস্কারের বাধা ঘেরা অচলায়তনকে ভেঙে ফেলতে তিনি সহায়তা করেছেন পঞ্চক বা নাটকের অন্যান্য চরিত্রকে; আর সকল বন্ধন মুক্ত হয়ে সহজভাবে আত্মোপলব্ধির কথাই তিনি নাটকের মধ্যে শুনিয়েছেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

'প্রায়শ্চিত্ত', 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয় বৈরাগীও ঠাকুরদাদারই রূপান্তর। এখানে আমরা তাঁর মধ্যে বাউলকে দেখতে পাই অনেকটা স্বরূপেই। এই সদানন্দময় মুক্ত পুরুষটি অনায়াসেই বলতে পারেন, — 'আমায় পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন খেপা সে।' তিনি সংসারের মধ্যে থেকেও সকল বন্ধনের অতীত, বাইরের শোক দুঃখ তাঁকে আঘাত করে না। তিনি এ দুই নাটকেই সহজ সুরে বলে যান,

"আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে।
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অমনি হবে।
আমাকে সে দুঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে
সে কি অমনি হবে।
তার সাথে তার পাষাণ হিয়া গলবে করুণ রসে,
সে কি অমনি হবে।
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অমনি হবে।"

আবার ঠিক এমনি সুরেই তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে।' (মুক্তধারা)

'প্রায়শ্চিত্ত', 'মুক্তধারা' ও 'পরিত্রাণে' ধনঞ্জয় বৈরাগী একই ভাবে চিত্রিত হয়েছেন, একই কথা বলেছেন, একই গান গেয়েছেন, কেবল মুক্তধারা ও পরিত্রাণে তাঁর মুখে কয়েকটি অতিরিক্ত গান ও কথা সংযোজিত হয়েছে মাত্র এবং ভূমিকা আর একটু বর্ধিত হয়েছে।

আর এই ধনঞ্জয় বৈরাগীই আবার রূপান্তরিত হয়েছেন 'রক্তকরবী'র বিশুপাগলে, এখানে তিনি অনেক পরিণত ও পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাটকে যেমন যাত্রা ও বাউলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অল্প হলেও রূপকথারও। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'তাসের দেশ' নাটকটির কথা।

নাটকটি (১৩৪০) গল্পগুচ্ছের 'একটি আষাঢ়ে গল্প' অবলম্বন করে রচিত। এর কাহিনী রূপকধর্মী হলেও বাংলা লোককথার পথ অনুসরণ করেই এর মধ্যে প্রবেশ করেছে রাজপুত্র ও সদাগর পুত্র — রূপকথার রাজপুত্র এবং সদাগর পুত্রের মতই নির্বিশেষ চরিত্র।

রাজপুত্রের 'নবীনা'র সন্ধানে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে যাত্রার মধ্যেও রূপকথার ছায়াপাত সুস্পষ্ট। বস্তুতঃ নাটকটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রয়েছে রূপকথার রোমাণ্টিক পরিবেশ। কিন্তু এসবেরও গভীরে একটি সুগভীর তত্ত্বকেই প্রকাশ করেছেন কবি, এবং এ নাটকের তত্ত্ব রবীন্দ্রসাহিত্যে নতুন নয়, নানা রচনায় নানাভাবে তা প্রকাশিত হয়েছে। তত্ত্বটি হল, যৌবনের স্পর্শে জীবনও চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং জীবনের স্পর্শেই তত্ত্বের সংস্কার মুক্তি ঘটে।

আলোচ্য নাটকটির আর একটি দিকও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের আবোল-

তাবোল জাতীয় ছড়ায় যে কিম্ভুত রসের প্রকাশ দেখা যায় — ইংরেজীতে যাকে বলে Nonsense, এ নাটকেও সেই রসই অভিব্যক্ত হয়েছে রূপকথাধর্মী কাহিনী বিধৃত নাটকের কাঠামোয়।

এছাড়াও রূপকথার চিন্তা রবীন্দ্রচেতনায় যে গভীর ভাবে মিশে গিয়েছিল তার পরিচয় তাঁর গদ্য নাটকগুলোর কোন কোন সংলাপের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। যেমন 'গোড়ায় গলদে'র বিনোদবিহারীকে বলতে শোনা যায়;—

"থাকত যদি আরব্য উপন্যাসের একটি পোষা দৈত্য, স্ত্রী ঘরে পদার্পণ করলেন অমনি একটি কিংকরী সোনার থালে হ্যামিলটনের দোকানের সমস্ত ভালো ভালো গয়না এনে তাঁর পায়ের কাছে রেখে গেল, দুজন দাসী বসবার ঘরে মছলন্দ বিছিয়ে চামর হাতে করে দুই দিকে দাঁড়াল, চারিদিক থেকে সংগীত উঠছে, বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আসছে— যেদিকে চোখ পড়ছে তকতক ঝকঝক করছে — সে হলে একরকম হত।"

আর 'ডাকঘর' নাটকে 'অমল'কে বারবার আহ্বান জানায় সেই অদেখা অচেনা রূপকথার জগৎ এবং তার রোমাণ্টিক মন ঐ কল্পলোকে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। তাই তো সে সুধাকে বলে,—

"আমি সাতভাই চম্পার খবর জানি। আমার মনে হয় আমাকে যদি সবাই ছেড়ে দেয় তাহলে আমি চলে যেতে পারি খুব ঘন বনের মধ্যে যেখানে রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সরু ডালের সব আগায় যেখানে মনুয়া পাখি বসে দোলা খায় সেইখানে আমি চাঁপা হয়ে ফুটতে পারি। তুমি আমার পারুলদিদি হবে?"

এমনি করেই দেখি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের লোক সংস্কৃতির মগ্ন চেতনার গভীর থেকেই বাংলা নাটকের এক অপরূপ গড়ন আবিষ্কার করে নিয়েছেন। আর সেজন্যেই তাঁর নাটকে অনুভব করা যায় যাত্রা ও রূপকথার আবেশ এবং বাংলার চিরপরিচিত বাউল বৈরাগীর সাহচর্য। কিন্তু বলাই বাহুল্য, তাঁর নাটককে লোকনাট্য বলা যাবে না কোন মতেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ দেশীয় মণ্ডন রীতিকেই রূপদান করেছেন অত্যন্ত আধুনিক ভঙ্গীতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে, লোকসংস্কৃতির ব্যাপক ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁর নাটক অর্জন করেছে নিজস্ব ধরন, এখানে কবি সম্পূর্ণরূপেই স্বস্থ। বস্তুতঃ রবীন্দ্র প্রতিভার স্পর্শে সঞ্জীবিত লোকসাহিত্যের এই অভিনব রূপায়ণই আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে লোক সংস্কৃতির এক পরমা পরিণতি।

কথা-সাহিত্য

কাব্য ও নাটকের মতই রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসও অনেকটা পরিমাণে লোকসাহিত্য প্রভাবিত। বিশেষতঃ 'লিপিকা' ও 'গল্পসল্পে' এ প্রভাব অনেক বেশি প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট।

রূপকথা-বিজড়িত তাঁর প্রথম গল্প 'একটা আষাঢ়ে গল্প' ১২৯৯ বঙ্গাব্দে আষাঢ় সংখ্যা সাধনায় প্রকাশিত হয়। বহিঃপ্রকৃতিতে রূপকথার মত হলেও কাহিনীটি মূলতঃ রূপক।

গল্পের নায়ক রাজপুত্র তার দুঃখিনী দুয়োরাণী মায়ের দুঃখ মোচনের অভিপ্রায়ে যাত্রা করেছে অজানার উদ্দেশ্যে সদাগর পুত্র এবং কোটালপুত্রের সঙ্গে। তারপর নানা বিপর্যয়ের

মধ্যে দিয়ে তারা তিনজনে এসে পৌঁছেছে এক অদ্ভুত রাজ্যে— তাসের দেশে। সেখানকার লোকেরা এক অর্থহীন নির্জীব প্রথার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাদের কেবল নিয়মে চলা-ফেরা, নিয়মে যাওয়া-আসা, নিয়মে ওঠা পড়া। মান্ধাতার আমল থেকে তারা সমভাবেই রয়েছে, তাদের কোন ভাবের পরিবর্তন নেই, কোন কিছুর জন্য তাদের চিন্তা করতে হয় না বা বিবেচনা করতে হয় না। অদৃশ্য হস্ত তাদের চালনা করছে এবং তারা চলছে। কিন্তু বিদেশী রাজপুত্র এবং তার সঙ্গীদ্বয়ের আবির্ভাবে ও তাদের প্রাণচঞ্চলতার স্পর্শে প্রথম এদের জীবনে অভ্যাসের তাল কেটে গেল, স্বাভাবিক জীবনের ধাক্কায় তাদের জীবনচক্রে অরাজকতা দেখা দিল, তারা ক্রমে ক্রমে অনুভব করতে পারল তাদের জীবনযাত্রা ছাড়াও অন্যরূপ জীবনযাত্রা সম্ভব এবং বুঝতে শিখল জীবনে বিধান বা প্রথাবদ্ধ শৃঙ্খলাই সব নয়, সেখানে ইচ্ছারও একটা গুরুত্ব আছে। আর তার ফল হল এই, জোয়ার ভাঁটার মাঝখানে যে দেশটা থমথম করছিল, যেখানে কথা ছিল না, ছিল কেবল মুখ চাওয়াচাওয়ি, এক পা এগোনো, দুই পা পিছোনো, কেবল আপনার মনের বাসনা স্তূপাকার করে বালির ঘর গড়া এবং বালির ঘর ভাঙা, সেখানে বাঁশী বাজল, তুরীভেরী বেজে উঠল, আনন্দের উচ্ছলতায় নিয়মের দাসত্ব থেকে সকলে মুক্তিলাভ করল।

গল্পটির পরিসমাপ্তিও রূপকথার মতই মিলনান্তক। রাজপুত্র রাজত্বসহ তাসের দেশের এক বালিকার বরমাল্য লাভ করল এবং দুঃখিনী দুয়োরাণীর দুঃখের অবসান হল সোনার তরীতে চড়ে পুত্রের নবরাজ্যে আগমন করে।

রূপক ও রূপকথা সমন্বিত আলোচ্য গল্পটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে সুকুমার সেনের মন্তব্য এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।—

"একটা আষাঢ়ে গল্পের আরম্ভ ও শেষ রূপকথার মতো, মাঝখানে রূপকের সঙ্গে রূপকথার জড়াজড়ি। রূপকথায় পাথর হওয়া অথবা প্রাণহীন মানবমানবী রাজপুত্রের সোনার কাঠির স্পর্শে সজীব হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাসের দেশের নরনারী পাষাণ ময়, নিষ্প্রাণ, অর্থাৎ নির্মনন্ধ— ইমোশন বর্জিত, যেন যন্ত্র মানুষ। রাজপুত্রের হৃদয়ের আতপ্ত স্পর্শ পাইয়া একে একে তাহারা মোহ-আবরণ ভেদ করিয়া সুখ-দুঃখ ভালোমন্দের জীবনে ভূমিষ্ঠ হইল। রূপকটির তাৎপর্য গভীর ও ব্যাপক। রচনাকালে হয়তো রবীন্দ্রনাথের মনে দেশের অবস্থার কথা জাগিয়াছিল। এখন কিন্তু রূপকটির গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মানুষকে এখন রাষ্ট্রক্রিয়ার ঘুঁটিরূপে স্থাপিত করিবার চেষ্টা চলিয়াছে।" (রবীন্দ্রগল্পে রূপক ও রূপকথা)

ঠিক এক বছর পরে (আষাঢ়, ১৩০০) সাধনায় 'অসম্ভব কথা' প্রকাশিত হয়। আলোচ্য রচনাটি গল্পগুচ্ছে স্থান পেয়েছে বলেই একে গল্পের পর্যায়ে ফেলা হয়। কিন্তু এটি নিছক গল্প নয়, আবার নিছক প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্তও করা যায় না একে। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলায়' বর্ণিত আত্মকথার একটি অংশ এবং রূপকথা সম্পর্কিত আত্মভাবনা বিভিন্ন কৌশলে উপস্থাপিত হয়েছে এর মধ্যে, আর সেই সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে শৈশবে শ্রুত রূপকথার একটি করুণ কাহিনী। এর মধ্যে রূপকথা সম্পর্কে তিনি যে সুন্দর ইঙ্গিত দিয়েছেন তা লোকসাহিত্যের মূল্যায়নে এক অতুলনীয় সম্পদ। বস্তুতঃ প্রায় একই সময়ে

লেখা 'ছেলেভুলানো ছড়া' ইত্যাদি প্রবন্ধের পরিপূরক রূপেই এই অংশকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্পে'র উপজীব্য হল কাদাখোঁচা ও কাটঠোকরার কাহিনী। কিন্তু এ গল্পটির মধ্যেও কাহিনীর চেয়ে গল্প বলার প্রস্তুতিই অধিক স্থান অধিকার করে আছে এবং উপসংহারে লেখক কাহিনীটির অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন নীতিকথাটির ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এ রচনাটির কাহিনী অংশে উপকথাধর্মিতার লক্ষণ স্পষ্ট। তাছাড়া বাকী অংশের গুরুত্ব বর্তমান প্রসঙ্গে সামান্যই।

অতঃপর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'লিপিকা'র 'সুয়োরানীর সাধ' কথিকাটি (১৩২৭) ; প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যার মধ্যে অনুভূত হয় রূপকথার আবেশ।

রূপকথায় যেমন দেখি, দুয়োরাণীর প্রতি ঈর্ষায় সুয়োরাণী জর্জরিত এবং দুয়োরাণীকে প্রতিপদে সমস্ত রাজৈশ্বর্য থেকে সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ থেকে বঞ্চিত করেও তার ঈর্ষার এই তীব্র জ্বালা কিছুতেই প্রশমিত হয় না, রবীন্দ্রনাথের এই গল্পেও তাই। এখানেও সুয়োরাণী বলেছে, "আমার সাতমহলা বাড়ির একধারে তিনটে মহল ছিল দুয়োরাণীর। তারপরে হল দুটো, তারপরে একটা। তারপরে রাজবাড়ি থেকে সে বের হয়ে গেল।

তারপরে দুয়োরাণীর কথা আমার মনেই রইল না"।

কিন্তু তারপরে দোলযাত্রার দিন চাঁপা গাছের ছায়ায় ঘেরা, দুয়োরের সামনে শঙ্খচক্রের আল্পনা দেওয়া দুয়োরাণীর কুঁড়েঘর আবার তার পুরাতন ঈর্ষাকে জাগিয়ে তুলেছে নতুন করে। তার মনের স্থৈর্যকে বিনষ্ট করেছে। স্নানযাত্রার দিন সাদা শাঁখা হাতে, লালপেড়ে শাড়ি পরনে দুয়োরাণীকে স্নানের পর ঘড়ায় করে জল তুলে আনতে দেখে এবং রাসযাত্রার দিন দুয়োরাণীর ছেলেকে মায়ের জন্য শালুক ফুল, বনের ফল, খেতের শাক নিয়ে যেতে দেখে সে হিংসার জ্বালায় জ্বলে উঠেছে। শুধু তাই নয়, দুয়োরাণীকে অনুকরণ করতেও সে চেষ্টা করেছে। কিন্তু করতে গিয়ে অনুভব করেছে সূক্ষ্ম এক পরাভবের যন্ত্রণা যার কথা সকলকে বলা যায় না। তাই কেবলমাত্র তার স্যাঙাতনিকে ডেকে সঙ্গোপনে বলেছে, "ঐ দুয়োরাণীর দুঃখ আমি চাই।....

ওর ওই বাঁশের বাঁশিতে সুর বাজল, কিন্তু আমার সোনার বাঁশি কেবল বয়েই বেড়ালেম, বাজাতে পারলেম না।"

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, কথিকাটি যেমন একদিকে রূপকথা হিসেবে গ্রাহ্য অন্যদিকে তেমনি রূপক হিসেবেও। রূপকটি হল এই, মানবের সুখ-শান্তি-আনন্দ ঐশ্বর্যের সীমায় আবদ্ধ নয়; অনাড়ম্বর জীবন যাপনের মধ্যেই বরং মনের পরম প্রশান্তির সন্ধান পাওয়া যায়। নিরাকাঙ্ক্ষ শ্রীমণ্ডিত রুচিবোধের ওপরই মানুষের সুখ অনেকখানি নির্ভরশীল,আড়ম্বরের কৃত্রিমতার ওপর নয়।

'রাজপুত্তুর' (১৩২৮) কথিকাটিতে রবীন্দ্রনাথ রাজপুত্রকে এনেছেন আধুনিক সমস্যা জর্জরিত সাধারণ বাঙালীর সাজ পরিয়ে — "তার গায়ে বোতাম খোলা জামা, — ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতো জোড়া জীর্ণ। পাড়া গাঁয়ের ছেলে, শহরে পড়ে, টিউশানি করে বাসা খরচ চালায়।"

আর রাজকন্যাও থাকে তার পাশের বাড়িতেই। — "চাঁপা ফুলের মতো তার রঙ নয়, হাসিতে তার মানিক খসে না। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নববর্ষার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারই সঙ্গে।"

কিন্তু এই রাজপুত্র বহিরাবরণে যতই বাস্তব ও আধুনিক এবং সাধারণ হোক না কেন অন্তঃপ্রকৃতিতে সে সেই চিরকালীন রাজপুত্র — লোককল্পনায় যাকে আমরা দেখতে পাই।

এ গল্পটির মধ্যেও একটি সুগভীর তত্ত্ব নিহিত রয়েছে রূপকের অন্তরালে। জীবনের বিচিত্র উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে অনন্তকাল ধরেই রাজপুত্র চলেছে দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে। সে যুগের রাজপুত্রকে হয়তো সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে যেতে হত এই উদ্দেশ্যে। এখনকার রাজপুত্রকে আর তা করতে হয় না, অতি আধুনিক উপায়েই তা সংঘটিত হয়। তারপর কঠোর বাস্তব তার সমস্ত কল্পনাকে ভেঙে দিলেও যমের সোনার কাঠির স্পর্শে আবার তার রোমাণ্টিক স্বরূপটিকে সে নতুন করে ফিরে পায়। তখন "তার কপালে অসীম কালের রাজটীকা। দৈত্যপুরীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুলবে।"

'পরীর পরিচয়' (১৩২৯) গল্পটির রাজপুত্রও মূলতঃ রূপকথার রাজপুত্র নয়, যে সব দেশ থেকে তার বিবাহের সম্বন্ধ আসে সে সব রাজ্যও ঐতিহাসিক রাজ্য, রূপকথার কাল্পনিক জগৎ নয়। কিন্তু তার পরীস্থানের কন্যাকে লাভ করার বাসনার মধ্যে রূপকথার নিঃসৃত নির্যাস সঞ্চারিত হয়েছে। এ রাজ্যের সন্ধান কেউ দিতে পারে না, কারণ বাস্তব জগতের সীমায় এ রাজ্যটি আবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে এ রাজ্যটির অবস্থান রাজপুত্রের কল্পনায়।

তারপর দেখি রাজপুত্র ছদ্মবেশী পরী মনে করে বিবাহ করেছে কালো মেয়ে 'কাজরী'কে। প্রতিদিনই সে মনে করে তার ছদ্মবেশ বুঝি এইবার খসে পড়বে। সে কাজরীকে বারবার অনুরোধও করে ছদ্মবেশ খুলে ফেলতে। আর কাজরী কিছু বুঝতে না পেরে কেবল হাসে। কিন্তু কার্তিকী পূর্ণিমার দিন যখন সকলেই কাজরীর পরীমূর্ত্তি দেখতে চাইল, তখন দেখা গেল সে নিরুদ্দেশ। আর রাজপুত্রের মনে হল, "চলে গিয়ে পরী তার আপন পরিচয় দিয়ে যায়। আর তখন তাকে পাওয়া যায় না।"

কল্পনায়-বাস্তবিকতায় মেশানো এই -গল্পটির রসাবেদন অসামান্য।

'গল্প-সল্পে'র কোন কোন গল্পেও আমরা দেখতে পাই কবির রূপকথা স্মৃতির সুঠাম ব্যবহার। এ গল্পগুলোর বিন্যাসের কথাও এপ্রসঙ্গে একটু বলা দরকার। বস্তুতঃ 'দাদামশায়' ও 'কুসমি'র কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে এ সব গল্পে কাহিনীর ধারা এগিয়ে চলে এবং তার মধ্যে অনেক সময়ই এসে পড়ে রূপকথার গল্পাভাস আবার কখনও কখনও তা কবির শৈশবের কল্পনা দিয়ে রহস্য দিয়ে গড়া।

যেমন দেখা যায় 'রাজার বাড়ি' গল্পটিতে কবি সেই রাজার বাড়ির রহস্যকথাই বলেছেন যার সন্ধান তিনি আজও পাননি, তাঁর বাল্যসঙ্গিনী ইরুরই একমাত্র জানা ছিল তার ঠিকানা, আর মাঝে মধ্যে প্রায়ই সে যেত সেই রহস্যময় বাড়িতে।

'পরী' গল্পটির বৈশিষ্ট্য হল এর মধ্যে কবি তাঁর গল্পের শ্রোতা কুসমিকেই পরীস্থানের পরী রূপে কল্পনা করে বলে গেছেন গল্প। এর মধ্যে তিনি আসলে যে কথাটি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন তা হল এই, কল্পনার সাহায্যেই এই বাস্তব জগতকেই অতিক্রম করে পৌঁছানো যায় পরীস্থানে -- রূপকথার জগতে। বাস্তব সত্য পৃথিবীর জন্য, কিন্তু কল্পনার সত্যকেও অস্বীকার করা যায় না একেবারে। কবি একে বলেছেন 'আরো সত্য'।

এবং এই 'আরো সত্যে'র পরিচয় দিয়েছেন তিনি এই গ্রন্থের 'আরো সত্য' নামে গল্পটিতে। সেখানে দেখি, তিনি নিজে রূপান্তরিত হয়েছেন বাংলাদেশের রাজপুত্রে এবং আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত চীনদেশের পরমা সুন্দরী রাজকন্যার সাক্ষাতও লাভ করেছেন অনায়াসে। কিন্তু এখানেই কাহিনীর শেষ নয়, তিনি রূপকথার রাজপুত্রের মতই লাভ করেছেন 'হ্যাংচাও শহরে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর শ্রীমতী আংচনী দেবীকে।'

গল্পটির উপসংহারে যে কবিতাটি রয়েছে তার মধ্যে কবির শৈশবের রূপকথার কল্পনার স্পর্শ অনুভব করা যায়।

এছাড়াও দেখি, অনেক সময়ই রূপকথার বিষয় বা ভাব প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্প-উপন্যাসে।

গল্পগুচ্ছের 'বলাই' গল্পে কবি বালক বলাই এর রোমান্টিক মনের স্বরূপটিকে সুপরিস্ফুট করার জন্যেই এনেছেন রূপকথার প্রসঙ্গ। গল্পের এই বালকটি প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধন অনুভব করে, আর এই প্রকৃতিই তার মনকে নিয়ে যায় রূপকথার রহস্যালোকে যেমন করে বালক রবীন্দ্রনাথকে বহিঃপ্রকৃতি আকর্ষণ করত নিবিড়ভাবে এবং তাঁর কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিক চেতনায় দিয়ে যেত রূপকথার রূপলোকের মায়াময় স্পর্শ।

আলোচ্য গল্পটিতেও দেখি, বলাইয়ের "প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়ে চড়ে বেড়ানো নয়। পূর্বদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে, ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেল বেলাকার রোদ্দুর পড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায়, সমস্ত আকাশ থেকে কী যেন সংগ্রহ করে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে; ফাল্গুনের পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভরে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা বসে বসে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে, যা কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়া তাড়া দিয়ে। অতি পুরনো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে একজোড়া পুরোনো পাখি, বেঙ্গমা বেঙ্গমী, তাদের গল্প।"

উপন্যাসের মধ্যে একমাত্র 'যোগাযোগে'ই দুএক জায়গায় রূপকথার প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। যেমন গল্পের নায়িকা কুমুদিনী জাগতিক দুর্ভাগ্যকে অতিক্রম করার জন্যই আশ্রয় পেতে চায় রূপকথার অলৌকিক তথা রোমান্টিক জগতে। তার মনে হয় রূপকথায় তো কত অসম্ভবই ঘটে কত সহজে, তার জীবনেও কেন তেমন কোন একটা ঘটনা ঘটে

না যাতে তার সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। সে এক একদিন মনে মনে বলে, "কোথায় আমার রাজপুত্র, কোথায় তোমার সাতরাজার ধন মানিক, বাঁচাও আমার ভাইদের, আমি চিরদিন তোমার দাসী হয়ে থাকব।"

এই রোমান্টিক কল্পনার অনেক পরে বাস্তবের আঘাতে কুমুদিনী যখন জর্জরিত তখন একদিন বালক হাবলুর কাছে শুনেছে জটাই বুড়ির কথা, যে সোনার সিঁদুর কৌটো লুকিয়ে রাখে কয়লার ঘরে, আরও জেনেছে সেই সিঁদুর কৌটো থেকে যে সিঁদুর পরে সে রাজরাণী হয়। কিন্তু এখন আর এই অলৌকিক উপায়ে রাজরাণী হবার ঘটনা তার মনে কোন সাড়া জাগায় না, বরং তার মনকে বেদনার্তই করে তোলে। কারণ বাস্তব জীবনে রাজা মধুসূদন ঘোষালের গৃহে এসে সে তার প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। তাই সিঁদুরের কৌটোর প্রসঙ্গে হাবলুকে সে বলে, "সর্বনাশ! কোনো হতভাগিনী খবর পেয়েছে না কি?" উত্তরে হাবলু যখন জানায় সেজো পিসিমার মেয়ে খুসি জানে এর কথা এবং ঝুড়ি নিয়ে হন্নু যখন সকালে বাজার করতে বেরোয় তখন খুসি সেই সঙ্গে যায় এবং একটুও ভয় করে না। কুমুদিনী তখন বলে, "ও যে ছেলেমানুয, তাই রাজরাণী হতেও ভয় নেই।"

দেখা যাচ্ছে যে রূপকথার রোমান্টিক জগত একদা কিশোরী কুমুদিনীর সরল নিষ্পাপ মনকে আকর্যণ করেছে, বাস্তবের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে পরবর্তীকালে তা আর তাকে মোহ মুগ্ধ করতে পারেনি—রূপকথার জগতের সমস্ত মাধুর্য হারিয়ে গেছে তার মন থেকে।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্য অনেক গল্প যেমন, সুভা, নষ্টনীড়, মাল্যদান, ম্যাজিসিয়ান, প্রাণমন প্রভৃতিতেও রূপকথার প্রসঙ্গ এসেছে, যদিও তা খুবই অল্প। এবাবে রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের ওপর রূপকথার রূপাঙ্গিকেব প্রভাবের কথা আলোচনা করেই রূপকথার প্রসঙ্গ শেয করব।

রূপকথা প্রভাবিত প্রথম রবীন্দ্রগল্প 'একটি আষাঢ়ে গল্পের' কোন কোন অংশে পরিশীলিত ভাবে হলেও রূপকথার বাচনভঙ্গীর ছাপ সুস্পষ্ট। একটি উদাহরণ দিলেই তা সহজে অনুধাবন করা যাবে। যেমন—

"সমুদ্রে সদাগরের দ্বাদশ তরী প্রস্তুত ছিল—তিন বন্ধু চড়িয়া বসিল। দক্ষিণের বাতাসে পাল ভরিয়া উঠিল— নৌকাগুলা রাজপুত্রের হৃদয় বাসনার মতো ছুটিয়া চলিল।

শঙ্খদ্বীপে গিয়া এক নৌকা শঙ্খ, চন্দন দ্বীপে গিয়া এক নৌকা চন্দন, প্রবাল দ্বীপে গিয়া এক নৌকা প্রবাল বোঝাই হইল।

তাহার পর আর চারি বৎসর গজদন্ত, মৃগনাভি, লবঙ্গ, জায়ফলে যখন আর চারিটি নৌকা পূর্ণ হইল, তখন সহসা একটা বিপর্যয় ঝড় আসিল।

সব কটা নৌকা ডুবিল, কেবল একটি নৌকা তিন বন্ধুকে একটা দ্বীপে আছড়িয়া ফেলিয়া খান খান হইয়া গেল।"

এই বাকরীতিতে রূপকথার বর্ণনা ভঙ্গীর গভীরে রূপক শিল্পীর মনন-পরিশীলিত প্রযুক্তি কৌশল সুস্পষ্ট।

কিন্তু 'লিপিকা'র বাগ্‌বিন্যাসের মধ্যে অনেক সময়ই রূপকথার অনাবিল ঢঙটিই

অনুভব করা যায়।

'এক যে ছিল রাজা' — রূপকথা শুরু হওয়ার এই বিশেষ ভঙ্গীটি অনুসরণ করেই তিনি লিখেছেন,—

"এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ।" (তোতাকাহিনী, লিপিকা)

রূপকথার বাক্য গঠনের রীতি অনেকটা শিশুর কল্পনার দ্রুত তালে ছুটতে চায়, — কথা ছুটবে, কিন্তু বক্তব্যের ভার বাড়বে না। এই প্রয়োজন সূত্রেই বুঝি প্যারেনথেটিক বাক্য মালিকার টুকরো কথায় ভেসে বেড়ায় রূপকথার ভাষা পক্ষিরাজ ঘোড়ার মত। রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা'র ব্যঞ্জনাগর্ভ গভীর কথাকেই নির্ভার আয়েশি রূপ দিতে চেয়েছেন অমনি সব টুকরো বাক্যের মালা গেঁথে। —

"রাজপুত্র চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাত রাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোন রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।"(রাজপুত্তুর, লিপিকা)

আবার 'রথযাত্রা' কথিকাটির "ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া বেরোল, হাতিশাল থেকে হাতি, ময়ূরপঙ্খি যায় সারে সারে, আর বল্লম হাতে সারে সারে যায় সিপাই সান্ত্রি। দাস দাসী দলে দলে পিছে পিছে চলল।" অংশটি আমাদের রূপকথার এই বিশিষ্ট গড়নটির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, রূপকথার এই জাতীয় বাগ বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে এক অন্তর্বিলম্বী ছন্দঃস্পন্দ, আপাত ছন্দোরিক্ত গদ্য কবিতার কবিতাগুণের যা প্রধান অবলম্বন। 'লিপিকা'তেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম এই ধরনের গঠনশৈলীকে গ্রহণ করেছেন যা পরবর্তীকালে তাঁর গদ্য কবিতার বাহন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করেছেন 'লিপিকা'তেই তিনি প্রথম গদ্যকবিতা লিখবার ভীরু প্রয়াস করেছিলেন। সুতরাং এদিক দিয়েও রূপকথা প্রভাবিত 'লিপিকা'র গুরুত্ব অপরিসীম।

কেবল ছন্দস্পন্দেই নয়, উপরোক্ত উদাহরণ দুটি বিষয়ানুষঙ্গের সূত্রেও রূপকথা-ধর্মী। এতদ্ব্যতীত লিপিকাতে এমন অনেক রচনাংশও আছে, কেবলমাত্র এই বিশেষ ধরনের গঠনশৈলীর গুণেই যার মধ্যে রূপকথার প্রভাব অনুভব করা যায়। যেমন—

"কত বড়ো কাল, কত বড়ো জগৎ, পৃথিবীতে কত যুগের কত জীবলীলা। সেই সুদূর, সেই বিরাট, আজ এই দুরন্ত মেয়েটির মুখের দিকে তাকালো মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির কলশব্দে।" (বাণী, লিপিকা)

আর এক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের 'সে' গ্রন্থটিও বর্তমান প্রসঙ্গে খুবই মূল্যবান। এর মধ্যে একদিকে রূপকথা বা উপকথার প্রভাবও যেমন আছে তেমনি আছে 'আবোল তাবোল' জাতীয় ছড়ার যে রস সেই কিম্ভূত বা অদ্ভুত রসের আবেদন। অবশ্য একথাও সত্য যে, এর অধিকাংশ গল্পের মধ্য দিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ কৌতুকের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। আর তার দরুন রচনার স্বাদেও নূতনত্ব দেখা দিয়েছে। কিন্তু রচনাগুলোর আসল প্রেরণা এসেছিল কবি মনের খেয়াল খুশি থেকে, যে খেয়াল খুশির বশে তখন তিনি ছবি এঁকেছেন এবং লিখেছেন 'খাপছাড়া' বইটি। আলোচ্য গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে কবি নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন,—

"আমারো খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ু স্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিরুদ্দেশে
বাউলের বেশে।
যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া
সেথায় সে মুক্তি পায় সমাজ হারানো লক্ষ্মীছাড়া
যেমন তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু খুশি দিয়ে আঁকা
দিলেম উজাড় করি ঝুলি।'
লও যদি লও তুলি,
রাখ ফেল যাহা ইচ্ছা তাই—
কোনো দায় নাই।"

'সে'র এই রকম মুক্ত শৃঙ্খল কল্পনায় পূর্ণ, দায়িত্বহীন আনন্দ কোলাহলে মুখর গল্পের দুএকটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে উদাহরণ হিসেবে। যেমন—

"সেদিন ক্লাস-পড়াবার খাতিরে আমার পড়ে নেবার কথা ছিল 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডম'। এক সময় হঠাৎ দেখি, সেটা রয়েছে পড়ে, হাতে উঠে এসেছে 'পাঁচু পাক্‌ড়াশির পিস্‌শাশুড়ি'। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, রাত হবে তখন আড়াইটা। স্বপ্ন দেখছি, গরম তেল জ্বলে উঠে আমাদের কিনি বাম্‌নির মুখ বেবাক গিয়েছে পুড়ে; সাত দিন সাত রাত্তির হত্যে দিয়ে তারকেশ্বরের প্রসাদ পেয়েছে দু'কৌটো লাহিড়ি কোম্পানির মুনলাইট স্নো; তাই মাখছে মুখে ঘ'ষে ঘ'ষে। আমি বুঝিয়ে বললুম, ওতে হবে না গো, মোষের বাচ্চার গালের চামড়া কেটে নিয়ে মুখে জুড়তে হবে, নইলে রঙ মিলবে না। শুনেই আমার কাছে সওয়া তিনটাকা ধার নিয়ে সে ধর্মতলার বাজারে মোষ কিনতে দৌড়েছে। এমন সময় ঘরে একটা কী শব্দ শোনা গেল, কে যেন হাওয়ার তৈরি চটিজুতো হুসহুস করে টানতে টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধড়ফড় করে উঠলেম, উস্‌কে দিলেম লণ্ঠনটা। ঘরে একটা-কিছু এসেছে দেখা গেল কিন্তু সে যে কে, সে যে কী, সে যে কেমন, বোঝা গেল না। বুক ধড়ফড় করছে, তবু জোর গলা করে হেঁকে বললুম, কে হে তুমি। পুলিশ ডাকব নাকি।

অদ্ভুত হাঁড়ি গলায় এই জীবটা বলল, কী দাদা, চিনতে পারছ না? আমি যে তোমার পুপেদিদির সে। এখানে যে আমার নেমন্তন্ন ছিল।

আমি বললুম, বাজে কথা বলছ, এ কী চেহারা তোমার!

সে বললে, চেহারাখানা হারিয়ে ফেলেছি।

হারিয়ে ফেলেছ? মানে কী হল।

মানেটা বলি। পুপেদিদির ঘরে আজ ভোজ, সকাল-সকাল নাইতে গেলেম। বেলা

তখন সবেমাত্র দেড়টা। তেলেনি পাড়ার ঘাটে বসে ঝামা দিয়ে কষে মুখ মাজছিলুম। মাজার চোটে আরামে এমনি ঘুম এল যে, ঢুলতে ঢুলতে ঝুপ করে পড়লুম জলে; তারপরে কী হল জানি নে। উপরে এসেছি কি নিচে কি কোথায় আছি জানি নে, পষ্ট দেখা গেল আমি নেই।" (সে)

এতো হল নিছক আজগুবি কল্পনার একটি উদাহরণ মাত্র। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে এমন অনেক গল্প আছে যাদের এই রকম 'আবোল তাবোল' (nonsense) জাতীয় উদ্ভট রসের রচনার পর্যায়ভুক্ত করা যায় সহজে, তেমনি আবার তাদের উপকথা বা রূপকথাধর্মী বলেও চিনতে আমাদের কোন সংশয় জাগেনা। সেই সঙ্গে এদের মধ্যে যে ব্যঙ্গের ঝাঁঝও প্রচ্ছন্ন রয়েছে সে কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

উপকথা জাতীয় গল্পের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'সে' গ্রন্থের 'রিপোর্ট' গল্পটি। 'হৌ হৌ' নামে এক শেয়ালের লোম হারানো লেজ হারানোর কাহিনী আমাদের অনেকাংশেই স্মরণ করিয়ে দেয় উপকথার সেই লাঙ্গুলহীন বা নীলবর্ণ শৃগালের কথা। অবশ্যই এ কাহিনীটি কবির স্বকীয় সৃষ্টি, উপকথার রাজ্যের শেয়ালকে তিনি নিজের মত করে আধুনিকতায় উন্নীত করে নিয়েছেন।

হৌ হৌ এর 'শিবুরাম' নাম গ্রহণ করে মানুষ হবার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা এবং অবশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে 'আমার লেজ কই' বলে হেঁকে হেঁকে বেড়ানো বা মনের দুঃখে শেয়ালি ভাষায় তার ছড়া লেখার ঘটনা কবির 'খাপছাড়া'র কবিতাগুলোর মতই অদ্ভুত এবং শিশুদের মনে তা কৌতুকরসের সৃষ্টি করে। কিন্তু পরিণত মনের নিকটও এর আবেদন কম নয়, কারণ এ গল্পে রূপকের আবরণে নিহিত রয়েছে সুতীব্র ব্যঙ্গ। কবি নিজেই গল্পটির শেষে 'সে'র মুখ দিয়ে তা বলিয়েছেন। —

"এই যে রিপোর্টটা পড়ে শোনালে, ওটা তো আগাগোড়া ব্যঙ্গ, প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি।......

দাদা, রাগ করছ বটে, কিন্তু আমি বলে দিলুম, বুদ্ধির ঝাঁজে তোমার রস যাচ্ছে শুকিয়ে। মজা করছ মনে কর, কিন্তু তোমার ঠাট্টা গায়ে ঠেকলে ঝামার মতো লাগে।"

আলোচ্য গ্রন্থের ছয় এবং দশ সংখ্যক গল্প দুটিকেও এ জাতীয় লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনার পর্যায়ভুক্ত করা যায়। তার মধ্যে আবার দশ সংখ্যক গল্পটিতে কেবল উপকথা নয় রূপকথার স্পর্শও অনুভব করা যায়।

'সে' গ্রন্থের সমস্ত গল্পই কবির খেয়ালখুশির স্রোতে ভেসে গেছে উদ্ভট আজগুবি অসম্ভবের দরিয়ায়।

এবারে রবীন্দ্রকথাশিল্পে লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপকরণের প্রসঙ্গে আসা যাক।

'গোরা' উপন্যাসের প্রথমেই লোকজীবনের একটি চিত্রকে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত করেছেন সহজ এবং স্বাভাবিক উপায়ে।

"আলখাল্লা পরা একটা বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গাইতে লাগিল—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায়।"

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায়, বাউলের এই গানটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল বোলপুরে এবং এই গানের কথা ও সুর তাঁর মনকে এক অনির্বচনীয় রসের সন্ধান দিয়েছিল। অতএব আমাদের এ অনুমান বোধহয় একেবারে অসংগত নয় যে, কবির সেদিনকার এই অনুভূতিই তাঁকে উক্ত গানটির পরিবেশনায় এবং গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র বিনয়ের মনের উপরে তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে অনেকটা প্রেরণা দিয়েছিল। উপন্যাসে দেখি,—

"বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল বাউলকে ডাকিয়া অচিন পাখি গানটা লিখিয়া লয়, কিন্তু ভোর রাত্রে যেমন শীত শীত করে অথচ গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইতে উদ্যম থাকে না, তেমনি একটা আলস্যের ভাবে বাউলকে ডাকা হইল না, গান লেখাও হইল না, কেবল ঐ অচেনা পাখির সুরটা মনের মধ্যে গুনগুন করিতে লাগিল।"

আর একটি বাউলের গান স্থান পেয়েছে 'শেষের রাত্রি' গল্পে। গানটি হল 'ওরে মন যখন জাগলি না রে/ তখন মনের মানুষ এল দ্বারে।' আগেই আলোচনা সূত্রে বলেছি, আলোচ্য গল্পের নাট্যরূপ 'গৃহপ্রবেশে'ও ঐ একই গান ব্যবহৃত হয়েছে।

আবার দেখতে পাই, 'গল্পগুচ্ছে'র 'বোষ্টমী' গল্পটিতে কবি লোকমানসের সরল বিশ্বাস, তাদের সহজ চিন্তাভাবনা, তাদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাকে রূপায়িত করেছেন বোষ্টমী চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে। আর গল্পের এই বোষ্টমী কোন কাল্পনিক চরিত্র নয়— লোকজীবনের সঙ্গে রবীন্দ্র কবিমনের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফল এটি। চরিত্রটির বাস্তবতা এবং সত্যতা সম্পর্কে তিনি অন্যত্র বলেছেন,

"বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। এই বোষ্টমী স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প বলত। শেষ অংশটার অল্প কিছু বদল করেছি। বোষ্টমী যে গুরুকে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয়— সংসার ত্যাগ করেছিল বটে। একদিন আমাকে এসে বললে, কাল রাত্রে স্বপ্নে তোমার পা দুখানি বুকের ওপর পেয়েছিলুম — মোজা ছিল না — ঠাণ্ডা। এই তো দূরে থেকেও তোমাকে পেয়েছি। কাছে আসবার এই আকাঙ্ক্ষা, এ তো মোহ। এই বলে সে চলে গেল, আর তাকে দেখিনি।" (হেমন্ত বালা দেবীকে লিখিত পত্র)

এ ছাড়া যাত্রা-পাঁচালি-কথকতার প্রভাব খুব অল্প হলেও পরিলক্ষিত হয় তাঁর কোন কোন গল্পে।

'আপদ' গল্পে দেখি, যাত্রাদলের নীলকান্ত কিরণদের গৃহে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে আশ্রয় লাভ করেও তার পূর্ব অভ্যস্ত গানগুলা যন্ত্রের মত যথা নিয়মে গেয়ে যেত। কিন্তু এখন সেই গানের কথা ও সুর তার মনকে নিয়ে যেত এক রহস্যময় রূপলোকে— রূপকথার জগতে। রবীন্দ্রনাথ তার এই মানস অবস্থাটির বর্ণনা করেছেন এইভাবে। —

"....গানের কথা অতি যৎসামান্য, তুচ্ছ অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ, তাহার অর্থও নীলকান্তর নিকট সম্যক্ বোধগম্য নহে, কিন্তু যখন সে গাহিত,—

ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজ বংশে
এমন নৃশংস কেন হলি রে—
বল কী জন্যে, এ অরণ্যে

রাজকন্যার প্রাণসংশয় করিলি রে।—

তখন সে যেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হইত; তখন চারিদিকের অভ্যস্ত জগৎটা এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জমা হইয়া একটা নূতন চেহারা ধারণ করিত। রাজহংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে এক অপরূপ ছবির আভাস জাগিয়া উঠিত, সে আপনাকে কী মনে করিত স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, কিন্তু যাত্রার দলের পিতৃমাতৃহীন ছোকরা বলিয়া ভুলিয়া যাইত। নিতান্ত অকিঞ্চনের ঘরের হতভাগ্য মলিন শিশু যখন সন্ধ্যাশয্যায় শুইয়া রাজপুত্র রাজকন্যা এবং সাতরাজার ধন মাণিকের কথা শোনে, তখন সেই ক্ষীণ দীপালোকিত জীর্ণ গৃহকোণের অন্ধকারে তাহার মনটা সমস্ত দারিদ্র্য ও হীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক সর্বসম্ভব রূপকথার রাজ্যে একটা নূতন রূপ উজ্জ্বল বেশ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা ধারণ করে; সেইরূপ গানের সুরের মধ্যে এই যাত্রার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগৎটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত — জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখির ডাক এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহার সহাস্য স্নেহ মুখছবি, তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহু দুইখানি এবং দুর্লভ সুন্দর পুষ্পদল কোমল রক্তিম চরণযুগল কী এক মায়ামন্ত্রবলে রাগিনীর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইত।" (আপদ, গল্পগুচ্ছ)

আবার অতিথি গল্পের নায়ক তারাপদ যাত্রার দলে যোগ দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায়। তার প্রকৃতির মধ্যে ছিল একটা অনাসক্ত নিস্পৃহ ভাব, তার ওপরে সে ছিল যেমন সংগীত মুগ্ধ, তেমনি রোমান্টিক। যাত্রার গানই তাকে প্রথম বিবাগী করে তোলে এবং গৃহত্যাগ করতে সহায়তা করে; আবার এই মোহেই কিছুটা বা নতুনত্বের প্রত্যাশায় সে এক দল থেকে আর এক দলে চলে যায়। কিন্তু বিভিন্ন দলে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও তার কল্পনা প্রবণ নির্লিপ্ত স্বভাবকে কোনো রকম মলিনতা স্পর্শ করতে পারেনি। কীর্তনগান, পাঁচালি, কথকতা, যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ খণ্ডাংশ সব তার কণ্ঠস্থ এবং তার গান শ্রোতাদের আকর্ষণ করে এমন গভীরভাবে যে গানের শেষে মনে হয়, এরই মধ্যে তা কেন শেষ হয়ে গেল।

এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে আমরা লোকজীবনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক যুক্ত বাংলাদেশের এক নিজস্ব রূপের পরিচয় পাই। এদেশের গ্রামজীবনে একদিকে রয়েছে ভদ্রসম্প্রদায়, লোকজীবনের সঙ্গে যাঁদের দূরত্ব অনেক। কিন্তু যাত্রার দল বা পাঁচালির দলের লোকদের এই ভদ্র সমাজ দূরে ঠেকিয়ে রাখলেও যাত্রা বা পাঁচালি গানের আকর্ষণ থেকে তারা মুক্ত নয়; কারণ স্বরূপ আগেই বলেছি, বহুদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের আমোদ প্রমোদের প্রধান উপায় ছিল যাত্রা-পাঁচালি-কথকতা। আর এই দুয়ের সমন্বিত রূপটিই সজীব করে তুলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ গল্পটির পটভূমিকায়। এবং সবশেষে একথা বলা অসমীচীন হবে না যে সমগ্র রবীন্দ্ররচনাতেই লোকসাহিত্যের এ চিরায়ত শিল্পমূর্তিটিই অম্লান নবীনতায় দীপিত হয়ে রয়েছে।

পরিশিষ্ট

এ পর্যন্ত আমরা রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্যচেতনার বিভিন্ন দিক সমূহের বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু তিনি যে লোকসাহিত্যের একজন উৎসাহী সংগ্রাহকও ছিলেন সে তথ্য মূল নিবন্ধে কোথাওকোথাও পরিবেশিত হলেও তার পূর্ণ পরিচয় সেখানে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাই আলোচনা শেষে সংযোজনা করা হল তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত একটি পরিশিষ্ট যার প্রথম দুটি অংশে কবির সংগৃহীত লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের পরিচয় পাওয়া যাবে। আর পরিশিষ্টের তৃতীয় অংশে উপস্থাপিত করা হল রবীন্দ্রনাথের কতকগুলো প্রবন্ধের তালিকা, যে প্রবন্ধগুলো মূল নিবন্ধ দেহে আলোচনা সূত্রে ব্যবহৃত হতে পারেনি অথচ তাদের মধ্যে লোকসাহিত্যের প্রসঙ্গ এসেছে কোন না কোন ভাবে।

পরিশিষ্ট—ক

রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে লোকসাহিত্যের যে সমস্ত উপকরণ পাওয়া যায় তা প্রধানতঃ ছড়া এবং বাউল প্রমুখ লোকসঙ্গীত। বিষয়ানুক্রমে এই উপকরণ সমূহের প্রথম পংক্তির তালিকা প্রস্তুত করছি। এই সূত্রে ছড়ার তালিকাই প্রথম নির্দেশিত করা হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথই প্রথম ছড়ার যথার্থ মূল্যায়ন করেন এবং ছড়া সংগ্রহেও প্রয়াসী হন। সেই সব সংগ্রহের কিছু কিছু উপাদান তিনি তাঁর বিভিন্ন আলোচনায় উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এছাড়া সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩০১-১৩০২) তিনি ছড়ার একটি সংকলনও প্রকাশ করেন ধারাবাহিকভাবে। পরে সেই সংকলন তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে স্থান পায়। কেবল পরিত্যক্ত হয় চারটি ছড়া। সেই ছড়া চারটি হল যথাক্রমে—

প্রথম পংক্তি	প্রকাশ সূত্র / প্রাপ্তি সূত্র
(১) চাঁদ কোথা পাব বাছা, জাদুমণি	সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, মাঘ ১৩০১, পৃ ১৯৯
(২) ডালিম গাছে পরভু নাচে	তদেব, পৃঃ ২০০
(৩) তালগাছ কাটম বোসের বাটম গৌরী এল ঝি	তদেব, পৃঃ ১৯৯
(৪) নোটন নোটন পায়রাগুলি বেঁধেছে ঝোটন	তদেব, পৃঃ ২০০

আর তাঁর লোকসঙ্গীত সংগ্রহের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৯০ বঙ্গাব্দে। সেখানে তিনি বাউলের গান প্রবন্ধের আলোচনার শেষে দেশবাসীকে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করেন এবং নিজের সংগৃহীত তিনটি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান উদ্ধৃত করে দেন। পরে তাঁর অচলিত সংগ্রহ ঃ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবন্ধটির অন্তর্ভুক্তির সময়ে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত দেশবাসীর প্রতি কবির অনুরোধ

এবং তাঁর নিজের সংগ্রহের অংশটুকু পরিবর্জিত হয়। সেই গান তিনটিকেও আমাদের পরিশিষ্টের তালিকাভুক্ত করা হল। —

প্রথম পংক্তি	প্রকাশ সূত্র/প্রাপ্তি সূত্র
(১) ও কথা বোলো না, প্রাণে বাঁচিবে না শ্যাম	ভারতী, বৈশাখ, ১২৯০, পৃঃ ৪১
(২) কত কেঁদেছে, ও কাঁদায়ে গেছে	তদেব
(৩) নীলমণি, তোরে করিব মানা কোথাও যেও না	তদেব।

এতদ্ব্যতীত 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধে একটি বাউলগানও স্থান পেয়েছিল কিন্তু পরে গ্রন্থমধ্যে তা স্থান পায়নি। গানটি হল —

প্রথম পংক্তি	প্রকাশ সূত্র/প্রাপ্তি সূত্র
(৪) দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা	তদেব, পৃঃ ৩৮

পরে ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রবাসীর 'হারামণি' অংশে রবীন্দ্র সংগৃহীত একুশটি গান প্রকাশিত হয় ধারাবাহিকভাবে। এর মধ্যে একটি গান কেবল গগন হরকরার রচনা আর বাকী সবগুলোই লালন ফকিরের গান নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এর কয়েকটি গান ব্যবহৃত হলেও, তাঁর কোন গ্রন্থেই এই মূল্যবান সংগ্রহটি সংকলিত হয়নি। সেজন্যে এখন প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগৃহীত বাউল গীতি গুচ্ছের প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক একটি তালিকা নির্দেশ করছি।—

প্রথম পংক্তি	প্রকাশ সূত্র/প্রাপ্তি সূত্র
(১) আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা	হারামণি, প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২২
(২) আমার এ ঘর খানায় কে বিরাজ করে	তদেব
(৩) আমার ঘরের চাবি পরেরই হাতে	তদেব
(৪) আমার আপন খবর আপনার হয় না	তদেব, অগ্রহায়ণ,
(৫) আমি কোথায় পাব তারে (গানটির রচয়িতা গগন হরকরা)	তদেব, বৈশাখ,
(৬) আমি একদিনো না দেখিলাম তারে	তদেব, পৌষ
(৭) আয় দেখে যা নতুন ভাব এসেছে গোরা	তদেব, মাঘ
(৮) এমন মানব জমিন আর কি হবে	তদেব, পৌষ
(৯) কোথা আছে রে দীন দরদী সাঁই	তদেব, আশ্বিন
(১০) কোন সুখে সাঁই করেন খেলা—এই ভবে	তদেব, মাঘ
(১১) খুঁজে ধন পাই কি মতে	তদেব,
(১২) চাঁদ আছে চাঁদে ঘেরা	তদেব, অগ্রহায়ণ
(১৩) দেখনারে ভাবনারে ভাবের কীর্তি	তদেব, মাঘ

(১৪) পাগল দেওয়ানের মন কি ধন দিয়ে পাই	তদেব
(১৫) বেদে কি তার মরম জানে	তদেব
(১৬) মন আমার আজ পড়লি ফেরে	তদেব, আশ্বিন
(১৭) মন আইন মাফিক নিরিখ দিতে ভাবোকি	তদেব, পৌষ
(১৮) যেজন দেখছে অটল রূপের বিহার	তদেব, আশ্বিন
(১৯) সে লীলা বুঝবি খ্যাপা কেমন করে	তদেব, পৌষ
(২০) হতে চাও হুজুরের দাসী	তদেব
(২১) খ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর যদি কোয়	তদেব, অগ্রহায়ণ।

রবীন্দ্রনাথ অনেক বাউল গানের ইংরেজী অনুবাদও করেছিলেন। The Fugitive এবং Visva-Bharati Quarterlyর প্রবন্ধাবলীতে উদাহরণ হিসেবে সেই সব অনুদিত গানের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে পত্র পত্রিকাতে বা গ্রন্থেও তিনি অনেক অনুবাদ প্রকাশ করেন। এখন কোন না কোন রূপে মুদ্রিত সেই সব ইংরেজী অনুবাদেরও একটি তালিকা উপস্থিত করছি।—

প্রথম পংক্তি	প্রকাশ সূত্র/প্রাপ্তি সূত্র
(1) Eyes see only dust and earth but feel with the heart and know pure joy	Rabindranath,'The Fug itive'
(2) I sit here on the road	Ibid
(3) I am poured forth in living notes of joy and sorrow by your breath.	Ibid
(4) I am the boat, you are the sea and also the boat man	Ibid
(5) In love the aim is neither pain nor pleasure but love only.	Ibid
(6) Make way, O bud, make way, burst open thy heart and make way	Ibid
(7) My heart is a flute he has played on strange ways has my guest	Ibide
(8) This longing is to meet in the play of love, my lover is not only mine but yours	Ibide
(9) Thy path, O Lord, is hidden by mosque and temple	'Visva Bharati' Quarterly, April, 1928.

পরিশিষ্ট — খ

রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু মূল্যবান লোকসাহিত্য সংগ্রহ অধুনালুপ্ত হয়েছে। যেমন তাঁর সাঁওতালী ছড়ার অনুবাদ।

তবে অপ্রকাশিত হলেও তাঁর সংগৃহীত লালন ফকিরের গানের দুটি খাতা বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। তবে এই খাতার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গান প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরিশিষ্ট ক এর তালিকায় তার অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। সে কারণে আমরা সেই প্রকাশিত উপকরণগুলো বাদ দিয়ে অবশিষ্ট গানগুলোর বর্ণানুক্রমিক তালিকা উপস্থাপিত করছি। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত রবীন্দ্র সংগৃহীত যে খাতা দুটি পাওয়া যায়, তার মধ্যে গানগুলো উর্দুর ঢঙে ডান দিক থেকে বাঁদিকে লিখিত, এছাড়া অনেক অশুদ্ধ বানানও এতে পরিলক্ষিত হয়। যেমন 'আয়' এর স্থলে 'আএ', 'যে' স্থলে ' জে', 'শুদ্ধ' স্থলে 'শুদ্দু', 'যায়' স্থলে' 'জাএ' পদ্য স্থলে পর্দ্দ প্রভৃতি এবং এ জাতীয় আরও অনেক বানান। আবার কোন কোন শব্দের আঞ্চলিক রূপটিই লিখিত রয়েছে। তাছাড়া এর মধ্যে ক্রিয়াপদের আদিতে 'আ' কার স্থানে 'এ' কারের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন 'জানতে' স্থলে 'জেনতে', 'রাখলে' স্থলে 'রেখলে' প্রভৃতি। কিন্তু আমরা এখানে পাঠগুলিকে যথাসম্ভব বিশুদ্ধ করে নেওয়ার প্রয়াস পেয়েছি।

প্রথম পংক্তি	প্রকাশ সূত্র/প্রাপ্তি সূত্র
অজান খবর না জানিলে কিসেরো ফকিরী	বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত বাউল সংগ্রহ, দ্বিতীয় খাতা
অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণনিধি	তদেব
অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখিতে পায়	তদেব
	তদেব, প্রথম খাতা
অন্তরে যার সদাই সহজ রূপ জাগে	তদেব
অন্তিমকালের কালে ওকি হয় না জানি	তদেব
অপারের কাণ্ডারী নবী জী	তদেব
অবোধ মনরে তোমার হল না দিশে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
অমাবস্যার দিনে চন্দ্র থাকেন যেয়ে কোন শহরে	তদেব, প্রথম খাতা
অসার ভেবে সারাদিন গেল আমার	তদেব
আই হারালি আমাবাতি না মেলে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
আকার কি নিরাকার সাঁই রব্বানা	তদেব
আগে জাননা বাজী হারিলে তখন লজ্জায় মরণ	তদেব
আছে ভাবের তালা সেই ঘরে	তদেব, প্রথম খাতা
আছে মায়ের ও-তে জগৎপিতা ভেবে দেখো না।	তদেব, দ্বিতীয় খাতা

আছে দিন দুনিয়া অচিন মানুষ একজনা	তদেব
আজ আমার অন্তরে কি হলো গো সই	তদেব, প্রথম খাতা
আজ করছে রে সই ব্রহ্মাণ্ডের উপর	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
আজব আয়না মহল মণি গভীরে	তদেব, প্রথম খাতা
আজব রং ফকিরি সাদা সোহাগিনী সাঁই	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
আপন ঘরের খবর নে না	তদেব, প্রথম খাতা
আপন ছুরাতে আদম গঠনে দয়াময়	তদেব
আপনার আপনি চিনিনে	তদেব
আপনারে আপনি চেনা যদি যায়	তদেব
আব হায়াতের নদী কোনখানে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
আমার হয় নারে যে মনের মত মন	তদেব
আমার মনের মানুষের মনে	তদেব
আমার মনেরে বোঝাই কিসে ভব যাতনা আমার	তদেব
আমারে কি রাখবেন গুরু চরণ দাসী	তদেব, প্রথম খাতা
আমি কি দোষ দিব কারে রে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
আয় গো যাই নবীর দিনে	তদেব, প্রথম খাতা
আর কি বসবো এমন সাধ-বাজারে	তদেব
আর কি-হবে এমন মানব জনম বসব সাধুর মেলে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
আর কি গৌর আসবে ফিরে	তদেব
আলেফে নামে মিমেতে	তদেব
উদয় কাল কলিরে ভাই কলি আমি বলি তাই	তদেব
উপরোধে কাজ দেখারে ভাই ঢেঁকি গেলার মত	তদেব
এই মানুষে সেই মানুষ আছে	তদেব
একদিন পরের কথা ভাবলি নারে	তদেব
একবার চাও হে দয়াময়	তদেব
একবার চাঁদ বদনে বলরে সাঁই	তদেব, প্রথম খাতা
এক ফুলে চার রঙ ধরেছে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
একবার জগন্নাথ দেখরে চেয়ে	তদেব
এ কি আইন নবী কল্লেন জারী	তদেব, পথম খাতা
এ কি আজগুবি এ ফুল	তদেব
এখন আর ভাবলে কি হবে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
এ দেশেতে এই সুখ হল	তদেব
এনে মহাজনের ধন বিনাশ করলি ক্ষ্যাপা	তদেব, প্রথম খাতা
এবার কি সাধনে শমন জ্বালা যায়।	তদেব, দ্বিতীয় খাতা

এবার কে তোর মালিক চিনলিনে তারে	তদেব
এমন দিন কি হবে রে আর	তদেব
এমন সৌভাগ্য আমার কবে হবে	তদেব
এলাহি আলাদিন আল্লা	তদেব
এসো এ অপারের কাণ্ডারী	তদেব
ঐ এক অজানা মানুষ ফিরছে দেশে	
তারে চিনতে হয়	তদেব
ওগো ওরিকতে দাখিল না হলে	তদেব
ও তোর ঠিকের ঘরে ভুল পড়েছে মন	তদেব, প্রথম খাতা
ও দুটি নুরের ভেদ বিচার জানা উচিত বটে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
ও মন কে তোমারো যাবে সাথে	তদেব
ও মন তিন পোড়ায় তো খাঁটি হল না	তদেব
ও মন দেখে শুনে ঘোর গেল না	তদেব
ওরে মন আমার গেল জানা	তদেব
ওসে ফুলের মর্ম জানতে হয়	তদেব, প্রথম খাতা
করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
কাজ কি আমার এ ছার কুলে	তদেব
কার ভাবে শ্যাম নদেয় এল গিয়ে	তদেব
কারে আজ শুধাই সে কথা	তদেব
কারে দিব দোষ নাহি পরের দোষ	তদেব
কার বলে অটল প্রাপ্তি ভাবি তাই	তদেব
কাল কাটালি কালের বশে	তদেব
কি আজব কলে রসিক বানিয়েছে কোঠা	তদেব, প্রথম খাতা
কি করি কোন পথে যাই	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
কি করি ভেবে মরি মন-মাঝি ঠাওর দেখিনে	তদেব
কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বি দলে	তদেব, প্রথম খাতা
কিরূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায়	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
কি সাধনে পাই গো তারে	তদেব
কিসে আর বোঝাই মন তোরে	তদেব প্রথম খাতা
কি হবে আমারো গতি	তদেব
কুদরতের সীমা কে জানে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
কুলের বৌ ছিলাম বাড়ি	তদেব, প্রথম খাতা
কৃতিকর্মার খেল কে বুঝতে পারে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
কৃষ্ণ পদ্মেরি কথা করোরে দিশে	তদেব, প্রথম খাতা
কৃষ্ণ বিনে তেষ্টা ত্যাগী	তদেব, দ্বিতীয় খাতা

কে কথা কয়রে দেখা দেয় না	তদেব, প্রথম খাতা
কে তাহারে চিনতে পারে	তদেব
কে পারে সে মকর উল্লার মকর বুঝিতে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
কে বুঝিতে পারে আমার সাঁইর কুদরতি	তদেব
কে বোঝে মন মওলার আলেক বাজী	তদেব
কে বোঝে সাঁইর লীলাখেলা	তদেব
কোথা রইলে হে ও দয়াল কাণ্ডারী	তদেব
কোথা সে চোরের বাড়ি	তদেব, প্রথম খাতা
কোন কূলে যাবি মথুরায়	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
কোন রসে কোন রতির খেলা	তদেব, প্রথম খাতা
কোন রাগে সে মানুষ আছে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
খাকি আদমের ভেদ সে ভেদ পশু কি বোঝে	তদেব
খেলছে মানুষ নীরে ক্ষীরে	তদেব
গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি কি গুরু দেখি	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
গুরু দোহাই তোমার মনকে আমার	তদেব
গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে	তদেব
গুরু সুভাব দেও আমার মনে	তদেব,
গোঁসাই আমার দিন কি যাবে এই হালে	তদেব
গোঁসাইর ভাব সেই ধারা	তদেব, প্রথম খাতা
গৌর কি আইন আনিলে নদীয়ার	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
গৌর প্রেম অথাই আমি ঝাঁপ দিয়েছি তায়	তদেব, প্রথম খাতা
চাতক স্বভাব না হলে	তদেব
চারিটি চন্দ্র ভাবের ভুবনে	তদেব
চাঁদ ধরা ফাঁদ জান না মন	তদেব
চাঁদ বলে চাঁদ কাঁদ কেনে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
চাঁদে চাঁদে চন্দ্রগ্রহণ হয়	তদেব, প্রথম খাতা
চিনবে তারে এমন আছে কোন ধনি	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
চিরকাল জল ছেঁচে	তদেব
চিরদিন দুখেরো অনলে প্রাণ জ্বলছে আমার	তদেব
চেয়ে দেখনারে মন দিব্য নজরে	তদেব, প্রথম খাতা

জগত শক্তিতে ভোলালে সাঁই	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
জান গে মানুষের করণ কিসে হয়	তদেব
জানগে যা গুরুর দ্বারে জ্ঞান উপাসনা	তদেব, প্রথম খাতা
জানতে হয় আদম সফির আদ্য কথা	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
জানবো হে পাপী হইতে	তদেব
জানরে মন সেই রাগের করণ	তদেব
জানা চাই অমাবস্যে চাঁদ থাকে কোথায়	তদেব, প্রথম খাতা
জানি মন প্রেমের প্রেমী কাজে পেলে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
জীব মলে জীব যায় কোন সংসারে	তদেব
ডাকরে মন একবার আল্লা বলে	তদেব
ডুবে দেখ দেখি মন কীরূপ লীলেময়	তদেব, প্রথম খাতা
তিন দিনের তিন মরম জেনে	তদেব
তুমি কার আজ কেবা তোমার এই সংসারে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
তুমি কার কেবা তোমার এই সংসারে	তদেব
তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাব না	তদেব, প্রথম খাতা
তোরা কেউ যাস নে ও পাগলের কাছে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
তোরা দেখনারে মন দিব্য নজরে	তদেব
থাক না মন একান্ত হয়ে	তদেব, প্রথম খাতা
দয়াল নিতাই কারে ফেলে যাবে না	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
দাঁড়া কানাই একবার দেখি	তদেব, প্রথম খাতা
দিনে দিনে হল আমার দিন আখেরি	তদেব
দিবারাতে থেকো সব রে বাহু সারি	তদেব
দিল দরিয়ায় ডুবিলে সে, দিলের খবর পায়	তদেব
দীনের ভাব যেদিন উদয় হবে	তদেব
দীনের ভাব যে হি ধারা	তদেব
দেখনা এবার আপনারো ঘর ঠাওরিয়ে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
দেখরে আমার রসুল যার কাণ্ডারী এইভবে	তদেব, প্রথম খাতা
দেখরে দিন রজনী কোথা হতে হয়	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
দেখলাম এ সংসার ভোজবাজীর প্রকার	তদেব, প্রথম খাতা
দেখলাম কি কুদরতি ময়	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে	তদেব, প্রথম খাতা
ধররে অধর চাঁদের অধরে অধর দিয়ে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
ধড়ে কোথায় মক্কা মদীনে চেয়ে দেখ নয়নে	তদেব, প্রথম খাতা
ধ্যানে যারে পায় না মহামুনি	তদেব, দ্বিতীয় খাতা

নজর একদিকে দিলে আর একদিকে অন্ধকার হয়	তদেব
নদীর তির ধারা বয়রে নদীর তির ধারা বয়	তদেব, প্রথম খাতা
নবী না চিনে কি আল্লা পাবে	তদেব
নবী না চিনে কিসে খোদার ভেদ হয় চিরদিন	তদেব
নবীর অঙ্গে জগৎ পয়দা হয়	তদেব
নবীর আইন বোঝা সাধ্য নাই	তদেব
নরে্কারে দুজন নুরী ভাসছে সদায়	তদেব
নরেকারে ভাসছে রে এক ফুল	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
না জানি কেমন রূপ সে	তদেব, প্রথম খাতা
না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে	তদেব
না জেনে ঘরের খবর তাকাই আসমানে	তদেব
নাম সাধন বিফল বরজখ বিনে	তদেব
না হলে মন সরলা কি ফল মেলে কোথা জুড়ে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
নীচে পদ্ম চড়ক বাণে যুগল মিলন চাঁদ চকোরা	তদেব, প্রথম খাতা
পড়গে নামাজ জেনে শুনে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
পড়রে দায়েমী নামাজ এ দিন হল আখেরী	তদেব
পড়ে ভূত মন আর হস নে মনুরায়	তদেব
পাখি কখন যেন উড়ে যায়	তদেব, প্রথম খাতা
পাপধর্ম যদি পূর্বে লেখা যায়	তদেব
পাবে সামান্য কে তারে দেখা	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
পার কর দয়াল আমার কেশে ধরে	তদেব
পার কর হে দয়াল চাঁদ আমারে	তদেব
পারে লয়ে যাও আমায়	তদেব
পারে নিরহেতু সাধনা করিতে	তদেব
প্রেমের সন্ধি আছে তিন	তদেব, প্রথম খাতা
ফকিরি করবি খেপা কোন রাগে	তদেব
ফের পলো তোর ফিকিরি তে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
ফেরেব ছেড়ে করো ফকিরি	তদেব
বল কারে খুঁজিস ক্ষ্যাপা দেশ বিদেশে	তদেব, প্রথম খাতা
বড় আজব কুদরতি	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
বাকির কাগজ গেল হুজুরে	তদেব, প্রথম খাতা

বিদেশীর প্রেম কেউ করো না	তদেব
বিষয় বিষে চঞ্চলা মন দিব রজনী	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
বিষামৃতে আছেরে মাখাচোখা	তদেব
ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছে সাঁই	তদেব, প্রথম খাতা
ভজনের নিগূঢ় কথা যাতে আছে	তদেব
ভজ মুরশীদের কদম এই বেলা	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
ভবে কে তাহারে চিনতে পারে	তদেব, প্রথম খাতা
ভাবের উদয় সেদিন হবে	তদেব
ভুলব না ভুলব না বলি কাজে বেলা	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
ঠিক থাকে না	তদেব
ভুলো না মন কারো ভোলে	তদেব, প্রথম খাতা
মদিনার রসুল নামে কে এল ভাই	তদেব
মন আমার কি ছার গৌরব করছ না জেনে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
মন আমার কেউ না জেনে মজো না পিরীতে	তদেব, প্রথম খাতা
মন কি ইহাই ভাব আল্লা পাব নবী না চিনে	তদেব
মন কি তুই ভেড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞান ছাড়া	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
মন চোরারে ধরবি যদি মন	তদেব, প্রথম খাতা
মন তোর আপন বলতে কে আছে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
মন তুই করলি একি ইতর গানা	তদেব
মনরে আপ্ত তত্ত্ব না জানিলে	তদেব, প্রথম খাতা
মনে গুরু প্রাপ্ত যবে সে তো কথার কথা	তদেব
মনে না দেখলে নেহাজ করে মুখে পড়লে কি হয়	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
মনের ভাব বুঝে নবী মর্ম খুলেছে	তদেব, প্রথম খাতা
মনের মনে হল না একদিনে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
মনের মানুষ খেলছে দ্বিদলে	তদেব, প্রথম খাতা
মনের হল মতি মন্দ	তদেব দ্বিতীয় খাতা
মরি রে কি আজব কারখানা এবার শুনে পড়ে	
ঠাহর নাহি হয়	তদেব, প্রথম খাতা
মলে ঈশ্বরপ্রাপ্ত হবে কেন বলে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
মানুষ অবিশ্বাসে পাইনে রে সে মানুষ নিধি	তদেব, প্রথম খাতা
মানুষ ঝলক দিবে নেহারে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি	তদেব, প্রথম খাতা
মানুষ ধর নেহারে	তদেব
মানুষের কারণ সে কি সাধারণ	তদেব, দ্বিতীয় খাতা

রূপের তুলনা রূপে	তদেব, প্রথম খাতা
লীলে দেখে লাগে চমৎকার	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে কে তারে পায়	তদেব, প্রথম খাতা
শুদ্ধ প্রেম রসের রসিক যে রে সাঁই	তদেব,
শুদ্ধ প্রেম রাগে সদায় থাকরে আমার মন	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
শুদ্ধ প্রেমের প্রেমী মানুষ যে জন হয়	তদেব, প্রথম খাতা
যড় রসিক বিনে কেবা তারে চেনে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
সকলি কপালে করে	তদেব
সদায় সে নিরঞ্জন নীরে ভাসে	তদেব, প্রথম খাতা
সবাই কি তার মর্ম জানতে পায়	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
সময় গেলে রে ও মন সাধন হবে না	তদেব
সহরে ষোলজন বোম্বেটে	তদেব
সাঁই আমার কখন খেলে কোন খেলা	তদেব
সাঁই কে বোঝে তোমার অপার লীলে	তদেব, প্রথম খাতা
সাঁই দরবেশ যারা আপনারে কানা করে অধরে মিশায়	তদেব
সাধ্য কি রে আমার সেরূপ চিনিতে	তদেব
সামান্য কি তার মর্ম জানা যায়	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
সামান্য কি সে ধন পাবে	তদেব, প্রথম খাতা
সুমঝে কর ফকিরি মন রে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
সেই অটল রূপের উপাসনা কেউ জানে কেউ জানে না	তদেব
সে কথা কি কবার কথা জানিতে হয় ভাববেশে	তদেব
সে করণ সিদ্ধি সামান্যে কি হয়	তদেব, প্রথম খাতা
সে ভাব উদয় না হলে কে পাবে সে অধীর চাঁদে রে	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
সে ভাব সবাই কি জানে	তদেব, প্রথম খাতা
সোনার মান গেল রে ভাই	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
সোনার মানুষ ঝলক দেয় দ্বিদলে	তদেব
সোনার মানুষ ভাসছে রসে	তদেব
হরি কাঁদে হরি বলে কেনে	তদেব
হায় কি কলের ঘরখানি বেঁধে বিরাজ করে সাঁই	তদেব, প্রথম খাতা
হায় চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি	তদেব

হীরে লাল মতির দোকানে গেলে না	তদেব, দ্বিতীয় খাতা
হুজুরে কার হবেরে নিকাশ দেনা	তদেব
ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ	তদেব
ক্ষম ক্ষম অপরাধ দাসের পানে	তদেব

পরিশিষ্ট — গ

রবীন্দ্রনাথের ওপর লোকসাহিত্যের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন অধ্যায়ে নানাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধে লোকসাহিত্য রসিক কবিচিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেলেও সেগুলো কাব্য, নাটক এবং কথাসাহিত্যের মত কোন স্বতন্ত্র আলোচনায় স্থান পায়নি, যদিও বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা সূত্রে প্রসঙ্গতঃ এ সমস্ত প্রবন্ধের বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আর তার থেকেই প্রবন্ধে অভিব্যক্ত রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য বিষয়ক চিন্তাধারার তথ্যগত পরিচয় পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রসঙ্গ আলোচনা সূত্রে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়নি তাদের একটি তালিকা এখানে সংযোজিত করছি।

প্রবন্ধনাম	গ্রন্থ
চিঠিপত্র	ছন্দ
ছন্দের অর্থ	তদেব
ছন্দের প্রকৃতি	তদেব
ছন্দের হসন্ত হলন্ত	তদেব
তথ্য ও সত্য	সাহিত্যের পথে
ধর্মের অর্থ	সঞ্চয়
পদ্যছন্দ	ছন্দ
পার করো	শান্তিনিকেতন
বাংলা উচ্চারণ	শব্দতত্ত্ব
বাংলা শব্দ ও ছন্দ	ছন্দ
মানুষ	শান্তিনিকেতন
শিক্ষার হেরফের	শিক্ষা
সাহিত্য তত্ত্ব	সাহিত্যের পথে
সাহিত্যের তাৎপর্য	তদেব
সাহিত্যের ধর্ম	তদেব
সাহিত্য বিচার	তদেব
সাহিত্য সমালোচনা ঃ পরিশিষ্ট	তদেব
সোনার কাঠি	পরিচয়

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

লেখক	গ্রন্থ
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাংলার ব্রত
	জোড়াসাঁকোর ধারে
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ	ঘরোয়া
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রকাব্য জিজ্ঞাসা
অহীন্দ্র চৌধুরী	বাংলা নাটকের বিবর্তনে গিরিশচন্দ্র
আশুতোষ ভট্টাচার্য	বাংলার লোকসাহিত্য (১-৫)
	রবীন্দ্র নাট্যধারা
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	রবীন্দ্রস্মৃতি
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	বাংলার বাউল ও বাউলগান
কালিদাস রায়	প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য
জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়	আধুনিক বিশ্বনাট্য প্রতিভা
দীনেশ চন্দ্র সেন	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
	পদাবলী মাধুর্য
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথের আত্মরূপ ও রবীন্দ্রনাট্যের বিবর্তন
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	সাহিত্যে ছোটগল্প
নিরঞ্জন চক্রবর্তী	ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য
নীহাররঞ্জন রায়	বাঙ্গালীর ইতিহাস
প্রবোধচন্দ্র সেন	ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক (১-৪)
প্রমথনাথ বিশী	রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ
	রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ
প্রিয়ব্রত সরকার	রবীন্দ্র সঙ্গীত
বিমান বিহারী মজুমদার	ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য
বৈদ্যনাথ শীল	বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা
ভূদেব চৌধুরী	বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়)
মৈত্রেয়ী দেবী	মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

যোগীন্দ্রনাথ বসু	মাইকেল মধুসূদনের আত্মজীবনী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্র রচনাবলী (১ম-২৭শ)
	রবীন্দ্ররচনাবলী - অচলিত সংগ্রহ (১ম ও ২য়)
	জীবনস্মৃতি
	লোকসাহিত্য
	ছিন্নপত্রাবলী
	চিঠিপত্র (১ম-২য়)
	ভানুসিংহের পত্রাবলী
	পথে ও পথের প্রান্তে
	সংগীত চিন্তা
শঙ্খ ঘোষ	কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক
শশীভূষণ দাসগুপ্ত	শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে
শচীন্দ্রনাথ অধিকারী	রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে
	পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ
	সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ
শিবনাথ শাস্ত্রী	রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ
শুদ্ধসত্ত্ব বসু	রবীন্দ্র কাব্যের গোধূলি পর্যায়
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা (২য় খণ্ড)
	বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা
শ্রীমন্তকুমার জানা	রবীন্দ্র মনন
সরলা দেবী চৌধুরাণী	জীবনের ঝরাপাতা
সুকুমার সেন	বিচিত্র নিবন্ধ
	বিচিত্র সাহিত্য (১ম ও ২য় খণ্ড)
	বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ
সুধীর চন্দ্র কর	জনগণের রবীন্দ্রনাথ
সুধীর কুমার করণ	লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ
	সীমান্ত বাংলার লোকযান
	লোক সাহিত্যে ঈশপ
সোমেন্দ্রনাথ বসু	রবীন্দ্র অভিধান (১ম -৪র্থ)
সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলার বাউল কাব্য ও দর্শন